গল্প সংকলন

সম্পাদনা

সোমনাথ ঘোষ

সম্পাদনা-সহযোগীতায়

অলি সরকার

অসীম চৌধুরী

দ্বিজরাজ সান্যাল

১৬, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ

সর্বোচ্চ তল

কলিকাতা—৭০০০৭২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৯/জানুয়ারী ১৯৬২

প্রকাশক : সোমনাথ ঘোষ
১৬, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, কলি-১২

মুদ্রক : বাসন্তী প্রেস ☐ সুকুমার দে ☐ ১৯ এ. ঘোষ লেন, কলি-৬

পরিবেশক : দে বুক স্টোর ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১৩
পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু চাকী

সূচী

বাওড়

নলিনী বেরা

একখানা সুপারি গুণতে নারি, সেই তারাগুনতির দেশে সেই গাঁ, মা রোজ সন্ধে হ'লে আমাদের বাড়িটার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দুটো উজ্জ্বল তারার পানে আঙুল তুলে বলতেন, ওই ছাখ রাবণের সিঙ দরোজায় আলো জ্বলছে। আমি অগুন্তি তারার ভিতর সেই দুটো তারাকেই খুঁজতাম, কই মা দেখি—দেখি, খুঁজে খুঁজে নারি, রাবণরাজার সিঙ দরোজায় সেই জ্বলন্ত তারা দুটোকে খুঁজে পেতাম না অজস্র অগুন্তি তারার ভিতর কেবল-ই হারিয়ে যেতাম। তখন হারিয়ে যাবারই বয়স।

এখন এই সেখানে আছি, সেই বাসাটার সদর দরোজার ই'দিকে দু'দুটো পাম গাছ, অনেক উঁচু। অধিকরাতে ঘুমচোখে ঘর ছেড়ে বেরুলে গাছ দুটো-কে দেখে কখনও কখনও রাবণের সিঙ দরোজার কথা মনে পড়ে। হয়ত চোখ খুলেও দেখি, গাছ দুটোর মাথায় কোটি কোটি নক্ষত্র। তার ভিতরে সেই উজ্জ্বল তারা দুটোকে খুঁজি—পেয়েও যাই এতো সহজে আইডেন্টিফাই করে ফেলি যে আমার আর হারিয়ে যাওয়া হয় না, আসলে হারিয়ে যাবার বয়স আর নেই যেন।

সেই সিঙ দরোজা। দুটো পামগাছ বাতাস লেগে হিলহিল করে নড়ছিল। তাদের দিকে চেয়ে থেকে আচমকাই মনে এল রুমা কি রাগ করেছে, রাগ নিয়েই কি দরোজা বন্ধ করল এখন?

রুমা আমার স্ত্রী। গৃহকর্মে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত, হেঁসেল ছেড়ে বেরুতে সব অবসর পায় না, বেচারী বনগাঁর সিকিভাগও দেখে নি। ওকে একদিন পারমদন জঙ্গলে নিয়ে যাব, হরিণ দেখে ও খুউব খুশি হবে, ইত্যাদি ভেবে হাঁটা দিলাম, অফিসে আজ খুব ভিড়, তবু বুড়ি ছুঁয়েই বেরিয়ে পড়লাম, মন যখন চেয়েছে।

গাঁড়াপোত-গোবরাপুর, বনগা টাউন থেকে খুব দূরে নয়, বাসে করে মিনিট কুড়ির পথ, অনায়াসেই যাওয়া যায়। রণেনদারা ওখানেই গেছেন আজ ভোর থেকে, গোবরাপুরে ঝুলনবাবুর বাড়িতে দুপুরে খাওন-দাওন তারপর বাওড়ের

জলে ভাসন, আমরা নৌকোয় চড়ে ভাসব—এরকমই ঠিক আছে, তার মানে হোল-ডে ফুর্তি।

ফুটুস-ফুস্-শব্দে বাসের চাকাটা মাঝপথে পাঙচার হল, বাসসুদ্ধ লোকের চিৎকার চেঁচামেচি 'এ বাস যাবানি?' ফুটা ইঞ্জিনে বাস ঝলতি পারে? ইত্যাদি শুনতে শুনতে মেজাজ বিগড়াল। ঘড়িতে ১ টা এরপর কখন খাবো, বাওড়ে নৌকো বাইবই বা কখন? স-ব ফুর্তি মাটি, পুরো ডে-টাই নষ্ট—এই যখন ভাবছি তখনই টেম্পোটা পেয়ে গেলাম, বর্ডার যাচ্ছিল, ওতে চড়েই গোবরাপুর।

রণেনদারা বড় রাস্তায় উঠে এসে এদিক ওদিক ঘুরছিলেন, টেম্পো থেকে নামতে দেখে শুভ্রদা বললেন, টেম্পোয় যে? আর এত দেরী? বলল বিপ্লব, রণেনদা বললেন, ওসব ছাড়ো, আমরা তোমার জন্যই বসে আছি, এখন শিগ্গির গা তোলো। অতএব আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকে পড়লাম। দু'ধারে দাঁড়-কলমী আর কলাগাছের বন, যেন লতার কেয়ারী করা বাগানের ভিতর ঢুকে যাচ্ছি। আর এভাবেই ঝুলনবাবুর বাড়ি, লম্বা-চওড়া ফিটফাট মানুষ দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, মুখে হাসিটুকু ছুঁয়ে আছে। রণেনদারা আগেই এসে তাদের ঝোলাঝুলি রেখে গেছেন। ছোটখাটো বাঙলো টাইপের ঘর, এককোনে তক্তপোশ। তার ওপর দু-চারটে গোলবালিশ, আমরা চার জনই তাস খেলার পোজে চারদিকে বসে গেলাম।

তাস নয়, রণেনদা ঝোলা থেকে একটা বড়োসড়ো হুইস্কির বোতল তক্ত-পোশের মাঝখানটিতে নামিয়ে রেখে এক অদ্ভুত আর্ট দিলেন, মুখে ডায়ালগ: জ্যায় মা তারা! আজ আমরা মনিময়ের মণ্ডপ হ'বার প্রথম দিনটা সেলিব্রেট করবো, শুভ্র খ্যাকাদিকি তোর ঝোলার ভিতর ভাজাভুজি কিছু আছে কি না, থাকলে বের কর।' শুভ্রদা বললেন, ও ইয়েস বাদাম-ভাজা ত আছে। তাছাড়া মাংস রান্নার গন্ধ পাচ্ছিস রণেন? ঝুলনবাবুকে বললেই এসে যাবে। বিপ্লব ঝুলনবাবুকে কষা মাংসের কথা বলতে উঠে গেল।

রণেনদা ঠিকই ধরেছেন, এর আগে আমি কখনো মদ খাইনি, মদো-মাতালদের আড্ডাতেও পড়িনি, এই প্রথম। ভয় ভয় করছিল তো অসহায়ের মত বলি, থাক না রণেনদা আরেকদিন হবে। রণেনদার কী হাসি, হো হো করে, ভয় পাচ্ছো? ওরে ভীতু, ওতে মদ ত অল্প, জলই বেশি। বলে হাতে তুলে বোতলটা নাড়ালেন, বোতলের গলা অব্দি ফেনা। তারপর পুট করে

ছিপি খুলে তরল পানীয় চারটে গ্লাসে ঢাললেন ঢপ ঢপ করে, যেন তাস বণ্টন সারা হল এবার আসল খেলা শুরু।

বিপ্লব ফিরে এসেছে, তক্তপোশের ওপর এক বাটি কষা মাংস, আর তার গন্ধ। বলল, ডেকচি থেকে তুলে এনেছি, গরম। গরমের ওপর গরম দ্রব্যটা বেশ জমবে, শুভ্রদা ফুট কাটলেন।

আমি ততক্ষণ আমার নিকটস্থ গ্লাসের ভিতর চোখ রেখেছি, রেখেই দেখি আমার বউ রুমার ছবি। আচ্ছা, বউ কি টের পেয়ে যাবে এই এখন মদ খেলে? রীতিমত ঘামতে শুরু করেছি। তো তো করে আরেকবার রণেনদাকে বলি, রণেনদা এতটা? পারছিনা। শুভ্রদার গ্লাশে মাত্রা কম আছে আরেকটু ঢেলে দিই? হাঁ-হাঁ করে উঠলেন রণেনদা, ও একটা পাঁড় মাতাল পেলে সমুদ্রও শুষে খাবে, ওকে দিস না। বলেই চীয়ার্স করলেন, ঢক ঢক করে দু-তিন ঢোক গিলে খেলেন, এখন মাংসের ছিবড়ে ছিঁড়ছেন দাতে। ঠোঁটে গ্লাস ছোঁয়াতেই বললেন, খাও। হ্যাঁ খাও। শুভ্রদাও সায় দিলেন। বিপ্লব বলল, খান না, ওই টুকুতে কিসস্যু হবে না। রণেনদা তাঁর আর্টিস্টিক ভঙ্গিতে আরেকবার বলে উঠলেন, জ্যায় মা তারা! বলতে না বলতেই এক চুমুকে পুরো গ্লাসটা সাবাড়, শুভ্রদা হায় হায় করলেন, ওভাবে খেও না মনিময়, মদ খেতে হয় রয়ে সয়ে। রণেনদা বললেন, ধুউস! ও মালে ওর কিসস্যু হবে না, যা তাগত ওর চাই অন্য মাল। তারপর সরবে ঘোষণা করলেন, আজ রাতে ডাক বাঙলোয় পুরো দিশি চলবে, আর মনিময় ফুলটাইম কম্পানি দেবে, কি হে মনিময় রাজি ত?

চারদিকে চোখে সর্ষে ফুল ফোটার মত আমার বউয়ের মুখচ্ছবি মুহূর্তে ফুটে উঠল, এদিকে মগজের ভিতর বিলিতি দ্রব্যটার যৎকিঞ্চিত ক্রিয়াকাণ্ডও শুরু, তো মরীয়া হয়ে বলি, ঠিক আছে দাদা, থাকব।

উৎফুল্ল হয়ে শুভ্রদা-রণেনদা একযোগে বলেন, দু'নম্বর, তোমার ফাইলে যা কিছুর পাণ্ডুলিপি আছে, তখনই শুনব। বলাই বাহুল্য আমিও একটু আধটু লিখি, আর এই লেখার টানেই এত। মনে মনে বউকে হট-আউট করে একটু তখন রণেনদাকে বলি, ও কোনো ব্যাপার নয়, শোনাব।

কলাপাতায় মাটিতে বসে ভুরিভোজ-অন্তে ঝুলনবাবুকে একগাদা ধন্যবাদ জানিয়ে শুভ্রদা বললেন, এখন আর কোনো ব্যাপার নয় (আমার আগের কথার রিপিটেশান), কেবলই 'লাই-ডাউন'।

লাই ডাউন? বিপ্লবের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

রণেনদা বললেন, ও হ'ল গিয়ে সাহিত্যিকদের ভাষা, মানে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়া।

শু'য়ে পড়বেন? বাওড়ে ভাসবেন না? বললাম আমি।

রণেনদা বললেন, ভাসব ত বটেই, আজ তোমাকে ডুবাবোও।

ভুস ভুস করে বউয়ের মুখ মনে পড়লেও ডুবতে রাজি আছি, বললাম, ডুববো।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বিপ্লব বলল, এই বিষ্টিতে ভাসতে ভাল্লাগবে? রণেনদা শুয়েছিলেন, প্রায় ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে বললেন, এ-চান্স মিস করা ঠিক হবে না শুভ্র, চ লগি ঠেলে আসি। বলতে না বলতেই ঝুলনবাবু হাজির, বললেন, ঘাটে নৌকোও তৈরী,

তো চারমূর্তি বেরিয়ে পড়লাম, ঝুলনবাবু খানিক পরে আসছেন, ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘাটে যাবার পথ, পথ হারিয়ে আমরা আঘাটায় পৌঁছুলাম। এখন আর বৃষ্টি নেই, মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে, চারিদিকে কী মনোহারী দৃশ্য। একটা অতি উচ্চ অশ্বত্থ গাছ, তার তলায় গরু চরছিল দু'তিনটে, লম্বা লম্বা বাঁশপতরি ঘাসে ভরা ঢালুভূমি, আর তারপরেই বাওড়। থমমারা কালো কুচকুচে জল, অগুন্তি জেলে ডিঙি, জাল ফেলার ছাড়াছাড়া খবলস-ফবলস আওয়াজ, সবার ওপর রোদের কারিকুরি, দেখবার মতো।

বিপ্লব বললে, রোদটা তরোয়ালের মতো কাটছে এখন। এ তো ঠিক বৈপ্লবিক কথা বার্তা হ'ল না বিপ্লব, তোমায় বিষ্টিতেও ভয় আবার রোদ্দুরেও, কাউকেই জয় করতে পারচো না তো? শুভ্রাদা বললেন।

আমি বাওড়ের পাড় বরাবর খানিকটা দৌড়ুলাম, পদ শব্দে দু-চারটে ঝোপঝাড়ের পাখি ছিরছার করে এদিক-ওদিক উড়ে গেল, হাতবাড়িয়ে ডাকতে গেলাম, আয় মনা, আয়—

রণেনদা বললেন, অই রে অতভাগার নেশা হ'য়েচে। বলে নিজেই এক অদ্ভুত সুরে গেয়ে উঠলেন—

নিতি পারি খেতি পারি দিতি পারিনে।

বলতি পারি কইতে পারি সইতি পারিনে।

খুব বেশি দেরী হল না বুঝতে, এ কোনো গান নয়, এতদ্‌ অঞ্চলের এক প্রচলিত ছড়া, দুপুরে খাবার সময়ই রণেনদা শুনেছিলেন ঝুলনবাবুর মুখ থেকে,

এখন তার ওপরই সুরারোপ। শুভ্রদা হৈ হৈ করে রণেনদাকে বাধা দিলেন, তোর গান এখন থামা, ওরে নৌকো এসে গেচে।

দুটো চকচকে কাতলা মাছ, প্রায় কেজি দেড়েক ওজন, নৌকোর গর্ভে সামান্য জলে ছির-ছির করে খেলছিল। বাওড় থেকে তোলা, জেলেরা একটু পরেই কো-অপারেটিভ-এ জমা দেবে, কারণ এ বাওড় গাঁড়াপোতা সমবায়ের। নৌকোয় উঠে বিপ্লব বলল, এখন মাঝিরা রেস্ট নিক, আমরা নৌকো বাইব। বলেই সে হালে বসল। আনাড়ী হাতে ছোট্টো নৌকো ঘুরে গেল, ঝুলনবাবু তখনও ডাঙায়। ভালই লাগছিল এই খেলা খেলা। শান্ত সুন্দর বাওড়। এখানে ওখানে কচুরির দাম, দাঁড়কলমীর চর, দুটো চাট্টে কোথাও বা এক দঙ্গল পাখি, বাওড়ের পাখি টু-ই-চ শব্দে জলে বুক ছুঁইয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে, পরক্ষণে ফের নেমে আসছে নিচে টু-ই-চ।

ঝুলনবাবুকে নিয়ে নৌকো যখন মাঝ বাওড়ে তখনই বেসামাল, বিপ্লব আর পারছে না, এদিকে জলও গভীর, রণেনদা জায়গা ছেড়ে উঠে এলেন, আমরা তাই নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছি, অর্থাৎ ধরেই নিয়েছি রণেনদাও আনাড়ী। কিন্তু না, হাতের কাজ আছে মানুষটার, সাহিত্যিক হলেও নৌকো চালাতে ওস্তাদ। কখনো কখনো আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, অলৌকিক জলযান ঘুরছে।

এরপর আমার পালা, রণেনদা হাঁক দিয়ে ডেকে নিলেন, মুখে ক্লান্ত মাঝির গান, ও নদীরে এ খেয়া বাইমু কত আর—নদী নয় রণেনদা বাওড়, বলতে বলতে হাল ধরলাম, সেই আনাড়ী হাতের কারুকার্য নৌকো এগিয়ে যাওয়ার চাইতে পিছিয়েই যায় বেশি, তো বলি, রণেনদা খেলাচ্ছি কেমন দেখুন ত! শুভ্রদা বিধাতার মতো উঠলেন, ধুউস। তুমি এই ছোট্ট নৌকোর হাল ধরতেই পারো না, তোমার অতো বড় সংসারের হাল ধরবে কি-করে?

বলতেই আমার ঘর সংসারের কথা মনে এল, বউ রুমার কথা, এক বছরের ছেলে রুপুর কথা, সে আরেক বাওড়। এতক্ষণ ভুলেই ছিলাম, এবার সব কিছুই মনে এল হুস হুস করে, আর তারপরেই চোখের ছানিটা কেটে গেল। এখন বড়ো পরিষ্কার দৃষ্টি, বড়ো পষ্টাপষ্টি দৃশ্য সব, বাওড় আর সে বাওড় নেই। আজ রাতে রুমা-রুপুকে ছেড়ে রাত কাটাতে হবে ডাক বাঙলোয়, মদও খেতে হবে, মাতালও হতে হবে, এ যেন দারুন এক অগ্নি-পরীক্ষা, পাশ করলে পাশ নয়তো জলে-পুড়ে থাক। কে যেন ভিতর থেকে

বলল, ও, কি হে মনিময়, পারবে তো?

খু-ব পারব, না-পারার বা কি আছে।

ঠিক সাঁঝ-মুখে নৌকোটা ঘাটে ভিড়ল, নেমে যেতেই মাঝিরা বলল, এ দু-ভাও লইয়া যান বাবুরা ট্যাকা দিতি লাগবনি। বলেন কি? ও মনিময় কার্তিক-গণেশকে বেঁধে ছেঁদে নিয়ে চলো, যাচা ধন ছাড়তে নেই হে। বলেই রণেনদা গান ধরলেন, 'নিতি পারি খেতি পারি দিতি পারি নে—

লম্বা বাঁশপতরি ঘাস মাছ দুটোর গালসিতে বেঁধে পিছু পিছু হাঁটতে থাকলাম গোবরা পুরের বড়রাস্তা অব্দি। তারপরেই বাস। ডাকবাঙলোয় পৌঁছুতে রাত হ'ল, শুভ্রদা বললেন, বাসায় গিয়ে ও দুটি ভেজে আনো; বেশ কড়কড়ে ভাজা, দিশি মদের সঙ্গে জমবেও বেশ। সায় দিলেন রণেনদা, বললেন, আসবে তো? বললাম, আসবো।

বাসায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই লোডশেডিং, বনগাঁ টাউনের বুকে ঘোরতর অন্ধকার আমার সিঙ দরোজায় সেই দুটি পামবৃক্ষ, তাদের মাথায় দু-দুটো উজ্জ্বল তারা জ্বলে যাচ্ছে, আমি রাবণের মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে বললাম, রুমু এই মাছদুটো শিগগির ভেজে দাও আর শোনো—বলতে চেষ্টা করি, মুখ ফুটে বলাই হয় না, রুমা তাড়া দেয়, কি-ই কথা বল-অ?

তো মুখে চোখে হাসি এনে বলি, গ্যা, ও কিছু না।

রাতে বাঙলোয় আর গেলাম না, বিপ্লব এসে মাছভাজা নিয়ে গেল।

সকাল সাতটা দশের ট্রেন, রণেনদারা কলকাতায় ফিরে যাবেন, বাঙলো থেকে এক রিক্সাতেই উঠলাম। এখন গোবরাপুরের বাওড়ের মতো মুখ রণেনদার, থম মেরে আছে সারাক্ষণ। বাঙলো থেকে স্টেশন অব্দি, একটুর জন্যও মুখ খোলেননি। ট্রেনে উঠে রাগে ফেটে পড়লেন, তোমার দ্বারা সাহিত্য ফাহিত্য—কিসসু হবে না, খালি বউ-বাচ্চাকে আদর করাই হবে। রণেনদার কথায় প্রায় কেঁদে ফেলি আর তখনই শুভ্রদা বিধাতার মতো বলে ওঠেন, সাহিত্য বড়ো জেলাস মনিময়, ওকে ছেড়ে বউয়ের দিকে সংসারের দিকে বেশি করে ঢলেছ কি সাহিত্যও তোমাকে ছেড়ে যাবে।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল, দিতেই আমার যা বোধ হল তা এই রকম: একটা হেলিকপ্টার এসেছিল আমাকে সঙ্গে নিয়ে. উড়ে এসেছিল বিপুল জলরাশির ওপর দিয়ে, তারপর ছোট্টো মতো একটা নির্জন দ্বীপে আমাকে নামিয়ে রেখে এইমাত্র উড়ে গেল। এখন আমার চারদিকে জল, জল চোখেও।

করিম খানের আশ্চর্য বন্দুক

অভিজিৎ দত্ত

কাজে হাতে ভাল চলে না। জমিতে লাঙলও চালায় নি। কিন্তু বন্দুক বানাতে করিম খানের জুড়ি মেলা ভার। সেই কবে, দিনক্ষণ মনে পড়ে না। করিম মিঞার বাবার সাথে পুলিশ সুপার হকিন্স সাহেবের বন্দুক পরিষ্কারে হাতেখড়ি। সেই থেকে বন্দুকের জগতে করিম মিঞার আনাগোনা। জোয়ান বয়সে বন্দুকের কিছু খেল দেখিয়েছে মিঞা। তখন ছিল সাহেবের যুগ। বন্দুকের কদর ছিল সে সময়। লাল মুখো সাহেবগুলো জহুরী ছিল। জহর চিনত। করিম মিঞার আব্বা আব্দুল খানের যে কি কদর ছিল সাহেবদের আমলে সে করিম মিঞা ছাড়া আর জানে কে? এখনকার ছেলে ছোকরারা শুনে হাসে। বলে গল্পগাছা। সাহেবযুগ শেষ হবার পর করিম মিঞাও কিছুদিন বাপের কাজ দাপটে চালিয়েছিল। তারপর কোথায় গেল রাজা রাজরা, বাবু জমিদারেরা। ভাঙচুর হয়ে কে কোথায় চলে গেল। বন্দুক পিস্তলের কদর শেষ হল। এখন তো বন্দুকের বাজারে কড়াকড়ির শেষ নেই তবু চলে যায়। কলকাতার বন্দুকের দোকানের বাবুরা মাসে ছমাসে সারাই করবার জন্যে বিদঘুটে দু-একখানা বন্দুক পাঠায় লোক মারফৎ। এই কদিন আগে ইণ্ডিয়া আর্মস শপের হরেন সাহা পাঠিয়েছিল এক জার্মান স্নাইপার রাইফেল। কলকাতার হরেনবাবুর দোকানে মেলা কারিগর। সব ফেল মেরেছিল বন্দুকটা খুলতে। মিঞা দেখে খুব এক চোট হেসেছিল। বার কয়েক খুটুর খাটুর করে বন্দুকটা খুলে দিয়েছিল। হরেনবাবুও নিরাশ করে নি। কড়কড়ে দুটো একশ টাকার নোট সাথে দেয় নি সাহাবাবু। জানত মিঞার হাতে বন্দুক পড়লে তার একটা গতি করিম করবেই। তবে মাসে ছমাসের দু চারশো টাকায় তো গুষ্টির সংসার চলে না। বাড়িতে একবেলা হাঁড়ি চড়ে তো অন্য বেলা চড়ে না। ছেলে দুটোকেও বন্দুকের কারিগরি শিখিয়েছিল। কাজ হয়নি। চ্যাংড়া ছেলে। কাজে মন নেই। পঞ্চায়েতের ঢুকে দলাদলি করে। পার্টির ঝাণ্ডা কাঁধে দৌড়ায় মিছিল করে। কাজের কোন ধান্ধা নেই। এই বুড়ো বয়সে কোথায় ম্যাগো ম্যাগো শীতে রোদ্দুরে পা মেলে বসবে। তা

নয় পরিবারের অন্তহীন খাই মেটাতে বুড়ো মিঞাকে বেরুতে হয় বাঁধা মাস মাইনার কাজের খোঁজে। ভিটে মাটি নিজের গায়ের গন্ধ মেশানো পল্লী গাঁ ছেড়ে একদিনের পথ নোংরা শহর কলকাতায় যেতে মন চায় না। গেলে হয়ত কাজ একটা জুটে যাবে। সাহাবাবু আছেন। ওনার চেনা লোকজনও বিস্তর। আসলে এই বয়সে স্ক্রু, হাতুড়ীর, রেঞ্জের খাটাখাটুনি সামলাতে শরীর বয় না মিঞার।

তা ব্যবস্থা একটা হয়েও যায়। ছোট পোলাটা খবর আনে। কলকাতার কাছে পিঠেই তার দোস্তের চেনা এক বাবু এয়ার গানের কারখানা দিয়েছে। দেখাশোনার লোক চাই। থাকা খাওয়া বাবু দেবেন। মিঞার আঁতে লাগে। আসলি বন্দুকের কারিগর কিনা বানাবে হাওয়া বন্দুক। তবু সাত পাঁচ ভেবে রাজী হয়ে যায়। সংসারের একটা পেটতো কমবে। হাতেও কিছু আসবে।

জেমস বণ্ড এয়ার রাইফেল কোম্পানীর ০০৭ মার্ক হাওয়া বন্দুকের বাজারে বেশ চল আছে। মালিক রবিবাবু আগে ছিল কলকাতার এক হাওয়া বন্দুকের দোকানের ম্যানেজার। হাতে কিছু পয়সা আসার পর নিজের কারখানা খুলেছে। বাবু কাজে পত্তরে সারাদিন বাইরে বাইরে। কারখানার কাজ সামাল দেয় করিম মিঞা। ভালো লাগে না মিঞার। মিস্ত্রীগুলোর মাথা নেই। সেই কবে এক নক্সা দেখেছে, ধুরমধারুম তাই বানিয়ে চলেছে। নতুন কিছু করার ইচ্ছাও নেই। মিঞা কথামত কাজ সামাল দেয়। অবসরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতার আশপাশের আকাশও কলকাতার আকাশের মত মলিন, বিবর্ণ। ফ্যাকাশে নীল আকাশ আর বন্দুক করিম মিঞার এই বৃদ্ধ বয়সের বন্ধু। অসীম শূন্য আকাশের দিকে মিঞা তাকিয়ে থাকে। ফ্যাকাশে নীল মাথার ওপরের মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিঞার মাথায় চলে আসে অভিনব সব বন্দুকের নক্সা। উল্কা পাতের মত সম্পূর্ন মৌলিক এক একটা আগ্নেয়াস্ত্রের পরিকল্পনা ঝরে পড়ে মন আঙিনায়। স্বপ্নের বন্দুক স্বপ্নেই থাকে। মিঞা সামাল দেয় হাওয়া বন্দুকের কাজ।

কাজে কাজে বেলা গড়ায় দিন যায়। আকাশের সাথে আলাপে খোদার প্রার্থনায় দিন কাটে মিঞার। তবে কিনা বাস্তব জীবন বড় পঙ্কিল। মিঞার

বন্দুক ঘাঁটা ছিল চোখে ঠারে ঠোরে টের পায় হাওয়া বন্দুকের সাথে সাথে আরও কি যেন তৈরি হয় বন্দুক কারখানা যন্ত্রঘরে। চুপিসারে, আবডালে। ব্যাপারটা টের পেল এক রাত্তিরে। আলফাল কিছু লোক এসে ধাঁতানি দিয়ে যায় রবিবাবুকে। আরে মশাই কি মাল দিয়েছেন। কাজ নেবার সময় তো খুব বাতেলা দিয়েছিলেন। এমন মেশিন দিয়েছেন দুটো চারটে ফায়ারের পরেই নল এত গরম হয় যে হাতে ধরা যায় না। রবিবাবুর হেড মিস্ত্রী চুন্নুখোর সুধাময়ের আশপাশে দু এক দিন ঘুরঘুর করতে রহস্যটা জেনে ফেলে মিঞা। হাওয়া বন্দুকের আড়ালে পাইপগানও তৈরি হয় কারখানায়। কাউকে কিছু না বলে সুধাময়ের হেপাজত থেকে একটা নল বন্দুক বাগিয়ে নেয় মিঞা। নক্সার খোল নলচে বদলে নলের গায়ে দুটো প্যাড বসিয়ে বানিয়ে দেয় সম্পূর্ণ নতুন এক নল বন্দুক। রবিবাবু তো দেখে থ প্রথমে। কিন্তু কিন্তু করে রবিবাবু গোপন কথা ফাঁস হওয়াতে। শেষ মেষ মিঞার গুণপনার প্রশংসা করে ফেলে। বহুদিন পর মিঞার আবার কপাল খুলল, রবিবাবু কাছে টানল মিঞাকে গুহ্য কথাও অকপটে বলতে লাগলেন মিঞার কাছে 'বুঝলে মিঞা এদিক ওদিক এসব ছুটকো ছাটকা কাজ না করলে হাওয়া বন্দুক বানিয়ে কি আর পেট ভরে?' মিঞা শোনে। শেষে আমতা আমতা করে বলেই ফেলে বাবু নতুন রকম ফেরের অনেক বন্দুকের নক্সা আপনারে দিব আপনি আমারে অ্যাকটু ছাখেন। বড় অভাব আমার। এক বেলাও পেট পুরে ভাত খাতি পারি না।' রবিবাবু শুনে মিটিমিটি হাসে। মিঞার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে বলে হবে। সব হবে। তুমি আমাদের ছাখ। আমিও তোমাকে দেখব। হাওয়া বন্দুকের পাইপ গান তৈরি গুনাহ বটে কোন সন্দেহ নেই। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে একই নক্সার হাওয়া বন্দুক বানানোর চাইতে নতুন নক্সার পাইপ গান বানাতে মিঞার মন লেগে যায়। সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকে মিঞা।

করিমখানের হাতের ভেল্কিমারা পাইপগান অন্ধকার জগতে রবিবাবুর কদর বাড়ায়।

কাঁচা পয়সা আসে রবিবাবুর ঘরে। সবই বোঝে মিঞা। না হলে এক মাসে দু-দুটো লেদ মেশিন আসে কখনো ঝুপড়ি মারা হাওয়া বন্দুকের যন্ত্রঘরে। মিঞার মাস মাইনার তংখা বাড়ে। রবিবাবুও মালিক মার্কা ফুটানি দেখায় না, মিঞাকে বড় আপন করে কথা বলে। মিঞা শোনে। নাক গলায় না।

খদ্দেরের সাথে যা বাতচিত সব রবিবাবুই করে। মিঞা কেবল বানায় নতুন বন্দুকের মৌলিক নক্সা। খোদার কৃপায় হাতে পাওয়া একটা গুণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে করিম মিঞা। চোরা বন্দুক নিয়ে কে কাকে খুন করল তাতে তার কি আসে যায়। বন্দুক তো নিজে চলে না। মানুষ তাকে চালায়। স্বয়ং আল্লাই যদি মানুষের দিল না পাল্টায়, করিম মিঞা কোন ছাড় যে মানুষের মধ্যের হিংস্র পশুটাকে খতম করে।

এমনি এক কাজের দিনে হঠাৎ রবিবাবু এসে যন্ত্রঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায় মিঞাকে। নামীদামী এক বাবু এসেছেন। বড় খদ্দের। করিম মিঞাকে দেখে দিতে হবে মাল তৈরি করা যাবে কিনা। আগুপিছু করে করিম মিঞা। আড়ালে থাকতেই সে ভালবাসে। বাবুদের কথা বাবুরা কইবে। আমতা আমতা করে বলে—আমি কি কথা কইব। আপনেই বলেন। ঠিক মতো মালমশল্লা পেলে যন্ত্রর পাতি থাকলি সব বন্দুকই বানায়ে দিতে পারবো। রবিবাবু জোর করে—তবু একবার চল মিঞা সাহেব। নতুন ধরনের মাল চাইছেন ···। নামটা বলতে গিয়েও থেমে যায় রবিবাবু।

কারখানার এক পাশে ম্যাসোনাইট বোর্ডের দরমা দিয়ে বানানো হয়েছে অফিস ঘর। একটা টেবিল আর খান চারেক চেয়ারই সম্বল। বোর্ডের দেওয়ালে কেবল আঠা দিয়ে সাঁটানো মা কালীর ছবিওয়ালা একটা ক্যালেণ্ডার। ফাইল পত্তরের কোন ব্যাপার নেই। নতুন বন্দুকের অর্ডার দেনেওয়ালা বাবুটিকে দেখে করিম মিঞা ভূত দ্যাখার মত চমকে ওঠে। আরে এ বাবু তো তার চেনা। মিঞার ছেলে যে দলের ঝাণ্ডা নিয়ে খিদমত গিরি করে এ তো সেই দলের উঁচু পদের লোক। সেবার পঞ্চায়েত ভোটের সময় মিঞার অজ পল্লা গাঁতে সাড়া পরে গেছিল। ছেলে এসে বলেছিল 'আব্বা মিটিং এ যাতি হব। কইলকাতা থেকে ন্যাতাবাবুরা আইতেছেন। মিটিং গা উজাড় করে লোক হামলে পড়েছিল। মিঞার চোখে এখনো ছানি পড়ে নি। একবার ঠাওর করেই চিনতে পেরেছিল। এই বাবুতো সেই লোক। মিটিং এ স্টেজের কোণার দিকে গ্যাট হয়ে বসেছিলেন। দুই একটা একথা সে কথার পর বাবু সরাসরি জিজ্ঞেস করে মিঞাকে 'পাইপ গানের চেয়ে ভাল বন্দুক কম খরচে কিছু তৈরি করতে পারবে?' অত উত্তেজনাতেও মিঞা হেসে ফেলে। মনে মনে বলে, পাইপগান আবার বন্দুকের জাতে উঠল কবে? ওই বন্দুকের নামের সঙ্গই তো চোর ছ্যাচড়দের গায়ের গন্ধ মিশে আছে। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ে

মিঞা। বন্দুকের অনেক নক্সা আমার আছে। যন্ত্রপাতি যা আছে তাতেও হইয়ে যাবে। শুধু মাল মশলা চাই। কথায় কথা আসে। জড়তা কেটে যায়। বন্দুকের কথা বলতে বলতে বুক উজাড় করে ফেলে মিঞা। থামতেই চায় না। কথায় কথায় শুনিয়ে দিয়েছিল ওস্তাদ না হলেও কাজ চালানো গোছের স্টেনগানের কারিগড়ি জানে। নতুন বাবু সরু চোখে তাকায়। তারপর মুচকি হেসে বলে, তুমি তো অনেক কিছু জানো দেখছি। রবিবাবু সামাল দেয়। ঠিক আছে মিঞাজান স্টেনগান লাগবে না। ছোট অস্ত্রেই কাজ হয়ে যাবে। মিঞা ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে আসে। শুনতে পায় ঘরের ভিতর কথা হচ্ছে অস্তর চটজলদি চাই সামনেই ভোট আসছে। অতৃপ্ত মনে করিম মিঞা চলে আসে মেশিন ঘরে। বুঝতে পারে বাবুটির বিশ্বাস আসে নি তার কথায়। মুখের জবানে অবশ্য মানুষের কতটুকু বোঝা যায়? বিশ্বাস আপনা থেকে আসে না। করিয়ে নিতে হয়। মানুষ চেনা যায় তার কাজে। একবার যদি বাবুকে কাজ দেখানো যেত, অব্যক্ত বেদনায় কাজে মন বসে না মিঞার। সন্ধ্যার মুখে মেশিন ঘরের কাজে ভাঁটা আসে। রবিবাবু অফিস ঘরে মিঞাকে তলব করে।

'সকালে যে বললে অনেক বন্দুকের নক্সা আছে। সত্যি?' রবিবাবু শুধোয়।

করিম মিঞা উৎসাহে নড়ে চড়ে বসে. 'আজ্ঞে একবারটি যদি বলেন তো একখানা যন্তর বানায়ে দেখাতে পারি।'

'কম পয়সায় তেজালো জিনিষ।' রবিবাবু মনে করিয়ে দ্যান। মিঞা মাথা নাড়ে, আজ্ঞে জানি।

'কদিন লাগবে?' জিজ্ঞেস করে রবিবাবু।

'মাল মশলা পেলি তাড়াতাড়ি বানায়ে দিব।'

রবিবাবু ক্ষণিক চিন্তা করে বলে ঠিক আছে। নক্সা এঁকে মাপ লিখে দাও। দেখি কতদূর কি হয়।'

বন্দুকের নেশা বুঁদ করে ফেলে মিঞাকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলকব্জা'র হাজারো আকার, আয়তন। বন্দুকের নল কতখানি লম্বা রাখবে, গ্যাস চেম্বারের আকার কতটুকু হলে ছোট স্প্রিং-এ কাজ হবে। খরচ কমাবার জন্য ব্যারেলের তলার কাঠ বাদ দিয়ে স্টেনগানের মত ফ্রেম স্টক রাখবে কিনা এই সব হাজারো কারিকুরি। কাগজে মাপ লিখে কাঁচা নক্সা বানিয়ে ফেলে করিম

মিঞা। দিনকতক পরেই রবিবাবু এনে দেয় মাপ অনুযায়ী নিখুঁত ভাবে আঁকা পাকা নীল নক্সা। বিভোর হয়ে করিম মিঞা তাকিয়ে থাকে তার মৌলিক সৃষ্টির পানে। একে একে আসতে থাকে কাঁচা মাল। করিম মিঞা মন প্রাণ ঢেলে দেয় কাজে। কাজের নেশায় বুঁদ মিঞা ভুলে যায় দেশ বাড়ীর কথা। কারখানার এক কোণ দেখে পেতে ফেলে একলার সংসার। কল্পনার বন্দুক ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। কে যেন ফিসফিসিয়ে কানের কাছে বলে ছাখো তোমার সন্তানকে ভাল করে চেয়ে ছাখ। অপত্য স্নেহে মিঞা ছাখে তার সৃষ্ট শিশু বন্দুক পূর্ণাঙ্গতার দিকে এক পা করে এগিয়ে চলেছে। রবিবাবু জিজ্ঞেস করেন 'কাজ কতদূর এগুলো ?'

মিঞা পাকা দাড়ি নেড়ে মিটিমিটি হেসে বলে, 'আর দুতিন দিনেই শেষ হইয়ে যাবে বাবু। চিন্তা কইরেন না।'

রবিবাবু একদিন বাড়ি গিয়েও বেশ রাত করে কারখানায় ফিরে আসে। নমুনা নিয়ে ফের চলে যায়। মিঞার সারা রাত কাটে উৎকণ্ঠায়। জিনিষ বাবুদের মন মাফিক হবে তো ?

পরদিন সকাল থেকে বার বার উঁকি মারে অফিস ঘরে রবিবাবু এলেন কিনা দেখতে।

রবিবাবু এলেন দুপুর নাগাদ। উৎকণ্ঠায় অধীর মিঞা পিছু পিছু হাজির হয় অফিস ঘরে। রবিবাবু বিলিতি সিগেরেট খাওয়ান মিঞাকে। আগ্রহ ভরে খবর নেন দেশবাড়ীর। হাবভাব নজর করেই মিঞা বুঝে ফেলে জিনিষ বাবুদের মনপসন্দ। আস্তে ধীরে কাজের কথায় আসেন রবিবাবু। বন্দুকটার হরেকরকম কলকব্জা বিভিন্ন জায়গা থেকে তৈরি হয়ে আসবে এই কারখানায়। বিভিন্ন অংশ একত্র করে পূর্ণাঙ্গ বন্দুক বানিয়ে শেষ ছোঁওয়া দেবে করিম মিঞা।

জেমস বণ্ড এয়ার রাইফেল কোম্পানীর মেশিন ঘরে হাওয়া বন্দুকের আড়ালে তৈরি হতে লাগল আসলি খুনী আগ্নেয়াস্ত্র।

একে নেশা উপরন্তু কাজের কদর। মিঞা জান প্রাণ ঢেলে দেয় কাজে। কাজের নেশায় মন থেকে মুছে যায় পার্থিব জগত সংসার। ভারাটে মিস্ত্রী গুলো কাণ্ড দেখে হাসে। জোরসে ধমক লাগায় মিঞা—চুপ কর শালা যত চুল্লুখোরের জাত। বাবুর পয়সা লিবি। কাজে গঙ্গারাম। ঘটনা রবি বাবুরও নজর আসে। ভারাটে মিস্ত্রীগুলোকে দেয় হটিয়ে। আলাদা করে

মিঞাকে ডেকে গল্পগাছা করে। মিঞাকে কথাও দেয় মিঞার ছেলে দুটোকে কলকাতায় পাকা চাকরী করে দেবে।

এক এক লট মাল তৈরি হয়। চালানও হয়ে যায় সাথে সাথে। গড়গড়িয়ে চলে রবিবাবুর চোরা বন্দুকের কারখানা। বন্দুকের জাদুকর করিম খান পয়সার মুখ দেখে কল্পনার জাল বিস্তার করে। আকাশ থেকে টুপটাপ খসে পড়ে নতুন নতুন বন্দুকের নক্সা। হাতের পানে তাকিয়ে আপন গর্বে মন ভরে ওঠে করিম মিঞার। বন্দুকের জগতে সে একা, অদ্বিতীয়। রবিবাবু আর কারখানায় থাকেন না। লোক মারফৎ মাল পাচার হয়। কারখানা থেকে মিঞা মনভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করে। তার এ জিনিস দেখে আরো নতুন নতুন নক্সার বন্দুকের বরাত হয়ত আসবে রবিবাবু মারফত।

. এমনি এক ঘোর লাগা দিনের শেষে রাতদুপুরের গম্ভীর নৈঃশব্দ ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায় মেশিন ঘরের দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে।

ঘুম ভেঙে যায়, মিঞা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেশিন ঘরের নিজের বিছানায়। হতভাগা দারোয়ানটাই বা গেল কোথায়? অন্ধকারে মিঞা এদিক ওদিক চায়। ধাক্কানির চোটে দরজা প্রায় ভেঙে পড়ে। ভেবে পায় না করিম মিঞা কি করবে। অগত্যা পা পা করে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। পুলিশ, হাতে উঁচিয়ে ধরা পিস্তল। থম মেরে অবুঝ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মিঞা। বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে হুঁশ ফিরতেই মনে হয় পৃথিবী ভেঙে দুমড়ে বুঝি চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার চেঁচামিচিতে চারিদিক ছয়লাপ মেশিন ঘর তছনছ করছে পুলিশ। পরম যত্নে তৈরি বন্দুকগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে চারিধারে। পুলিশের মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে করিম মিঞা ছুটে যাবার চেষ্টা করে মেশিন ঘরে। দু' হাত তুলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে 'ফেলবেননি বাবু ফেলবেননি ভাঙি যাবো।' কোমরে বন্দুকের কুঁদোর ঘা পরে আবার, পেছন থেকে। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে মিঞা।

থানায় হাজতের গরাদে মাথা দিয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে মিঞা। কেউ আসে না তার খোঁজে। কোমরে হাটুতে অসহ্য ব্যাথা। থানাবাবুরা এক একটা কথা জিজ্ঞেস করে আর রুলের বাড়ি মারে। যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে পুরুষ মানুষটা। বার বার বলে, সব জানে রবিবাবু। বাবু সব বলতি পারব। পুলিশ কানেই তোলে না কথা। হিম গলায় বলে শালা এয়ার গানের ফ্যাক্টরী করে আসল দেশী বন্দুক বানাচ্ছিস আর কিছু জানিস না? রবিবাবু

কার নাম ? ও কারখানার মালিকের নাম মহেন্দ্র ঘোষ। এখন ফেরার। করিম মিঞার মাথায় সব জট পাকিয়ে যায় অসংলগ্ন ভাবে চেঁচিয়ে বর্ণনা দেয় রবিবাবুর চেহারার রবিবাবুর দোস্ত সেই বাবুটির যার নতুন বন্দুক বানাতে গিয়ে করিম মিঞার বন্দুকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছিল। এমন কি বলে দেয় সেই বাবুটির রাজনৈতিক দলের নাম। বহু ক্ষমতার অধিকারী এই দলের নাম শুনে পুলিশ থমকে যায়। মার থামায়। মিঞাকে ফেলে রাখে হাজতে।

করিম মিঞার মন ছটফট করে কয়েক দেওয়ালের তফাতে মুক্ত পৃথিবীর জন্যে। তবু সেই পৃথিবী করিম মিঞার হাতের বাইরে। গুণাহের শাস্তি আল্লা দিচ্ছে। গবাক্ষহীন হাজতে শরীর এলিয়ে পরে থাকে মিঞা। আকাশ পাতাল ভাবে। ভাবনার দোলায় দুলতে দুলতে এক সময় চলে যায় দিগন্ত বিস্তৃত সোনালী পাকা ধানের ক্ষেতের মাঝে গাঢ় সবুজ টিপের মত দেশ বাড়ার গাঁয়ে। একসময় পৌঁছে যায় গাঁয়ের একমাত্র দোস্ত নীল আকাশের কাছে। ক্রমে সীমাহীন নীলিমায় ভেসে ওঠে এক একটি নতুন বন্দুকের ছবি। হঠাৎই বন্দুকে বিভোর করিম খানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুটো বিভৎস মুখের ছবি। ঢুলুনি ছেড়ে খাঁড়া হয়ে ওঠে মিঞা। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে শক্ত কড়া পড়া পাথুরে হাতের পাঞ্জা। বিভৎস লম্পট মুখ দুটো দাঁত দেখিয়ে হা হা করে হেসে ওঠে। সে মুখ রবিবাবুর আর নতুন বন্দুক তৈরি করনেওয়ালা রাজনৈতিক দলের নেতা রবিবাবুর সেই দোস্তের। জলন্ত ক্রোধে করিম মিঞা তাকিয়ে থাকে সেই মুখ দুটির দিকে। মুখ দুটি হাসতে হাসতে ক্রমে অস্বচ্ছ হয়ে মিলিয়ে যায় শূন্যতায়। একই রকম ভাবে মিঞা বসে থাকে। কেবল ক্রোধান্ধ জলন্ত চোখ দুটি বুজে আসে। চোখের সামনের অবয়বহীন গাঢ় আঁধারে আস্তে আস্তে হাজির হয় ক্ষীণতনু এক হিংস্র জংলি বন্দুকের ছবি। কি অদ্ভুত সেই বন্দুকের কলকব্জা। করিম মিঞা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করে সেই স্বপ্ন বন্দুককে। আপন মনে বিড়বিড় করে বলে— বাবু তোমরা নতুন বন্দুক চেয়েছিলে। আব্দুল খানের বেটা করিম খান হিম্মত রাখে নতুন বন্দুক বানাবার। এমনই এক বন্দুক তোমাদের বানিয়ে দেবে। ট্রিগার টিপলে যার গুলি সামনে না গিয়ে পেছনে ছুটে আসবে। বাবুরা জেনে রাখো এখনো কেউ এ বন্দুক বানাতে পারে নি।

ইন্সিওর্ড পার্শেল

অসীম চৌধুরী

চিঠিটা পেয়েই ফুর্তিতে ভরে ওঠে মাধবীর মনটা। মা চিঠি পাঠিয়েছে আসাম থেকে, বড় জামাইবাবু একটা মেখলা চাদর কিনেছেন মাধবীর জন্যে। দাম দু'হাজার টাকা। মা এখন বড় জামাইবাবুর কাছে আছে, তাই আগে-ভাগেই লিখে জানিয়েছে খবরটা. শিগ্‌গিরি পার্শেল এসে পৌঁছচ্ছে মাধবীর কাছে।

আজ বহুদিন পর মাধবী খুব আনন্দ পেল। সংসারের চাপে মাধবী প্রায় ভুলতেই বসেছিল যে এরকম কতকগুলো সুখবরও মানুষকে কেমন একটা অন্যজগতে নিয়ে যায়। যদিও স্বামী এবং দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা সুখী সংসার তার, তবুও মায়ের এই চিঠিটা পেয়ে মনটা কেমন ভরে উঠল একটা পনের বছর বয়সের ছটফটে আনন্দে। বাড়ীর ছোট মেয়ে বলে বাপের বাড়ীতে সকলেরই আদর আব্দারে বড় হয়ে উঠেছে মাধবী। কিন্তু বিয়ের এই তের বছরের জীবনে সেগুলো যেন আর এতদিন দেখতেই পায়নি সে। আজ এই হঠাৎ উপহার প্রাপ্তির খবরটা একটা দারুণ তৃপ্তি এনে দিয়েছে তাকে, ঘরে ঢুকেই মাধবী অতি উৎসাহে স্বামীর মুখের ওপর মেলে ধরল চিঠিটা, মায়ের চিঠি।

'তাই নাকি, কি লিখেছেন, কেমন আছে ওরা সব ?' প্রশ্ন করে শ্যামল।

'বড় জামাইবাবু আমার জন্য দু'হাজার টাকা দামের মেখলা চাদর পাঠাচ্ছেন শিগ্‌গিরি পার্শেল আসছে।'

'বাঃ দারুণ খবরতো তোমার সময় তাহলে বেশ ভালই যাচ্ছে বল।'

'এই কবে আসবে গো পার্শেলটা, বল না লক্ষীটি ?'

'সে আমি বলবো কি করে, পাঠালেই চলে আসবে।' উত্তর দেয় শ্যামল।

যেন আর তর সয়না মাধবীর, বিয়ের এই তের বছরের মধ্যে দু'হাজার টাকা দামের কখনো কোন শাড়ী কেনেনি সে। তার ওপর আবার আসামের মেখলা চাদর। সেই সেবার কলকাতায় আসবার পর জামাইবাবুকে আব্দার

করে ধরেছিল মাধবী জামাইবাবু, এবার কলকাতায় এলে আমার জন্য একটা আসামের মেখলা আনবেন, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব এখন'। 'কিছু টাকা পাঠাতে হবেনা তোমাকে। ভাল মেখলার সন্ধান পেলে আমি নিজেই পাঠিয়ে দেব একটা তোমার জন্য।' সেই জামাইবাবু ঠিক মনে রেখেছেন ছোটশালীকে। সত্যিই কী ভালই যে বাসতেন তিনি মাধবী কে।

শনিবার সকালে মাধবীর নামে পার্শেলটা এসে হাজির হোল দোর গোড়ায়। কলিংবেলের শব্দে শ্যামল দরজা খুলতেই অতি পরিচিত ডাক বাহক হেসে বলে উঠল 'দাদা, দিদিমনির নামে একটা ইন্সিওড' পার্শেল আছে।'

'তাই নাকি। দাঁড়াও তবে কলম আনি, তা দিদিমনিতো এখন স্কুলে। আমিই কেবল বাড়ী আছি। পার্শেলটা দিয়ে যাও আমাকে। আমি ফর দিয়ে সাইন করে নিচ্ছি।' শ্যামল উত্তর দেয় পোস্টম্যানকে। 'না দাদা তা হবে না। পার্শেলটা যার নামে আছে একমাত্র তার হাতেই জমা দিতে হবে, তারই দস্তখত দরকার। অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। এটা 'ইন্সিওর্ড পার্শেল' কিনা।'

'ইন্সিওর্ড পার্শেল!' একটু হতচকিত হয়ে যায় শ্যামল। পার্শেলের আগের কথাটা কেমন যেন নতুন লাগে তার কাছে। যদিও আলাদা করে কথাটা এর আগেও বহুবার শুনেছে শ্যামল। তবু পার্শেলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কেমন যেন নতুন ঠ্যাকে তার। তা সত্বেও সে পোস্টম্যানকে বলে। 'আরে মাধবীতো আমার বৌ-রে ভাই ; আর তাছাড়া আমরা কেউই তো তোমার অচেনা নই, দিয়ে দাও আমাকে। তাহলে তোমার আমার দুজনের ঝামেলাই মেটে। না হলে আবার এই পার্শেল নিয়েই তুমি এসে হয়তো দেখবে আমরা কেউ বাড়ীতে নেই। পার্শেলটা হয়তো ফেরতই পাঠাতে হবে শেষে।'

'কিছু করার নেই দাদা। পার্শেলটা কোন রকমে তার মালিকের হাতে না পৌছালে আমাদের চাকরী যাবে। পোষ্ট অফিসকে এর জন্য দু'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দিতে হবে মালিককে। আপনি বরং দিদিমনিকে বলবেন উনি যেন এটা ছাড়িয়ে নেন পোষ্ট অফিস থেকে। বেশী দেরী হলে কিন্তু পার্শেল ফেরত চলে যাবে।'

আর কথা বাড়ায়না শ্যামল, অগত্যা দরজা বন্ধ করে ঘরে চলে আসে। মনে মনে ভাবে এ কেমন পার্শেল যা কিনা তার হাতে পরলে সমস্ত ব্যাপারটাই বে আইনী হয়ে যাবে একেবারে। তবে কি স্বামী স্ত্রীর মাঝখানেও একটা

ফারাক আছে কোথাও। 'যদিদং হৃদয়ং' ইত্যাদি শ্লোকগুলো বাইরের লোকের কাছে বিশেষত-আইনী ব্যবস্থার কাছে কি একেবারেই মূল্যহীন সব?

পার্শেলটা বাড়ী ঘুরে চলে গেছে শুনে মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে যায় মাধবীর। ডাক পিয়নকে মুখে এবং মনে মনে এক প্রস্থ গালাগাল করে সে। 'সত্যি লোকটার আক্কেল নেই কোন। কেনরে, ওতো ছিলই ঘরে। পার্শেলটা দিয়ে গেলেইতো চুকে বুকে যেত সব ঝামেলা।' মাধবীকে খিচখিচ করতে দেখে কাছে এগিয়ে আসে শ্যামল মৃদু হেসে বলে 'আসলে ওই পার্শেলটাতে কেবল তোমারই একমাত্র অধিকার। কারণ ওটা তোমার প্রিয়তম জামাইবাবু কেবল তার বিলাভেড ছোটশালীর জন্যই আইনগত সংরক্ষণ করে পাঠিয়েছেন কিনা।'

'চুপকর, তোমার খালি যত আজে বাজে কথা। নিজে একটা হয়ে....তাই সবাইকে ওই চোখেই দেখ। জামাইবাবু যখন বিয়ে হয়ে আসে তখন আমার বয়স কত ছিল জান?'

'কত?'

'মাত্র চার বছর। আমি একটা ইজের পরে ঘরে ঘুরে বেড়াতাম তখন; আর সেই জামাইবাবুকে নিয়ে....অসভ্য ..' কথা শেষ হয় না মাধবীর. চাকি বেলনটা রেখে উঠে এসে বিছানার ওপরে আটা মাখা হাতেই বেশ কয়েকটা চিমটি লাগায় স্বামীকে। মাথা নিচু করে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় শ্যামল। মাধবী আবার গিয়ে বসেছে রুটি করতে। হো হো করে হাসছে শ্যামল, হাসছে আর মনে মনে ভাবছে, সেই চার বছরের ছোট্ট মেয়েটা কেমন তিরিশের দরজা ছুঁয়ে পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে অভ্যার্থনা করছে তাকে। কেমন অবাক লাগে তার. মাধবীকে জিজ্ঞেস করে শ্যামল, 'আচ্ছা তোমার কুড়ি বছর বয়সের পর কতবার তোমাকে দেখেছেন তোমার জামাইবাবু বল তো?'

'আবার! খালি যত আজে বাজে কথা তোমার। এবার কিন্তু আমি তোমাকে ..'কথা শেষ হয়না। মিথ্যে অভিমানের ভঙ্গিতে সব ফেলে রেখে মাধবী আবার এগিয়ে আসে শ্যামলের দিকে।

সোমবার সকালবেলা চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে শ্যামলের অনেকটা কাছে চলে এসে মাধবী বললো 'হ্যাগো, আজ অফিস টফিস সব পরে, পোষ্টঅফিস খুললেই জামাইবাবুর পাঠানো পার্শেলটা নিয়ে আসব দু'জন

মিলে কেমন?' 'তুমি আজ স্কুলে যাবেনা?' জিজ্ঞেস করে শ্যামল। 'একদিন না হয় কামাই-ই করলাম, কি হবে তাতে?' জানতে চায় মাধবী।

'না তাতে অবশ্য কিছু হবে না। কিন্তু তোমার পার্শেলেতো আমার কোন কাজ নেই আর সবচেয়ে বড় কথা আমাকে তোমার সাথে দেখলে আইন যদি তোমার ইন্সিওর্ড পার্শেল প্রাপ্তিতে কোন বাদ সেধে বসে। তখন কি হবে? মাঝখান থেকে আমার অফিসটা মার যায় কেন বাবা।'

'ওসব বাবা-টাবা ছার। আমি প্রেসারে রান্না সেরে নিচ্ছি তুমি বরং দশটার মধ্যে তৈরী হয়ে নাও।'

মাধবী আর শ্যামল যখন পোষ্টঅফিসে পৌছল সেই মুহূর্তে তার 'দ্বার উদ্‌ঘাটন' হয়নি। কয়েক মিনিট এদিক সেদিক পায়চারি করবার পর পোষ্ট-মাষ্টারের সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

'আমাদের একটা পার্শেল আছে।' মাধবী জানাল।

'হ্যা ইন্সিওর্ড পার্শেল। কি নাম আপনার।' ঘাড় ঘুরিয়ে, বেঁটে মতো টাক মাথা পোষ্ট মাষ্টার মশাই চশমার ফাঁক দিয়ে মাধবীকে একবার গভীরভাবে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় কথাটা।

'মাধবী মুখার্জ্জী—'

'পার্শেলের মালিক আর আপনি যে একই মহিলা তার প্রমাণ দিতে হবে আপনাকে। পোষ্টমাষ্টার ব্যস্ত সমস্ত কাজের ফাঁকে মাধবীকে জানাল কথাটা।

'সে কি করে প্রমাণ দেব।' স্কুল মিস্ট্রেস মাধবী হঠাৎ ফাঁপরে পরে। বুঝতেই পারেনা যে সে কি করে প্রমাণ করবে ব্যাপারটা। পোষ্টমাষ্টারকে বলে, 'আমার স্বামী আছেন সঙ্গে; তিনিই প্রমাণ দেবেন যে আমি তাঁর স্ত্রী; আর পার্শেলের মাধবী মুখার্জ্জী এবং আমি এক ও অভিন্ন।'

'আগে আপনার স্বামীকেই প্রমাণ দিতে হবে যে উনিই আপনার স্বামী।'

অ্যা বলে কি লোকটা? আশ্চর্য্য হয়ে মনে মনে কথাটা ভাবে মাধবী। মাথাটা কেমন গরম হয়ে যায় তার। এরকম সময়ে রাগে ধমক টমক মারলে লক্ষ্য করে দেখেছে যে ক্লাসের বাচ্ছাগুলো সব ভয় পেয়ে যায় খুব। 'কি বলতে চানকি আপনি। উনি আমার স্বামী নন।' রাগে ফেটে পরে মাধবী। 'পার্শেল নিতে এসেছি বলে কি আপনি যা খুশী তাই'....কথাটা আর শেষ হয়না তার। 'আরে আপনি অত রাগ করছেন কেন, আমি আপনাকে একটুও অপমান করছিনা, এ হ'ল আইনের কথা। যে কোন পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ

কর্মী যিনি আমাদের কাছে এসে শুধু বলবেন যে এই পার্শেলের নামের মালিক আর আপনি একই মহিলা, ব্যস্ তাহলেই আমরা আপনাকে দিয়ে দেব এটা।

আকাশ থেকে পড়ল মাধবী। সে এখন কি করবে। পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের চেনা কর্মী এখন সে পাবে কোথায়। খানিকটা অসহায় ভাবে শ্যামলকে বলে, 'কি হবে হ্যাগো তোমার কেউ চেনা জানা আছে?' বড়দার কথা মনে পড়েছে শ্যামলের। বড়দা পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের কর্মী। আর সব চেয়ে বড় কথা বাড়ীও দশ মিনিটের পথ। মুচকী মুচকী হাসছে শ্যামল, মাধবীকে ইশারায় নিশ্চিন্ত হতে ব'লে সে পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞেস করে 'আচ্ছা, ইনি মাধবী মুখার্জী প্রমাণিত হলে পর যিনি পার্শেলটা পাঠিয়েছেন তাকে আবার স্বশরীরে হাজির হয়ে প্রমাণ দিতে হবেনা তো যে প্রেরকের নামের সঙ্গে তারও মিল আছে? অথবা আর অন্য কিছু।'

ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেল মাধবীর বড় ভাসুরের পোষ্ট অফিসে আসাতে। শ্যামলই মাধবীকে পোষ্ট অফিসে রেখে বড়দাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এখানে। বড়দাও অফিসের পথে পা বাড়িয়েছিল রাস্তায়, সেখান থেকেই তাকে পেয়ে গেছে শ্যামল। বড়দা পোষ্ট অফিসে আসার পর বেশ খানিকটা হাসি ঠাট্টার পর মাধবী ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার আকাঙ্খিত পার্শেলটা নিয়ে বেড়িয়ে এল পোষ্ট অফিস থেকে। বড়দা ছুটলেন বাস ধরতে। মাধবী আর শ্যামল এসে দাড়াল বড় রাস্তার মোড়ে। 'এবার তুমি কি করবে বল বাড়ী যাবে না অফিস?' শ্যামলকে জিজ্ঞেস করে মাধবী। 'না এখন আর আমাকে ঢুকতে দেবে না অফিসে। আমি বরং স্কুলের সামনে খানিক দাঁড়িয়ে ছোটনকে নিয়ে চলে আসি বাড়ীতে। হাতে পয়সা কড়ি বেশী নেই, তুমি বরং কালকের কয়েকটা টুকিটাকি বাজার সেরে নিয়ে বাড়ী ফের।' মাধবীকে কথাটা বলে শ্যামল এগিয়ে গেল বাস ধরবার জন্য।

মাধবী হাঁটছে বাজারের পথে, ভালই বলেছে ও স্কুলে যখন যাওয়াই হলনা তখন কালকের বাজারটা সেরে নিলে কাজ এগিয়ে থাকে অনেক। বাজারে ঢুকেই সোনালী চুল ফর্সা তরকারী ওলার কাছে এসে আনাজের দর করতে শুরু করল মাধবী।

'আপনার হাতে ওটা কি দিদি।'

'এটা পার্শেল।' মাধবী উত্তর দেয়।

'পার্শেল—দেখি দেখি।' পার্শেলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে

সোনালী চুলওলা লোকটা। তারপর এক গাল হেসে বহু পরিচিত ক্রেতা মাধবীকে জিজ্ঞেস করে সে 'এতে কি 'আছে দিদি ?'

'এতে শাড়ী আছে।'

'বাব্বা। দু'হাজার টাকা দামের শাড়ী। একটু খুলে দেখাবেন ?' খানিকটা বিরক্ত হয় মাধবী। 'আমার সময় নেই ভাই, বাজার করে এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। লোলুপ চোখে পার্শেলটা মাধবীর হাতে তুলে দেয় লোকটা বেশ একটু অবাক হচ্ছে মাধবী, আজ বাজারের লোকগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। পার্শেলটা যেন খানিকটা সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে তার। কেউ জানতে চাইছে ওটা কি ? কেউবা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। তারপরই প্রশ্ন ভিতরে কি আছে ? গায়ে লেখা নেট অ্যামাউন্ট অফ রুপিজ টু থাউজেন্ট ওনলি কথাটা কেউ বুঝছে, কেউ বা বুঝছে না। যে বুঝেছে সে পাশের জনকে বলছে, শাড়ীরে, দু'হাজার টাকার শাড়ী পাঠিয়েছে দিদির জন্য বাইরে থেকে।' আসামটাও বাইরে অথবা বিদেশ হয়ে যাচ্ছে নাকি, মাধবী ভাবে, তাই মাছের বাজার চালের বাজার যেখানে মাধবী দাড়াঁচ্ছে অথবা দাড়াঁচ্ছে না চেনা জানা সকলের একটাই প্রশ্ন 'ওটাকি, ওতে কি আছে ? বাব্বা এত দাম ! দিদির কি মজা, একটু খুলে দেখাবেন আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থাক, থাক !' কেউ একটু বেশী আনাজ দিয়েছে আজ মাধবীকে। কেউবা পয়সা কম নিয়েছে তার থেকে। কেউ বেশ সমীহ করেছে অন্যদিনের তুলনায়, কেউবা মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়েছে ভাগ্যবানের লটারী পাবার মতো চোখ ক'রে। আচ্ছা, পার্শেলটা কি বেশ একটা জাতে তুলে দিয়েছে তাকে। মনে মনে ভাবে মাধবী তবে কি এসব জিনিষ মানুষকে জীবনের আরো খানিকটা নতুন মাত্রা যোগ করে দেয় আচ্ছা বাড়িতেও কি ওই একই অবস্থা হবে। ছেলে মেয়েরা জানতে চাইবে একই ভাবে। বাজারের এই দীনমজুর সাধারণ মানুষগুলোর কাছে কি পার্শেল আসেনা কখনো। কেউকি উষ্ণ ভালবাসা আর আবেগ নিয়ে কোন কিছু কখনো পাঠায়না এদেরকে।....সত্যিই পার্শেলটা হাতে পেতে আজ কি হেনস্থাই হতে হ'ল দু'জনকে, বলে কিনা 'উনি যে আপনার স্বামী আগে তার প্রমাণ দিতে হবে আপনাকে।' সত্যিই কি সর্বনাশের কথা।

বাড়ীতে ফিরে এসেছে মাধবী। খাটের ওপরে সবাই ঘিরে বসেছে

তাকে। শ্যামল বললো 'দাও আমিই না হয় খুলি পার্শেলটা।'

'না আমি খুলব।' একেবারে ছোট হয়ে গেছে যেন মাধবী, একেবারে বাচ্ছা শিশু? ছোট ছোট চুলের কুচিগুলো এসে পরেছে তার ফর্সা গালে। কপালের সিঁদুরটা জলজল করছে। মেয়ের মাষ্টার মশাই ও এসে বসে আছেন পড়াবার জন্য। কিন্তু ছাত্রীর মন তখন মায়ের পার্শেল খোলা হবে সেই দিকে। সকলেই বসে আছে হাঁ-করে। ইন্সিওর্ড পার্শেলের মোড়কটা খুলে ফেলেছে মাধবী। আরে! তার ওপর জড়ানো মায়ের সেই পুরনো শাড়ীর টুকরোটা। বড় প্রিয় ছিল এই শাড়ী। মা খুব যত্ন করে রাখত। শাড়ীটা বাবা কিনে এনেছিল বিবাহবার্ষিকীতে। অনেক ছোট তখন মাধবী। আজও সব স্পষ্ট মনে আছে স্মৃতিতে। মা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করেছিলেন ওটা নিয়ে। অনেকবার পরেছেন মা এই শাড়ী, বাবা একবার বলেছিলেন, 'তোমাকে এটা পরলে দারুণ লাগে আমি মরে গেলে এই শাড়ীটা তোমাকে আমার কথা বলবে, মা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন বাবার সেই কথা শুনে। আজ সেই শাড়ীটাই ছিঁড়ে পার্শেলটা মুড়ে সেলাই করে দিয়েছে। পিওর সিল্কের শাড়ীর ফিনফিনে টুকরোটা জুড়ে একরাশ লাল নীল সাদা ফুল যেন হুরোহুরি করে লুটোপুটি খাচ্ছে। দূরে বিয়ে বাড়ীর সানাই-এর সুর ভেসে আসছে। বাবা বেঁচে নেই এখন। সেই সব স্মৃতি। জীবনের চলে যাওয়া ব্যাথা ভরা কত কথা ঘুরে ফিরে মনে পরছে বারবার। দূর থেকে সানাই-এর সুর অবন ঠাকুরের 'রাজ কাহিনী' গল্পের সুরে বেজে চলছে 'ভোরভয়ি, ভোরভয়ি।'

মাধবী আর খুলতে পারছে না পার্শেলটা। কোথায় যেন একটা জট লেগে গেছে তার। শ্যামল জিজ্ঞেস করে—'কি হল, খুলতে পারছ না? ওইতো গালায় আটকে গেছে, দাও—আমি খুলে দিচ্ছি।'

ব্লেড দিয়ে কাপরের টুকরোটা কাটছে মাধবী। খুব সন্তর্পনে, যেন ভিতরের নতুন শাড়ীতে আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে ফিনফিনে গুটি পোকাদের লালায় তৈরী একটা নতুন মুগার মেখলা চাদর। লাল সুতোয় আঁকা এক একটি মঙ্গল ঘট, আম্রপল্লব মাথায় আর দুদিকে এক একটি কলা গাছের সার।

'বাঃ চমৎকার।' মাষ্টার মশাই উচ্চারণ করেন কথাটা। 'ছোটবেলায় আমাদের বাড়ী এ রকম একটা পার্শেল এসে আনন্দের ঢেউ তুলে দিয়েছিল একেবারে। আসলে মাঝে মাঝে এ রকম কিছু হলে খুব ভাল লাগে, জীবনের

স্বাদ পাল্টে যায়।'

শ্যামল আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে সুন্দর মুগার মেখলা চাদরটা যা সে এতদিনেও কিনে দিতে পারেনি স্ত্রীর জন্যে, তার লাইফ ইন্সিওরেন্সে চাকরী করা খুব বড় অফিসার 'ভায়রা' সেটা সম্ভব করেছে স্নেহ আর অর্থের সামর্থ্য ঘটিয়ে।

মাধবী দেখছে মায়ের ছেঁড়া শাড়ীর টুকরোটা। বাবার ভিষণ ভাল লাগা ভালবাসার শাড়িটা যেটা সে এই মাত্র ব্লেড দিয়ে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করেছে। যেটা মা জড়িয়ে দিয়েছে নতুন প্রজন্মের জন্য। বাথরুমের কোনায় একটা গর্ভিনী মাকড়শার কথা মনে পড়ছে তার।

জীবনের সময় আর সিড়িগুলো এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। বিয়ে বাড়ীর সানাই, একটা ইন্সিওর্ড পার্শেল আর ছেঁড়া শাড়ীর টুকরো এগিয়ে চলেছে সম্মুখে, সঙ্গে নিয়ে একটা নতুন মেখলা চাদর—যার গায়ে ঝুলছে এক একটি মঙ্গল দীপ শঙ্খ আম্রপল্লব আর কলা গাছের সারি।

অন্তর্লীন টান

দ্বিজরাজ সান্যাল

হরিরা সব ভাইবোন দুই জামাইবাবুকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে বাড়ির উঠোনে। মাঝে এক বড় কাঁসার থালায় আমের টুকরো পরিষ্কার করে কাটা। ল্যাংরা খিরসাপাতি হিমসাগর এসবের পাঁচমিশেলি। গল্পের ফাঁকে আমের টুকরো গালে পুরে দিয়ে বেশ জমে উঠেছে পরিবেশ।

রাণাঘাট ছাড়িয়ে গেদে বানপুর লাইনে বগুলা। এখানে বিঘেখানেক জমির ওপর হরিদের একতলা সেকেলে বসতবাড়ি। শোবার ঘরদুটোর লাগোয়া তাগড়া কটা আমগাছে বেশ ফলন হয়েছে এবার। ভার সামলাতে ডালে বাঁশের ঠেকা লাগাতে হয়েছে জায়গায় জায়গায়। অনেক ঝড়ঝাপটা বিপত্তি কাটিয়ে হরিদের জীবন আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং সুখী।

প্রত্যেক বছর আমের সময় এ বাড়িতে সব ভাইবোনেরা একসঙ্গে জড়ো হয়। ঘরময় পড়ে যায় হই হই রব। আম এবার একটু আগেই পেকেছে। সবার প্রথম এসেছে মিনুদি আর অরণিদা। হাজারিবাগ থেকে হরির ছোড়দি আর ছোটজামাইবাবু। সঙ্গে মিষ্টি মেয়ে মাম্পি। এর দিনতিনেক পর বোম্বে থেকে অনুদি, নির্মলদা আর তাদের দুই দস্যি ছেলে রাজা, রানা। কাল শেষ গেদে লোকালে হরির সেজদা দুলালও এসে গেছে কোলকাতা থেকে। মা, বড়দা, বড়বৌদি আর মেজদার সঙ্গে হরি এবাড়িতেই থাকে। দুবছর আগে আশ্বিনমাসে বাবা মারা গেছেন।

হরির দিদিরা যথেষ্ট সুপাত্রস্থ হয়েছে। অরণিদা হাজারিবাগ রিজার্ভ ফরেস্টের পদস্থ অফিসার। নিজের অরণ্যজীবনের নানা রোমহর্ষক কাহিনী শোনালেন বেশ বাগিয়ে। এর কিছু কিছু অবশ্য হরি আগেই শুনেছে। অরণিদার পালা শেষ হতেই সকলে নির্মলদাকে চেপে ধরল। তিনি গুনী-মানুষ। বোম্বে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার। নির্ভেজাল ভালোমানুষ। প্রথমেই তিনি স্বীকার করে নিলেন

—তাখো আমি কিন্তু অরণির মত বাঘসিংহের গল্প জানিনা। নিজের সাবজেক্টের ওপর দু'একটা ঘটনার কথা বলি। তোমাদের পছন্দ না হলে বোলো

কেমন। নির্মলদা গল্প বলতে রাজী দেখে অনুদিও যেন বেশ অবাক। ফিজিক্সের মত অমন খটমটে বিষয়কেও যে এত মনোগ্রাহী করে বলা সম্ভব কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি হরি। কমার্সের ছেলে হয়েও মশগুল হয়ে সে বড় জামাইবাবুর কথা শুনছিল। দুলালদা ফিজিক্স নিয়ে কোলকাতায় এম. এস. সি. করছে। দু' একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সে করছে।

এমন সময় মা এসে দাঁড়ালেন উঠোনে। মুখময় হাসি।

—তোরা কি গল্প করছিস রে। আমাকে শোনাবি না ?

এতক্ষণ মা রান্নাঘরে নাতি নাতনীদের আম কেটে খাওয়াচ্ছিলেন।

—মা তুমি আমার ছেলেদুটোকে কোথায় রেখে এলে গো ? অনুদি উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলেন।

—ওরা তিন ভাইবোন মিলে মাঝের ঘরে খেলা করছে। কিছু দুষ্টুমি করবে না তোর ছেলেমেয়েরা।

মিনুদিও তার মেয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হতে চায়।

—তুমি মা মাম্পিকে একগাদা আম কেটে খাওয়াওনি তো।

—না রে বাবা না। ছেলে মেয়েদের নিয়ে এখন থেকেই অত আতুপুতু করিস নে। পরে সামলাতে পারবি না। কথাগুলো বলে নির্মলদার পাশে ধপ করে বসে পড়ে মা বলল—বলো নির্মল, আমিও শুনি তোমাদের কথা।

মৃদু হেসে নির্মলদা খানিক আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। মেজদা মাকে তাড়া লাগালো।

—তুমি জামাইবাবুর কথা কি বুঝবে। যাও দেখ নাতি নাতনিরা কি করছে।

—খুব বুঝব আমি। তুই চুপ কর তো।

অরুণিদা হেসে শাসন করলেন মেজদাকে,

—মা যখন শুনতে চান শুনুন না। তুমি বাধা দিচ্ছ কেন। একটু আগেই নির্মলদা সাইক্লোটোনের কথা বলছিলেন। এই মেশিনে নাকি পরমাণুকে তার সব সাবপার্টিকেলে ভাঙা যায়। হরির কি খেয়াল হয়, মাকে সে বলে।

—আচ্ছা মা তুমি তো সব জানো। বলো দেখি সাইক্লোটোন কি ?

হরির দিদি দাদারা এমনকি বৌদিও মিটিমিটি হাসছে।

প্রত্যেকের মুখের দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে মা বলল,

—এ আর এমন কি প্রশ্ন। বিয়ের আগে যখন শান্তিপুরে থাকতাম ঐ ঝড়েই তো একরাতে আমাদের রান্নাঘরের টিনের চাল বহুদূরে একটা পুকুরের

বুকে গেঁথে গেছিল।

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই হাসিতে উঠোন খান খান। মেজদাই সবার প্রথম হো হো শব্দে হেসে উঠেছে। মিনুদি আর অনুদির চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে জল। হরির পেটে তো খিল ধরার উপক্রম। হাসি যেন কারো থামতেই চায় না। শুধু নির্মলদা ভদ্রতা রক্ষার্থে শুধু মুচকি হেসেছেন। হাসির শব্দে বাচ্চারাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এবার মা বেশ বিব্রত, বুঝতেও পারছেন না ছাই ঠিক কি হলো,

—কি রে পাগলের মত হাসছিস কেন? সবকটা দম আটকে একসঙ্গে মরবি যে।

নিজেকে কোনমতে সামলে বড়দা বলল,

—তুমি কি গো মা। একটা কিছুরও মানে জানো না?

নির্মলদা তার স্বভাব মতো শাশুড়িকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন,

—মা আপনি যে ঝড়ের কথা বলছিলেন তার নাম সাইক্লোন। সাইক্লো-টোন একটা মেশিনের নাম।

ঠিক কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে মা নিজেই হেসে ফেললেন এবার,

—ঐ একই হলো। লেখাপড়া তো বাবা করতে পারিনি মোটেই। ইস্কুলে যাবার আগেই বাড়ির লোকেরা ঘাড় ধরে পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে এ সংসার ঠেলছি। তারপর মা ছেলেদের দিকে হুংকার ছুঁড়ল,

—এই যে তোরা আজ যা কিছু করে কম্মে খাচ্ছিস—মনে রাখিস এ সবই পারছিস এই আমার জন্যে! তোদের বাপ যা হতচ্ছাড়া ছিল আমি না হাল ধরলে এখন হয়ত ট্রেনে বাসে লজেন্স চানাচুর হকারি করতে হত। আমাকে নিয়ে মস্করা বেরিয়ে যেত।

এই পরিস্থিতির স্রষ্টা যেহেতু হরি। তাই সব ব্যাপারটা আলাদাভাবে উপভোগ করছে সে।

এমনি সময় মতি হাম্বা হাম্বা করে ডাক পাড়ল।

—হরি যা শিগ্‌গীর গোয়ালে যা। ভাগ ওর কি হলো।

মতি মায়ের প্রাণ। চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরিকে তাই এখন এই মজলিশ ছেড়ে দৌড়তে হল গোয়ালে। মতিটাকে আজকাল একমুহূর্তও সহ্য করতে পারে না সে।

হরি তখন খুব ছোট। বাবারা সব ভাই মিলে এক সংসারে ছিল। সে সময়

তাদের গোয়ালভরা গাই ছিল। সুপুষ্ট ধবধবে গরু, হরির ক্ষীণ মনে পড়ে। তারপর কাকা জ্যাঠাদের মধ্যে ভাগাভাগি হল, গরুগুলোও সব মরে গেল পটাপট। শেষ অবধি এই এক মতিতে ঠেকেছে। একচিলতে জায়গা ছাড় দিয়ে বাকি গোয়ালঘরটা খানিক অদলবদল করে বানানো হয়েছে পাটগুদাম। লীজে ভাড়া দেওয়া হয়। মতিকেও তো বিদেয় করে দিলে হয়। আর সকলেরই মত আছে। শুধু ব্যাগড়া দিচ্ছে মা। হরির মা-ই আগে আগে মতির দেখাশোনা করত। একবার গোয়ালঘরে পা পিছলে পড়ে হাঁটুর চাকতি ভাঙল মায়ের। তারপর থেকে হরির ওপর দেখভালের ভার পড়েছে। এখন মতির যাবতীয় ঝক্কি তাকেই পোহাতে হয়। শীত বর্ষা নেই সাতসকালে উঠে মাঠে চড়াতে নিয়ে যাওয়া, খড় খোল গুলে জাবনা বানানো, সকাল সন্ধ্যে গোয়াল নিকোনো, দুধ দোয়া, মশা তাড়াতে ধুনো। হরি আর পেরে উঠছে না মতিকে নিয়ে। স্কুলে পড়ার সময় মতির যত্নআত্তির নাম করে প্রায়ই পড়ায় ফাঁকি দেওয়া যেত। বেশ লাগত হরির। কিন্তু এখন সে বি. কম. পড়ছে। কত পড়ার চাপ। তাছাড়া পড়ার আগ্রহও বেড়েছে। গতবছর এই মতিরই জালাতনে তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অ্যাকাউন্টেন্সী পরীক্ষাটা খারাপ হয়েছে। খুব খাপ্পা হয়ে পরীক্ষা শেষে হরি এক দালালকে ধরে এনেছিল বাড়িতে। মতিকে কিনতে চায় শুনে মা লোকটাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন।

সাতদিন বাড়িতে আনন্দস্রোত ভাসিয়ে হরির দুই দিদি একে একে যে যার জায়গায় রওনা হল। বোম্বেতে কাজের লোকের আকাল বলে মিনুদি হরিকে বগুলা থেকে একটা অল্প বয়েসী ছেলে জোগাড় করে দিতে বলেছিল। কেউ রাজী হয়নি। বোম্বেতে ফিল্মিস্টার হতে অবশ্যই যাওয়া যায় কিন্তু সেখানে গিয়েও সেই বাসনমাজা কাপড় কাচা। সবছেলেই গড়রাজী।

পরদিনই ভোরে পাশের গ্রাম ময়ূরহাট থেকে ফজলুল এসে মাকে বলল

—চাচি তোমার মা ইঁদারাপাড়ে চান করতে গিয়ে কাল পা ভেঙেছে। শিগগীর বাড়ি চলো। ফজলুল হরিদের দিদিমার প্রতিবেশী।

—সে কিরে। মার চোখ কপালে ওঠে। নাঃ বুড়িটাকে নিয়ে আর পারি না। গেলবারই কত করে বারণ করে এলাম একা একা চান করতে যেও না। বুড়ি সেই গেছে।

মাকে এখুনি ময়ূরহাট যেতে হবে। বৌদি তাড়াতাড়ি একটা ছোট হাত ব্যাগে মায়ের কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে দিল। সঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে মা ফজলুলের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন,

—বৌমা আমার ফিরতে তিনচারদিন দেরী হবে। সাবধানে থাকিস তোরা। হরি মতিকে দেখিস।

মতি। হরির মাথায় ক্রত শব্দটা একবার খেলে গেল। এই মোক্ষম সময়। কাছেই বড়দার ওষুধের দোকান। হরি ছুটল সেখানে। পৌঁছে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,

—বড়দা। মতিকে আজই পাচার করতে হবে। মা খানিক আগেই দিদিমার কাছে গেছে।

শান্ত গলায় বড়দা হরিকে জিজ্ঞেস করে,

—মতির জন্যে সত্যিই কি তোর পড়াশোনার খুব ক্ষতি হয়?

—হ্যাঁ ভীষণ। ও এরকম জ্বালালে আমার পড়াই ছেড়ে দিতে হবে।

—মা কবে ফিরবে?

—তিনচারদিনের আগে তো নয়।

—তাহলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

—মা কিছু ঝামেলা করলে তুই সামলাবি তো? অনুমতি নেওয়ার চেয়েও বেশী ভরসার জন্যেই হরি বড়দার কাছে এসেছে।

ঝক্কি পোহাতে রাজী হলেও বড়দা পেছনে একটা ফ্যাচাং জুড়ে দিল,

—শোন, আগে বিপুলের সঙ্গে একবার কথা বলে নে।

বিপুল হরির মেজদা। পাটের ফাটকাবাজির ব্যবসা। সারাক্ষণ মটর সাইকেলে চড়ে এদিক ওদিক ধান্দা করতে হয়। দেখা মেলাই ভার। হরির বরাত ভালো। শিবুর চায়ের দোকানে মেজদা বসে, দাদাকে ডাকল সে।

—কি হয়েছে কি? উঠে আসায় বিরক্ত বিপুল।

—মেজদা দিদার পা ভেঙেছে।

—শুনেছি। আমি কি করবো?

—মা তাই দু'তিনদিন ওখানে থাকবে। এই ফাঁকে মতিকে বেচে দেব ঠিক করেছি। বড়দা রাজী, তুই?

—আমাকে এককথা এতবার জিজ্ঞেস করিস কেন। কবেই তো তোকে বলে দিয়েছি, বেচে দে। যে গরু দুধ দেয় না তাকে রেখে কোন লাভ নেই।

কার কাছে বেচবি ?

—উপেনদার কাছে।

—দেখিস শালা কিন্তু মহা ধড়িবাজ। দামে ঠকায় না যেন।

সেদিনই বিকেলে উপেনদা সঙ্গে লোক এনে মতিকে নিয়ে গেল। ভালো দামেই সওদা হয়েছে। যখন ওর সামনে দর কষাকষি চলছিল তখন মতি বিপদ আঁচ করে হরির দিকে গরুর সরল ছলছলে চোখে তাকিয়ে শেষ মিনতি জানিয়েছিল। কিন্তু হরিই বা কি করবে। একদম একা কত আর ঝক্কি সে সামলাতে পারে। একটা গরুর পরিচর্যার চেয়ে নিজের কেরিয়ারটা নিশ্চয় তার কাছে বেশী প্রয়োজনীয়। মনকে কঠোর রাখার চেষ্টা করছে হরি। তবু লোকটা যখন অবাধ্য মতিকে বশে আনার জন্যে ওর গলার দড়িতে জোড় হ্যাঁচকা টান দিয়েছিল, নিজের অজান্তেই হরির গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল অস্ফুট আর্তনাদ,

—আঃ একটু আস্তে।

মতিকে নিয়ে উপেনদারা চলে গেল। চলে যেতে যেতে হরির দিকে মতি আরও একবার তাকাবার চেষ্টা করল।

ঠিক পরের দিন। সবাইকে বিস্মিত করে ফিরে এলো হরির মা। বৌদিই প্রথম দেখেছিল মাকে রিক্সা থেকে নামতে। সঙ্গে ফজলুল। ঘরে এসে ঠাকুরপোকে বলেছিল,

—হরি মা ফিরে এসেছেন।

—অ্যাঁ।

মাঝের ঘরে হ্যারিকেনের সলতে কাটছিল হরি। এমনই চমকে উঠেছিল যে আর একটু হলেই তার আঙুল কেটে যেত,

—কি হবে এখন বৌদি।

—কি আর হবে। তুমি আমি সবাই একসঙ্গে ডুবব।

মা ততক্ষণে রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে লম্বা হাঁক দিলেন।

—হরি এদিকে আয়।

পায়ে পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হরি।

—ঘোড়গোড়ায় হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন। ব্যাগটা ধর।

তাড়াতাড়ি গিয়ে হরি মায়ের হাত থেকে ব্যাগটা নিল।

—ফজলুল তুই উঠোনে বোস। হরি বৌমাকে বল ফজলুলকে কিছু খেতে

দিতে। আমি কলঘর থেকে হাত পা ধুয়ে আসছি।

মাথা নেড়ে হরি দ্রুত ব্যাগহাতে ঘরে ঢুকে যায়। ভেতরে এসে হরি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক মা এখনো টের পায়নি। যত দেরীতে জানতে পারে মঙ্গল। সোজা রান্নাঘরে এল হরি,

—বৌদি ফজলুল উঠোনে বসে আছে। ওকে কিছু খেতে দাও।

নলেন গুড়ের কাঁচাগোল্লার দুটো বড় দলা আর একবাটি মুড়ি নিয়ে তৈরীই ছিল বৌদি। শরীরটা রান্নাঘরে থাকলেও কান কিন্তু তার উঠোনেই পড়েছিল। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল,

—হ্যাঁ রে হরি। মা কিছু জানতে পেরেছে।

—না এখনো বোঝেনি।

হরির মুখ বন্ধ হওয়ার আগেই মা হরি বলে মস্ত এক হাঁক পাড়লেন। অমনি হাত পা হরির অর্ধেক পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। গুটি পায়ে হরি বাইরের দিকে এগোলো। মা ততক্ষণে উঠোন টপকে সদর দরজায় এসে ছেলের মুখোমুখি হয়ে জিগ্যেস করল,

—গোয়ালের কাছে দড়ির খুঁটোটা পড়ে আছে দেখলাম। মতিকে সাত-সকালে কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলি ?

হরি নির্বাক। বৌদিও এসে পাশে দাঁড়িয়েছে ফজলুলের খাবার হাতে। হাঁটুজোড়া যেন হরির অবশ হয়ে আসছে। নিরুপায় সে বৌদির দিকে তাকালো করুণ চোখে।

কর্কশ চড়া গলায় মা বলল,

—তোরা চোখাচোখি করছিস কেন। বল শিগ্গীর মতির কি হয়েছে।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাঁপা গলায় বলল বৌদি,

—না মানে সেরকম কিছু না মা। কাল মতিকে একজন এসে নিয়ে গেছে।

—কি বললে তুমি। হরি তুই মতিকে বিক্রি করে দিয়েছিস ?

পাথরের মত হরির চোখে চোখ রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর অচমকা মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে উঠোনে বসে পড়লেন মা। চমকে উঠে দু'হাত লাফিয়ে পিছিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল হরি। যেন অন্য কারোর মা। এইভাবে হরি নিজের মাকে দেখছে।

ততক্ষণে মা প্রায় মরাকান্না শুরু করে দিয়েছে,

—হায় আমার কি হলো গো। আমার সব গেল। একটা মাত্র সাধের

জিনিষ তাও নিয়ে গেল গো। এখন আমার কি হবে।

মুড়ির বাটিটা ফজলুলের হাতে ধরিয়ে বৌদি মাকে সামলাতে এগিয়ে গেল,

—মা আপনি শান্ত হোন। ঘরের ভেতরে চলুন।

এক ঝামটা মেরে বৌদিকে মা সরিয়ে দিলেন,

—দূর হয়ে যাও হতভাগা সব আমার সামনে থেকে। যেমন বাপ ছিল অনাছিষ্টি তেমনি হয়েছে ছেলেগুলো। সবকটা মিলে আমার সংসারটা ছারখার করে দিলো।

রাস্তার ধারে বাড়ি। হালদার বাড়িতে আবার কি অঘটন ঘটল ভেবে দু'একজন এরই মধ্যে খোঁজ করে গেল। সতুর মা কাজে এসে জিগ্যেস করে,

—কি মাসী কাঁদছ কেন?

সবমিলিয়ে মুহূর্তে এক শোকের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। মা পা ছড়িয়ে বসে মাথা চাপড়ে এখনও তাকে দুষে চলেছে। হরির আর সহ্য হয় না। সবার আগে বড়দার কাছে ছুটল। সব বলল। বড়দা দোকান থেকে এল। বাইরের লোকেদের ভীড় ঠেলে মার কাছে এসে বলল,

—একি তুমি এখানে বসে কেন? ভেতরে চলো।

—না আমি যাবো না। আমি আর কোনদিন ঘরের ভেতরে ঢুকব না।

—মা বাড়ির ব্যাপার বাইরে পাঁচকান করার কি দরকার। চলো ঘরে চলো তারপর তোমায় সব বলল।

বাইরের লোকেদের উদ্দেশ্যে বড়দা বলল,

—আপনারা এখানে শুধু শুধু ভিড় করছেন কেন?

তারপর মাকে নিয়ে এলো শোবার ঘরে। তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে মা। বড়দা মায়ের হাত ধরে শান্ত গলায় বলল,

—হরির পড়ার অসুবিধে হচ্ছিল বলেই তো মতিকে দিতে হয়েছে। তাছাড়া কিই বা দুধ দিত বলো। দিনে মাত্র একসের।

আবার মা চিৎকার করে ওঠেন,

—যতদিন ও সের সের দুধ দিয়েছে ওকে কদর করেছিস আর যেই কমে গেছে অমনি কসাই এর হাতে তুলে দিবি। তাহলে এবার আমিও তো বুড়ো হয়েছি। দে আমাকেও গলায় দড়ি বেঁধে হাটে বেচে।

—হরির পড়াশোনায় ব্যাগড়া দিচ্ছিল মতি।

—চুপ কর তুই।

এরপর আর কোন কথা হয় না। বৌদি আবার ঘরে ঢুকে মাকে বোঝাতে গিয়ে অনেক অকথা-কুকথা শুনেছে পরের মেয়ে বলে।

মেজদার কথাবার্তা একটু কাঠকাঠ। এসেই মাকে প্রায় ধমকের সুরে বলেছে,

—কি হয়েছে কি মতিকে নিয়ে তোমার এত লাফালাফির কি আছে, ঐ চিমসে গাইকে বিক্রি করে বরং হরি অনেক বেশীই দাম পেয়েছে।

মেজদার দিকে মা প্রায় তেড়ে গেছে,

—দূর হ তুই হতভাগা। ব্যবসা করে করে মন থেকে মায়া মমতা সব বিদেয় করেছিস। পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনিস না। মতিকে আমি কি ভালোবাসতাম তুই কি বুঝবি।

সত্যিই এসব বোঝার কোন ইচ্ছেই মেজদার কোনদিন নেই।

বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বাড়ির স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ব্যতিক্রম শুধু দুটি। মা দরজা বন্ধ করে এখনও ফুঁপোচ্ছে। আর এদিকে হরির গলায় বুকে চরম অস্বস্তি।

বৌদি মাকে খাবার জন্য বার দশেক অনুরোধ করেছে। মা কোন সাড়া দেয়নি। আর ঘরে থাকতে পারছে না সে। এরকম দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে সে দেহ মনে মুক্তি খুঁজছে। সাইকেলে চেপে বেরিয়ে পড়ার আগে বৌদি বলে,

—হরি, ভাত খেয়ে যা।

—ইচ্ছে করছে না। সাইকেলে চড়ে সে বেরিয়ে যায়।

রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল থেকে মনের ওপর যা চাপ পড়েছে হরির আরও ঘুম পেয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু পাচ্ছে না। সকাল থেকে কিছু পরেও নি পেটে। সন্ধ্যেবেলায় পেটটা চোঁচোঁ করছিল। দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছে। মা না খেলে সে কিছুতেই খাবে না। রাতেও মা দরজা খোলেনি। হরির খিদে এখন মরে গেছে। চিৎ হয়ে বুকে হাত রেখে তক্তোপোশে সে শুয়ে আছে। তন্দ্রা মত এসেছে। হঠাৎ মতির মুখটা হরির সামনে ভেসে উঠল, উপেনদার লোক ওকে টানছে, আর মতি ঘাড় ঘুরিয়ে হরির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দিকে গোবেচারা ছলছলে চোখে সে যেন মিনতি জানাচ্ছে, আমি আর কদিনই বা বাঁচব হরিদা। আমাকে আর এভাবে তাড়িও না।' তারপরই মায়ের কান্নাভেজা দুটো চোখ ভেসে উঠেছে। তন্দ্রা ছুটে গেল হরির। টনটন করে ওঠে তার বুক। মায়ের জীবনের শেষ আহ্লাদটুকু ছিনিয়ে নেওয়ার কোন অধিকারই তার নেই। সত্যিই তো মা ঠিক বলেছে

পড়াশোনা হবার হলে এমনিই হয় কেউ বাধা তৈরী করতে পারবে না। তা না হলে বাগদীপাড়ার পঞ্চু দশভাইবোনের সঙ্গে এক ঘরে থেকেও জয়েন্টে চান্স পেত না। নিজের সামান্য অস্তিত্বকে মতির অজুহাতে চালানো তার উচিত হয়নি। মতি তাদের কোন সম্পত্তি নয়, তাদের পরিবারেরই একজন। মায়ের স্নেহের, আহ্লাদের পাত্র। এ সত্যও হরি এই মুহূর্তে অনুভব করছে। তাছাড়া মতির জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত হয়ে সে নিজেও অবচেতন মনে মতিকে কম ভালোবাসে না। না মতিকে এভাবে ভুলে যেতে সে নিজেও পারবে না। তন্দ্রা আসা আর যাওয়ার ক্লান্তিতে সবে হরির একটু ঘুম এসেছে। তার গায়ে নরম স্পর্শ।

—কে। চমকে উঠে বসল সে। মা তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলেছে। শান্ত গলায় কেটে কেটে বললেন—সারাদিন তুইও না খেয়ে আছিস। বৌমা বলছিল। তোর এতক্ষণ উপোস করার কখনো অভ্যেস নেই। যা হয়েছে হয়েছে, আর কখনো এমন করিস না। রান্না ঘরে আয়, আমি ভাত বাড়ছি।

আর পারল না হরি। মাকে দু'হাতে আঁকড়ে হাউ হাউ শব্দে সে কেঁদে উঠল,

—মা আমি কালই মতিকে ফেরৎ নিয়ে আসব। যেখান থেকে হোক।

হরির কান্না যেন আর থামতেই চায় না। বুকের ভেতরের চাপ যন্ত্রনাটা হরির চোখের জলে গলছে ধীরে ধীরে।

ছাদ নেই

দীপক সরকার

রাধামোহন সামন্ত টেপরেকর্ডটা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ নিঃস্তব্ধতা সারা দিনের ব্যস্ত দু'কামরার ফ্ল্যাটটাকে ঘিরে ফেলে। এ্যালু-মিনিয়ামের ইজিচেয়ারে একটু আরাম করে বসেই করিডোরের দিকে তাকিয়ে দেখে, ছন্দা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নির্মীয়মান স্টেডিয়ামের দিকে।

রাধামোহন আস্তে আস্তে এসে ছন্দার কাঁধে হাত রাখল মাত্র, ছন্দা চমকে তাকায় তার দিকে। তাদের ফ্ল্যাট বাড়ী আর নির্মীয়মান সল্টলেক ষ্টেডিয়ামের দু'নম্বর গেটের মাঝখানের পিচের রাস্তার ওপর প্রায় লোকজন নেই বললেই হয়। রাস্তাটা মোটামুটি আধা অন্ধকারও বটে। বাইপাশের দিকে রাস্তার ওপর আসা লোকটার ছায়া ভুতুড়ে ধরণের লম্বা থেকে আরো লম্বা হতে হতে তাদের বাড়ীর কাছের ল্যাম্প পোস্টের তলায় দীর্ঘতর হতে থাকে। রাধামোহন একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে বলে, 'ছন্দা, গতকাল আর আজকের ভেতর কত প্রভেদ'।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, গতকাল আমাদের ঠিকানার কোন নিঃশ্চয়তা স্থায়িত্ব কিছুই ছিল না। আজ আমাদের সব আছে। আমাদের কত দিনের আশা এই পূর্বাচল আবাসনে এসে হাসি মুখে দাঁড়িয়েছে।'

রাধামোহনের মুখ উজ্জ্বলতায় ভরে ওঠে, 'আজ আমাদের সব আছে। আমরা কত সুখী বল।'

সেই মুহূর্তেই পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটার তীব্র কান্নার শব্দ এসে ধাক্কা মারে তাদের ছোট ব্যালকনিতে। রাধামোহন আর ছন্দা নিঃসহায়ের মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দক্ষিণ খোলা ব্যালকনিতে গরমের দিনে সন্ধ্যার হাওয়া প্রথম শিশু রাত্রির মিষ্টি হাওয়া তাদের কাছে ভীষণ ক্লান্তিকর ভয়াবহ বলে মনে হয়, দু'জনেই প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢোকে।

'ছন্দা দাবা খেলবে'?

'না'।

গৃহ প্রবেশের ঘট আলপনা ফুলের মালা সব চুপচাপ যে যার সাজানো

—●

পরিবেশে মুখ আলো করে বসে আছে। এই পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে রাধামোহন আর ছন্দা। অথচ তারা দু'জনে পারেনি অনেক কিছুই।

রাধামোহন খবরের কাগজ খুলে বসে, খবরের কাগজ সারাদিনের অনেক লোকের হাতঘাঁটা হয়ে এখন বাসি ফুলের মালার মত খানিকটা শুকনো-তুমড়ানো। দু'কামরা ফ্ল্যাটের এক কামরায় বসে সে চিন্তা করে জানলার দরজায় পেলমেটে ঝোলানো পর্দাগুলো যেন তার আর ছন্দার মত ঘরের সাথে মিলে রাজযোটক হয়ে উঠেছে।

ডাইনিং প্লেস থেকে ছন্দা তাকে ডেকে ওঠে, রাধামোহন ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার ব্যস্ততা।

'এই শোন, একটা ফ্রিজ কিনলে হয় না।'

'দাঁড়াও, আগে এই ধাক্কাটা সামলে নি।'

মুখ টিপে হেসে ছন্দা বলে ওঠে, 'তা অবশ্য যা বলেছ।'

রাধামোহন একদৃষ্টে দেখে চলেছে কর্মব্যস্ত স্ত্রীকে। ছন্দা প্রচণ্ড সুন্দরী নয়, কিন্তু একটা অসম্ভব রকমের মেয়েলি কোমলতা তার শ্যামলা রংয়ের দেহকে ঘিরে থাকে। সে প্রকৃত অর্থেই সুশ্রী। এখন ছন্দা চুলটাকে খোঁপা করে বেঁধে রেখেছে, কাপড় পড়েছে আর্ট করে। সারাটা দেহের পরিষ্কার জ্যামিতিক মাপ বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। টিকালো নাকের মিষ্টি গালে কিছুটা নোংরা লেগে আছে।

রাধামোহন এসে ছন্দার গাল হাত দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে দিতেই হঠাৎ গভীর চুম্বনে আবিষ্ট করে তোলে। ছন্দা ছটপট করতে করতে পুরনো ভাড়াটে বাড়ীর পরিবেশের বুকের লজ্জা মেশানো অভ্যাসের কথা বলে,

'এই কেউ এসে যাবে'।

তারপর নিজের ভুল বোঝা মাত্র হো হো করে হেসে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই তারা ভীষণ খোলামেলা ভাবে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এই শোন, বাইরের ঘরটায় বুক সেলফটা রাখবো ?

ছন্দার কথায় রাধামোহন কিছুটা অভিনয় সুলভ ভঙ্গিমা করে বলে ওঠে, 'খবরদার না। ওটা অন্য ঘরে রাখ। শোবার সময় বই আর বৌ দেখে ঘুমনো মহা ভাগ্যির ব্যাপার।

'কেন ?'

'জানো না। দুটোর কোনটাই হাতের বাইরে হলে আর ফিরে আসে না।'

'আয়নার মুখ দেখেছ। এই বয়সে আর কেউ তোমার বউ চুরি করবে না। কারণ বউটাও বুড়ি।'

রাধামোহন চমকে ওঠে সত্যিইতো রোজ অফিস যাবার সময় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে সে ভয় পায়। আয়নার ভেতর কাঁচা পাকা চুল ভরতি মাথাওয়ালা কোঁচকানো চামড়ার মুখের মানুষটা কে? সে তো প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়। সে কখনো রাধামোহন হতে পারে না। আয়নার প্রতিবিম্ব ভুল। রাধামোহনের প্রকৃত প্রতিবিম্ব লুকিয়ে আছে তার নিজের হৃদয়ে, সেখানে সে চিরনবীন। সেই আয়নায় ছন্দার প্রতিবিম্বও চিরনবীনা। রাধামোহন ভীষণ ক্লান্ত বোধ করে। মনে হয় এক্ষুনি শুতে পারলেই ভাল।

'ছন্দা, আজ একটু তাড়াতাড়ি শোব।'

'আমারও শরীর ভাল লাগছে না। আমিও তাড়াতাড়ি শোব'।

দুজনেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব ঠিকানায়—নিজস্ব পরিবেশের বুকে প্রথমে শুয়ে পড়াটা যতটা আনন্দের ভেবেছিল, ততটা হয় না। রাধামোহন ছন্দার চুলে হাত দেয়, ছন্দা একদৃষ্টে দেখে রাধামোহনকে।

তাদের শুয়ে থাকা দুটি দেহের ব্যবধান মাত্র কয়েক ইঞ্চির। হঠাৎ ছন্দার মনে হয় এ ব্যবধান যেন তেপান্তরের মত বিস্তীর্ণ। কিছুতেই তার শেষ নেই। আসলে তারা পারেনি অনেক কিছুই। এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দু'প্রান্তের এক দিকে সে অপর দিকে রাধামোহন। মাঝখানে একটা সেতু দরকার ছিল। যে সেতু দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে দু'প্রান্তকে একাকার করে হাসি মুখে বলে উঠত 'আমিই জীবন'।

ছন্দা আস্তে করে চুল থেকে হাত সরিয়ে দেয় রাধামোহনের। ছোট করে মিষ্টি হেসে বিপরীত দিকে পাশ ফিরে শোয়। তার চোখের কোণ ফুলে ওঠে, সে একদৃষ্টে দেখে চলে জানলার ওপরের পেলমেটের সাথে ঝোলানো পর্দাকে নাইট ল্যাম্পের অল্প আলোয় সব কিছু স্বপ্নময় হয়ে উঠছে। এই স্বপ্নময় জগতের পাহারাদার হয়ে দীর্ঘক্ষণ জেগে আছে ছন্দা আর রাধামোহন গভীর ঘুমে হয়ত ভেসে যাচ্ছে সেই জগতের বুকে।

ছন্দা উঠে বসে। ডাইনিং স্পেসে এসে, কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। একটু জল খায়, তারপর বাইরের ঘরটায় এসে আয়নার মুখোমুখী দাঁড়ায়। আয়নার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে গৃহ প্রবেশের ঘট-ফুল-কচিডাব, আলপনা, আলপনার ওপর ঘটের পাশাপাশি চন্দনের ছোঁয়া পাওয়া বেলপাতা, তুলসীপাতা,

নেতিয়ে পড়া ফুল। আর তার মাঝখানে এই ঘরের চরম শূন্যতার মধ্যে আয়নার মাঝখানে ফুটে উঠেছে একাকী ছন্দার প্রতিবিম্ব।

ছন্দা একদৃষ্টে দেখে চলে নিজের প্রতিবিম্ব। একি কোন নারী—একি কোন রমণী। ছন্দা খেয়াল করে নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ। এই তার ঠোঁট, যে ঠোঁট কোনদিনো তার আর রাধামোহনের যুগ্ম জীবন্ত প্রতিভার শিশু ওষ্ঠ চুম্বন করেনি। এই তার সুউচ্চ স্তন, যে স্তন চিরদিন সুদৃশ্য মাংসপিণ্ড রয়ে গেল। হতে পারল না, ক্ষুধাতুর শিশুর খাদ্য ভাণ্ডার। পিষ্ট হল না হাতের চাপে। এই অপূর্ব নাভিকুণ্ড, যা কোনদিনও বেঢপ ভাবে ফুলে উঠল না।

ছন্দা নিজেকে নিজেই ভয় পায়। পালিয়ে এসে রাধামোহনের পায়ে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ সিক্ত হয়ে ওঠে। এই সিক্ততার কোলে আস্তে আস্তে গভীরে তলিয়ে গিয়ে ঘুম সাগরে পৌঁছে যায়।

রাধামোহনের বুকে এসে ছন্দার যন্ত্রণার ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু আঘাত করে। সেই আঘাত স্বপ্ন হয়ে তার চোখের ওপর ভেসে বেড়ায়।

রাধামোহন দেখতে পায়, তাদের দু'কামরার ফ্ল্যাটটা অপরূপ হয়ে গড়ে তুলেছে ছোট এক সাম্রাজ্য। ছোট সিংহাসনে বসে আছে মহারাজা রাধা-মোহন, পাশে অপরূপা মহারাণী ছন্দা, মন্ত্রী, প্রজা, অমাত্যবৃন্দরা সব তার ঘরের আলমারি ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র, দু'পাশে চামর দোলাচ্ছে সখী। আনন্দের আতিশয্যে মহারাজা দর্পিত কণ্ঠে বলছেন,

"জয় হোক পৃথিবীর"

হঠাৎ মন্ত্রী, অমাত্য, প্রজারা রাজারাণীর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে শুরু করে। ভয় পেয়ে রাজা রাধামোহন রাণী ছন্দা দু'জন দু'জনকে আঁকড়ে ধরে বলে ওঠে,

'তোমরা হাসছো কেন?'

মন্ত্রী, অমাত্য, প্রজা সবাই তারস্বরে চীৎকার করছে,

'গৃহ প্রবেশে—ছাদ নেই, ঘর আছে, ছাদ নেই, ঘর আছে।'

রাধামোহন দেখে তার ফ্ল্যাট প্রাসাদের পাকা চার দেয়ালের উপর কোন ছাদ নেই। সেই শূন্য জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ গজরাচ্ছে, একটা তীব্র বাজ পরবার শব্দে জেগে ওঠে রাধামোহন।

তার সারা দেহ ঘামে ভিজে শপ-শপ করছে। ছন্দা বিভোরে ঘুমিয়ে আছে। জানলা দিয়ে তারা ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। নির্মীয়মান ষ্টেডিয়ামকে

অন্ধকারে মনে হচ্ছে বিরাট এক দৈত্য। নিঃস্তব্ধ ঘরে ছাদের সিলিং ফ্যান ফুল স্পীডে ঘুরে চলেছে। একটা প্রচণ্ড ভয় তাকে ক্রমশঃ গিলে ফেলছে। আতংকিত মনে রাধামোহন আস্তে করে ডেকে ওঠে 'ছন্দা'। কোন সাড়া না পেয়ে জোরে ডেকে ওঠে 'ছন্দা—ছন্দা।' ঘুমে বিভোর ছন্দার কানে পৌছয় না তার কোন ডাক। সে এক ধাক্কা মারে। চমকে ওঠে ছন্দা। তাঁর বুক তীব্র গতিতে ওঠা-নামা করতে শুরু করেছে। এই গতির তীব্রতাকে একটু সামলে নিয়ে ঘুমের চোখে হাত ঘষতে ঘষতে ছন্দা জিজ্ঞাসা করে 'কি হয়েছে'?

'ছন্দা, গৃহ প্রবেশে ঘর আছে, ছাদ নেই'

ছন্দা বোবা হয়ে যায়। তারপর এই বোবা পরিবেশের উপর কান্নার তীব্রতা দিয়ে আঘাত হেনে রাধামোহনের বুকে মাথা রাখে।

স্টোনম্যান

একটি নিছক কল্পগল্প

অরবিন্দ দত্ত

কথাটা হু হু করে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে। পড়ারই কথা। সামনে পুজো। কারখানার হাজার তিনেক শ্রমিক কর্মচারী অধীর আগ্রহে দিন গুনছে, কি হয়—কি হয় উৎকণ্ঠায়।

বাঁ-হাতের তেলোয়-ডলা খৈনির উপর সশব্দ চাপড় মেরে গেটকিপার ভজন সিং প্রথম কথাটা চাউর করে। শুনা হ্যায় বড়া সাহেব হেড আফিসমে সব কো তলব কিয়া হ্যায়। সেটুল হো গয়া মালুম্ হোতা। টাইম-কিপার-বাবু রতন চাহলিয়া বকের মাছ ধরার মতো কথাটা গপ করে গিলে ফেললো গেল লেবার অফিসার প্রকাশ সাহেবের কাছে। স্যার্, শুনা, সেটেলমেণ্ট, হো গয়া—ক্যা ঠিক বাত? প্রকাশ সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, কুছ সেটেল-ম্যাণ্ট তো জরুর হোনা হ্যায়। এ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের কাগজ পত্র রেডি রাখতে নির্দেশ দিয়ে ছুটলেন ওয়ার্কস সেক্রেটারির কাছে। স্যার্, এনি ম্যাসেজ ফ্রম ডাইরেক্টর? মাই পেপারস্ আর রেডি। দেয়ার'র স্ট্রং রিউমার এমঙস্ট দ্য ওয়ার্কার্স। ওয়ার্কস্ সেক্রেটারি মিনিট তিনেক বাদে মুখ তুললেন। ইজ ইট আনএক্সপেক্টেড? এনিওয়ে, উই সুড বি রেডি ফর অল ইভেন্চুয়েলিটিস্। প্রকাশ সাহেবকে বিদেয় করে ফোন করলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পি. এ-কে। পি. এ-জানালো ডাইরেক্টরকে—ওয়ার্কার্সদের মধ্যে রিউমার পঁচিশ পার্সেন্ট বোনাস সেটল্ হয়েছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুখলাল পাটোরিয়া শুনে দারুণ খুশি। সন্ধে ছ'টায় মিটিং ডাকলেন বোর্ডরুমে। কনফিডেন্-সিয়াল মিটিং। থাকছেন ওয়ার্কস সেক্রেটারি, লেবার অফিসার, লিগ্যাল্ এ্যাডভাইজার, পি. এ.। মিটিঙে হরেক রকম কারসাজির বিচিত্র ডিজাইন রচনা হল। কিন্তু বড়সাহেবের কোনটাই মন পসন্দ হোল না। শেষে বড়সাহেব রায় দিলেন—ডিক্লেয়ার লক-আউট। রায় নিয়ে তড়িঘড়ি সব ছুটল। রাত ভোর হলেই অন্য এক নির্মম ইতিহাসের মুখবন্ধ ওদের তৈরী করতে হবে।

প্রাসাদোপম বাড়ি। পাটোরিয়া সাহেব গাড়ি থেকে সিঁড়িতে পা বাড়ালেন। সিঁড়ির মুখে বৃদ্ধ মুনিমজী। চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। পাটোরিয়া সাহেব অবাক—ক্যা বাত মুনিমজী? মুনিমজী ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন—আপ অন্দর যাইয়ে। অন্দরে ঢুকেই শুনলেন শোকাবহ ঘটনা একমাত্র আদরিণী মেয়ে অমৃতা নার্সিং হোমে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। বিকেলে বাড়ির লনে দোলনায় দোল খাচ্ছিল অমৃতা। হঠাৎ দোলনা থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ে লনের সীমানায় কংক্রিট পিলারের ওপর। মাথা ফেটে দারুণ জখম হয়েছে। হাউজ ফিজিসিয়ান এসে অজ্ঞান অবস্থায় অমৃতাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রক্ত দিতে হবে। কিন্তু ঐ গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সাহেব ফোন করলেন নার্সিং হোমে। ব্লাড ব্যাঙ্কের খাতাপত্র থেকে ঐ দুর্লভ গ্রুপের এক রক্তদাতার নাম পাওয়া গেছে। দিন তিনেক আগে ঐ লোকটা ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত বেচে গেছে। বৌবাজারে এক শীতলা মন্দিরের সামনে ফুটপাতে সে রাত কাটায়। তার খোঁজে বেশ কয়েকজন লোক পাঠানো হয়েছে। সারা বৌবাজার চষে ওরা তাকে আজ খুঁজে বার করবেই।

এ মেয়ে সুখলাল সাহেবের বড় মূল্যবান সন্তান। নিঃসন্তান জীবনের মনোকষ্টে পাঁচটি বছর সুখলালের কেটেছিল। দুঃখ করে বন্ধুকে বলেছিল, দেখ, আমার কারখানার ওয়ার্কারগুলো খেতে পায়না দু'বেলা ভাল করে, অথচ ওদের সন্তান-সংখ্যায় ভাঙা ঘর গিজ গিজ করছে। আমার বিশাল সম্পদ কি করবো, যদি উত্তরাধিকারিই না থাকে। সারা ভারতের সেরা সেরা গাইনোর চিকিৎসা বিফল হয়েছে। শেষে সুইজারল্যাণ্ডের এক খ্যাতনামা গাইনোর অত্যাধুনিক পদ্ধতির শরণ নেওয়া হল। তাও সুখলাল পুত্র সন্তান পেলেন না—জন্মালো কন্যা অমৃতা। এই কন্যাকে নিয়ে ধনাঢ্য সুখলালের মন ভরে উঠেছিল। সে অমৃতাই আজ মৃত্যুর দুয়ারে। সুখলালের চোখ ছাপিয়ে জল এল। এইতো ঘন্টা দেড়েক আগেও যে মানুষটি চেয়ারে বসে নিজে তিন হাজার মানুষের ভাগ্য বিধাতা হবার অহমিকায় স্ফীত ছিল, এই মুহূর্তে তার মনে হল সে কত নিঃস্ব! কী অসহায়!

বাড়ির প্রায় সবাই নার্সিংহোমে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। এখন রাত প্রায় আটটা। সুখলাল ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন—অভি চলো নার্সিং হোম। ড্রাইভারের পেটটা খিদেয় চোঁ চোঁ করছিল। এখন ছুটি পাবার কথা। কিন্তু এখুনি আবার যেতে হবে। কত রাত হবে কে জানে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার

কথা সেও শুনেছে। মানবিকতার প্রশ্ন, সামান্য ব্যক্তিগত খিদের চেয়ে মানবিকতা বড়। কিন্তু বড়সাহেব সুখলালের কাছে তা কি বড়? ড্রাইভার ভাবল, যদি আমার মেয়ের এ অবস্থা হোত সাহেব কি তাকে ছুটি মঞ্জুর করতেন না? ড্রাইভার নিজেকে প্রবোধ দিল—তুমি পাবও বলে আমিও কি তাই হব? না, আমি দৌলতের গরমে মনুষ্যত্ব হারাইনি। বিষয়সম্পদে, শিক্ষায় ছোট হতে পারি, কিন্তু মনে আমি তার চেয়ে ঢের ঢের বড়। ড্রাইভার বিনা প্রতিবাদে স্টার্ট দেবার জন্যে গাড়ির হেডলাইট জ্বালাল।

হেডলাইটের আলোর সামনে চারজন জওয়ান একটা লোককে কি বোঝাবার চেষ্টা করতে করতে সাহেবের গাড়ির কাছেই তাকে টেনে আনছে। সাহেব গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন—ক্যা হায়? একটি কৃশকায় চোয়ালওঠা লোক। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। কোটরাগত চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। লোকটিকে এক হাতে ধরে রেখে একজন জওয়ান বলল—সাহাব, এই আদ্‌মির ব্লাডগ্রুপ মিলেছে। লেকিন এ রক্ত দিতে চাইছে না। লোকটি দু'হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—সাহেব, আমাকে মাপ করুন। আমি তিনদিন আগে রক্ত বেচে পঁচিশ টাকা পেয়েছি। এখনো আমার মাথা ঘোরে, বমি বমি লাগে। ওরা আমার কথা শুনলো না। জোর করে ধরে নিয়ে এল। আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব। আজ আমি রক্ত দিতে পারবো না। একেবারে মরে যাব। আমি জুট মিলে চাকরি করতাম। আজ দু'বছর মিল বন্ধ। চাকরি নেই। মাঝে মাঝে রক্ত বেচে দিন চালাই। আমাকে ছেড়ে দিন। বলতে বলতে লোকটা কেঁদে ফেলল। সুখলাল সাহেব অভয় দিলেন লোকটাকে পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণে—তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি আমার এবাড়িতে তিন মাস খাবে থাকবে বিশ্রাম করবে। কোনো কাজ করতে হবে না। ভাল ডাক্তার তোমার চিকিৎসা করবে। দাওয়াই ওষুধ সব আমি দেবো। তারপর তোমাকে আমি চাকরি দেবো। জুট মিলে যা বেতন পেতে তাই তোমাকে দেবো। তুমি আজ রক্ত দিয়ে আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাও। তোমার দয়া আমি কখনো ভুলবো না।

লোকটা খানিক পরে বলল, সাহেব, মাফি মাঙ্গছি, একটু গাঁজা টানার আদত আছে। নইলে গায়ে তাগদ্ পাই না। একটু পরেই আসবো সাহেব। সুখলাল আশ্বাস পেয়ে একজনকে ইঙ্গিত করলেন সঙ্গে থাকতে। একজন জওয়ান লোকটাকে নিয়ে গেটের বাইরে রাস্তায় গেল, সাহেবের গাড়ি ভোঁ

করে বেরিয়ে গেল।

গেটের বাইরে এসে লোকটা ইতিউতি করে করে খানিকটা দূরে গেল। আলিপুর রোডের এ দিকটায় রাত আটটার পরে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। কেবল হুস্‌হাস করে তীব্র বেগে গাড়িগুলো ছুটে যায়। লোকটা আধো-আঁধারি একটা মোড়ে এসে দাঁড়াল। আচম্‌কা জওয়ানটাকে এক ধাক্কা মেরে চিৎপাত করে ফেলে দিল। তারপর চোঁচা দৌড় মেরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জওয়ানটি এমন ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা ভাবতেই পারে নি। হাত থেকে শিকার ফসকে গেল। এখন কি অজুহাত সে দেবে সাহেবকে। সে নিজের জামাটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ল। প্যান্টটা হাঁটুর কাছে রাস্তার ধুলোয় রগড়াল। নিজের নখে দু'গালে নাকে আঁচড়ে রক্ত বার করল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল। দারোয়ান আর অপর তিন সাকরেদকে বলল—ওই লোকটির সঙ্গে জনা পাঁচেক গুণ্ডা ছিল। রাস্তার মোড়ে তারা এসে ওকে মারধোর করে আদমিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। দারোয়ান নার্সিংহোমে ফোন করে সাহেবকে সব ঘটনা জানালো। বিনিময়ে সাহেব ফোনে ওদের যেসব গালিগালাজ করেছে দারোয়ান তা চার জওয়ানকে পরিবেশন করল।

অনেক ছোটাছুটি করেও অমৃতার গ্রুপের রক্ত জোগাড় হোল না। দেহাভ্যন্তরের রক্তপাতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অমৃতা রাত দেড়টা নাগাদ সুখলালের বহুমূল্যবান পরম আদরের একমাত্র সন্তান মৃত্যুর শীতল কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

শোকের ছায়া তখনো কাটেনি। অমৃতার জন্য এক এক সময় সুখলাল বুকের মধ্যে যন্ত্রণা বোধ করে। মনটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। তবুও অফিসে যেতে হয়। নানা কাজের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হয়। নিও প্লান্ট কারখানায় লক্‌-আউট চলছে। চলুক—মরুক সব। অমৃতাই যখন নেই তখন এরাও সব মরে সাফ হয়ে যাক্‌। সব কিছুর মধ্যে থেকেও সুখলাল নিঃসঙ্গতার বেদনায় ভেতরে ভেতরে কাঁদে। একদিন চার জওয়ানকে ডেকে পাঠালেন সুখলাল। তাদের কাছে অনেক শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন—হায়, আমার দুর্ভাগ্য। আমার চারধারে সবাই নিমক-হারাম। নইলে একজন সাধারণ ফুটপাতের লোক তার এত অহংকার। সে আমার মেয়ের জন্য সামান্য রক্ত দিলনা। আমার অমৃতা রক্তের অভাবে মারা গেল। অথচ সে ফুটপাতের লোকটা জানিনা আজও কি অধিকারে বেঁচে আছে। যার

মানবতা বোধ নেই সে কি মানুষ। অথচ তোমরা ছেড়ে দিলে। তোমরা দীর্ঘজীবী হও। সেও বেঁচে থাকুক। সব কথা হজম করে চার জওয়ান নীরবে মাথা নিচু করে চলে গেল।

দিন সাতেক পরে সকালের খবরের কাগজ খুলে সবাই হতবাক্। একি কাণ্ড ফুটপাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনজনের মাথা পাথর দিয়ে মেরে থেতলে দেওয়া হয়েছে। পর পর কলকাতার হু'তিন অঞ্চলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। মোট জনানয়েক একই ভাবে গভীর রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় ফুটপাথে পাথরের ঘায়ে নিহত হল। সারা কলকাতায় চাঞ্চল্য। ফুটপাথবাসীরা আতঙ্কিত। মন্ত্রী ও পুলিশ বিভাগ বিব্রত। রাত্রে প্রতি বাড়িতে ডিনার টেবিলের সমাবেশে একই আলোচনা, ইয়েতির মতো কে এই রহস্যঘন হত্যা-কারী। গভীর রাতে কলকাতার অলিতে গলিতে জোনাকির আলোর মত হঠাৎ হঠাৎ পুলিশের লোকের টর্চ জ্বলে ওঠে। কিন্তু সেই রহস্যঘন হত্যাকারীর গায়ে টর্চের আলো পড়েনা। পুলিশের অনুমান হত্যাকারী স্টোনম্যান গভীর রাতে গাড়িতে করেই আসে, আর বড় ভারি পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে দিয়ে গাড়ি করেই পালিয়ে যায়। পুলিশ তো কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। তাই একজন মাথা খারাপ পাগলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। তাকে জেরা করা শুরু হল। পুলিশের সব জেরার উত্তরে তার একটাই জবাব— হুনিয়া মালিক। পুলিশের বড় বড় কর্তারা এই সাংকেতিক শব্দ নিয়ে গবেষণারত সাধারণ লোক ভাবছে, একি ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলির সেই কথা—সব ঝুট হায়!

স্টোনম্যানের কাহিনীর এইখানেই ইতি টানা যেত। কিন্তু ওদিকে আবার নিও-প্লাস্ট কারখানার গেটের সামনে ছাউনি গেড়ে শ্রমিক কর্মচারীরা অনশন করে রয়েছেন লক-আউট প্রত্যাহারের দাবীতে। সেখানে রাত দশটার সময় এক বেয়াড়া দৈনিক কাগজের বেয়াড়া সংবেদক গিয়ে হাজির। টিমটিমে কুপির আলোয় হুমড়ি খেয়ে জিগ্যেস করে—আপনারা কি অনশন করে আছেন? ক্ষুধায় কাতর একজন শ্রমিক চিঁহি চিঁহি স্বরে বলল —যাদের খাবার আছে খায়না, তারাই অনশন করে। আমাদের খাবারই নেই, তাই আমরা অনাহারে আছি।

সংবেদক—আপনাদের নেতারা কোথায়?

শ্রমিক—তেনারা তো বহু ইউনিয়নের নেতা। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এখন হয়তো খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সংবেদক—মন্ত্রীরা কেউ আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি?

শ্রমিক—হাঁ, তিনি এসেছিলেন বটে সকালে। অনেক লোকজন হয়েছিল। তিনি সকালে জ্বালাময়া ভাষণ দিয়ে গিয়েছেন।

সংবেদক—কাছাকাছি কোথায় ফোন আছে বলুন তো? মন্ত্রীমশাইয়ের কাছ থেকে আপনাদের ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর নেওয়া যাক।

শ্রমিক—আহা, তেনাকে আর বিব্রত করে লাভ কি এত রাত্রে। তিনি আহারাদি সেরে এয়ার কণ্ডিশন ঘরে এতক্ষণে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর কতটুকু ক্ষমতা আর করবেনই বা কি। উনি আরো উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রীত্ব পাওয়া যায় কিনা এটাই একমাত্র ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন। এ সুখ স্বপ্ন ভেঙে আমার আপনার কি লাভ।

সংবেদক সমস্ত তথ্য নিয়ে ফেরার পথে মনে মনে সংবাদের খসড়া তৈরী করতে লাগলেন। সঠিক ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত তথ্য এমনভাবে যথাযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে হবে যাতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে, শ্রমিকেরা খুশি হয়, সাধারণ পাঠক সাহিত্য-তৃপ্তি লাভ করে। তবেই না কাগজের সেল বাড়বে। খসড়া ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সংবেদকের মনে ভারি সুন্দর একটা কথা ভেসে উঠল। বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ স্টোনম্যান স্টোনম্যান, তুমি আছ। তুমি সর্বব্যাপী, রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। স্টোনম্যান সব ক্ষেত্রেই জড়িয়ে আছে, অথচ তাকে দেখা যায় না। সে আছে অথচ তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্টোনম্যান, তুমি কত উৎপাত করছ, হত্যা করছ, তবুও তুমি এক অদৃশ্য মানুষ।

লিজা

গৌতমকুমার দে

ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। আনমনা হয়ে ভাবছিল লিজা। ফোন তুললো—'হ্যালো'। কিছু ছক বাঁধা কথাবার্তা হল। রিসেপসনিষ্ট হিসাবে ঠিক যতটুকু কথা বলা দরকার ততটাই সে বলে। কিন্তু লিজা কি ভাবছিল। ও নিজেই কিন্তু সেই ভাবনার স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আসলে অতীতের প্রতি কোন পিছুটান নেই লিজার। গতকালের কোন কিছুকেই সে আজকের মধ্যে টেনে আনতে চায়না। বরং বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে চলাটাই সে নিরাপদ মনে করে। তবু বিচ্ছিন্ন কিছু স্মৃতির ভেতর সে এখনো মিঃ সরকার ম্যানেজিং ডিরেকটর, তার এক্স বসকে মনে রেখেছে। আর মনে পড়ার কারণটা অন্য। আগের চাকরিটা ছেড়ে আসার মধ্যে একটা সুপ্ত দুঃখ লুকিয়ে ছিল—তবু ছিল অপার শান্তি। আসলে হয়তো এম-প্লয়ার হিসাবে ঠিক হিসাবই মিটিয়ে দিচ্ছিলেন মিঃ সরকার। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদাটা যেন ক্রমাগত সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল লিজার।

লিজার জীবনটা অন্য রকম খাতে বইতে চাইতো ছোট থেকেই। স্বাভাবিক বৃত্তের বাইরেই ছিল তার চলাচল। দারুণ ইংরেজী বলাটা তার জন্মগত অভ্যাসের মতো হয়ে গিয়েছিল। যেটা ঐ চাকরিতে একান্ত জরুরী ছিল। লিজা মেয়ে হিসাবে কমবয়সী, স্মার্ট, তন্বী, আধুনিকা। গুণ অনেক রকম। ইলেক্ট্রো টাইপিং এর কাজ জানে, জানে এ্যাকাউন্টস্, কম্পিউটার অপারেটিং ইত্যাদি অফিস জব। সুতরাং এক কথায় বলা যায় সে বহুগুণের অধিকারিনী। সামাজিকতারও কোন অভাব নেই তার মধ্যে। পার্টি, ড্রিংকস্ সব কিছুতেই অভ্যস্ত। এইতো গত সপ্তাহে মিঃ চৌধুরী, ফোন করল তার নতুন অফিসে। শান্ত চৌধুরী লিজার সাম্প্রতিক শেষ পুরুষ বন্ধু। কনগ্রাচুলেশন পর্ব শেষ হতেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল বিকেলে।

ট্রাম, মিনিবাস, মারুতীর ভীড় কাটিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে যায় লিজা। শীতকালে বিকেল বড় ছোট। হাতের জরুরী কিছু টাইপের কাজ জমা ছিল। সুতরাং যতই তাড়া থাক—বেরুতে তার দেরী হয়ে যায়। গন্তব্য অবশ্য খুব একটা দূর নয়। হোটেল রাতদিন। জায়গাটা ওর কাছে পুরানো। বেশ কিছু ওয়েটারের সাথেও তার পরিচয় হয়ে গেছে। নিয়মিত যেতে যেতে যা হয় আরকী। বেশ খাতির করে তারা। বিনিময়ে ভাল টিপস্ আশা করে তারা। পায়ও। শান্ত অপেক্ষা করছে। অন্যদিনের থেকে আজ

তাকে কিছুটা বেশী সময় দিতে হয়। এটাই বিরক্তিকর। একের পর এক দামী ব্যাণ্ডের সিগারেট ধ্বংস করে যাওয়া। বাড়ির মেয়ে বউয়ের জরুরী কাজের কথাগুলো ভুলে থাকতে চেষ্টা করে শান্ত। লিজাকে দূর থেকে আসতে দেখে চিক্‌চিক্ করে ওঠে তার চোখদুটো বাঘের সামনে দিয়ে ছাগল-ছানা হেঁটে যাবার মতো। অবশ্য শান্তর বাইরেটা অত্যন্ত মার্জিত দেখাচ্ছিল। শান্ত নিজের দায় দায়িত্ব, সীমা পরিসীমা পার্শ্ববর্তী সবকিছু পরিস্থিতি ভেবে চিন্তেই পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে।

হোটেলের ভেতরটা বেশ মনোরম। দু'জনে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে। শান্ত নিচু মাত্রায় কথা বলে পরিবেশটা সহজ করে দ্যায়—লেট আস এনজয় দিস ইভনিং। লিজা একটা ছোট কিস এঁকে দ্যায় ঠোঁটে। পর্দার ওপাশে ওয়েটারের পায়ের শব্দ আসে। শান্ত ওর মুখের দিকে তাকায়। লিজা বোঝে, মেন্যুর দায়িত্ব আজ ও নেবেনা। তাই মুখ নীচু করে জিনসের প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা টাওয়াল বার করে মুখটা মোছে। শান্ত অর্ডার দ্যায়। মিক্সড্ ককটেল। তার সংগে চিকেন সিজলার। রাত্রে একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করার কথা মনে পড়ে শান্তর। বিদেশী সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দ্যায় লিজার দিকে। লিজা একটা সিগারেট টেনে নেয়। আর গল্প শুরু করে। যে গল্পের শুরু আছে শেষ নেই। যথাসময়ে বেয়ারা গবলেটে পানীয় সাজিয়ে হাজির হয়। শান্ত চিয়ার্স করে। লিজা কথা চালিয়ে যায়। নিজের কথাই ও বেশী বলে। বলতে ভালোবাসে। শান্ত মনে মনে ভাবে—তার সম্পর্কে লিজার কৌতূহল এত কম কেন। অবশ্য অহেতুক কৌতূহল না থাকাই ভালো। লিজার জীবনে বহু পুরুষের ছড়াছড়ি। লিজা অকপটে সে কথা স্বীকার করে। শান্ত নিজেকে লিজার জীবন বীণার অনেক তারের মধ্যে একটা তার মনে করে।

শান্তর জীবন স্রোতটা কিন্তু কোনভাবেই লিজার সমান্তরাল নয় বরং বিপরীতগামী। অথচ যৌবনের এক দুর্নিবার টান তাকে হঠাৎ লিজার খুব কাছে এনে দিয়েছে। পথের আলাপ থেকে অফিসে লিফট দেয়া, পার্টি, বার, রেঁস্তোরা, হলিডে হোম কত কিছুই না তাদের রোজনামচা। শান্তকে পেশাদার অভিনেতার মতো আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে লিজার চোখের সামনে। তার স্ত্রী সন্তানের কথা লিজা কোনদিন জানেনি। জানার আগ্রহও দেখায়নি। আসলে লিজারা মনে করেনা এসবের প্রয়োজনীয়তার কথা।

সেদিন চাঁদপাল ঘাট থেকে হাওড়া, লঞ্চে আসতে আসতে লিজা শান্তকে হঠাৎ একটা অন্যরকম প্রশ্ন করে।

—শান্ত, তুমি আজকাল ভীষণ ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছো। রিং করলে মনে হয় তুমি ভীষণ টেনশনে কথা বলছো, এমনকী তোমার কলিগের সাথেও...।

—না লিজা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শান্ত আবছা করে উত্তর দায়।

—আসলে তোমরা পুরুষ জাতটাই সবাই কেমন এক রকমের। যাকৃগে। উইক এণ্ড ট্যুরে প্রোগ্রাম কিছু করেছো? চলোনা. চাঁদিপুর ঘুরে আসি।

—লি-জা। অতো দূরে যাওয়াটা কি ঠিক এই সময়ে উচিৎ হবে। শান্ত কোথায় একটু দুর্বল হয়ে যায়। চেনা পরিচয়ের গণ্ডিটা বাংলার বাইরে ওড়িশ্যায় কতদূর বিস্তৃত তা একবার ঝালিয়ে নেয়।

—হ্যাঁ চলো। অত্যন্ত ডেসপারেটলি সোজা হয়ে বসে লিজা। একদিন তো। সুইট জার্নি উইথ এ চার্মিং মেমোরি। টেক ইট ইজি মাই ফ্রেণ্ড। লিজা ব্রাইট সানসেট কালার নেলপালিশ করা আঙুলটা শান্তর চিবুকে ধরে। শান্ত রাজী হয়ে যায়।

ধৌলি এক্সপ্রেস ঠিক সময় মতোই এসে পৌছালো বালেশ্বর ষ্টেশনে। ছুটো ছোট ব্রীফ কেস হাতে দু'জনে নামলো। কাছেই বিক্রি হচ্ছিল চা। চা খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলো বাইরে। বিভিন্ন ধরণের গাড়ি অপেক্ষা করছিল সেখানে জিপ ট্রেকার, অটো রিক্সা। অনেক ড্রাইভার তাদের দেখে এগিয়ে এলো। লিজা ইঙ্গিতে দেখাল একটা সাদা অ্যামবাসাডার। শান্ত দ্রুত গিয়ে ভাড়ার ব্যাপারটা সেটল করে নিল। একটাই সুবিধে। এখানে বাংলাটা সবাই বোঝে। বেশীক্ষণের জার্নি নয়। মাত্র চোদ্দ কিলোমিটার। থাকার জায়গাটা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। শান্তি নিবাস।

চাঁদিপুরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। সেটা হল বীচের ওপর সমুদ্রের আসা যাওয়া। সমুদ্র যখন কাছে এগিয়ে আসে তখন যেন কী ভয়ংকর। আবার দূরে চলে গেলে যেন দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ পড়ে আছে একা একা। কিছু লাল কাঁকড়া আর জেলেদের যাওয়া আসা। লিজা একটি সুন্দর লাল হলুদ টাইপ দেয়া কসটিউম পরে জলে নেমে পড়ে। দুরন্ত বালিকার মতো খেলা করে। শান্তর ভাল লাগছিলনা শরীরটা। এতটা জার্নি করে এসে। সে একটু দূরে একটা ঝাউগাছের নীচে বসে নিজের মনে আঁক কষে বালিতে। দুপুরে লাঞ্চের মেনু ভালো একদম বাঙালি খাওয়া। ডাল, ভাত

মাছ, তরকারি, ভাজা, চাটনি। খাওয়ার পর রুমে এসে দু'জনে গা এলিয়ে দায় ফোমের বিছানায়। দু'জন দু'জনার উষ্ণ সান্নিধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে বিকেল বেলা পড়ন্ত সূর্যের আলোয়। দু'জনে বারান্দায় মুখোমুখি এসে বসে একজোড়া ইজিচেয়ারে। সামনে রাখা কলকাতা থেকে আনা বিদেশী স্কচের বোতল, লিমকা আর কানমাক্কের প্যাকেট। সমুদ্র সরে যাওয়া দিগন্ত ছোঁয়া মাঠের দিকে তাকিয়ে দু'জনে উপভোগ করে প্রকৃতি। লিজা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলে। কত বিচিত্র স্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা সেসব টুকরো টুকরো ফুল দিয়ে মালা গেঁথে চলে। শান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো কথা শুনে যায়। ততক্ষণে বাইরে অন্ধকার নেমে আসে কালো হয়ে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন। এ যেন লিজার জন্য আশ্চর্য মুহূর্ত। লিজা খুব আস্তে গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করে। এটা লিজার স্বভাব। খুব সিরিয়াস কিছু ব্যাপার হলে লিজা এরকম ভাবে কথা বলে।—শান্ত, আমরা আবার কলকাতায় ফিরে যাবো। আবার আমাদের অফিস জীবন শুরু হবে নিয়মিত। লিজাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হয়, তবে নেশাগ্রস্থ নয়— আমার এক একসময় ভীষণ বোরিং লাগে শান্ত, ভীষণ, কিছু যেন ভাল লাগেনা লিজা বলতে থাকে, শান্ত রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

'আমরা কি এবার একটু নিজেদের কথা ভাবতে পারি। মনে হয় এটাই আমাদের বেস্ট টাইম। শান্ত অস্থির হয়। কাচের গেলাসটা দুম করে টেবিলে নামিয়ে রাখে। টাওয়ালে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলে—এতো ব্যস্ত হবার কি আছে। লিজা উই লাভ ইচ আদার। দুনিয়ায় এর চেয়ে সম্পর্ক আর কী আছে। শান্ত বুঝতে পারে তার কথাগুলো জড়িয়ে আসছে। জিভ শুকনো লাগছে। শান্ত অনুভব করে বুকের মধ্যে কোথাও একটা চাপা বুদবুদ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে প্রতারণা করছে না প্রতারিত হচ্ছে—ঠাহর করতে পারে না। চোখ বুজে থাকে শান্ত। লিজা থামাতে চাইছে তার নৌকা। বাঁধতে চাইছে ঘাটে। লিজা অন্ধকারে মুখটা নামিয়ে আনে শান্তর বুকের মধ্যে। শান্ত আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে থাকে চুলে। এক ফোঁটা জল এসে পড়ে শান্তর হাতে। লিজা, শান্ত ফিসফিস করে ওঠে। লিজার মনে হয় সে হেরে গেছে। কিন্তু কার কাছে, কি ভাবে? জীবনের প্রথম পরাজয়? লিজা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। শান্ত হিসেব করে লিজার বুকের দ্রুত ওঠানামাগুলো। বাইরে সমুদ্র তখন নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে বারান্দার কাছে। প্রতিটি ঢেউয়ের ওপর তখন মুক্তোর মতো টুকরো টুকরো প্রতিপদের চাঁদ।

বিশ্বরূপে রাখাল

ভগীরথ মিশ্র

বনের মধ্যে গরু চরাতে গিয়ে রাখাল রাজাকে নিয়ে সঙ্গীদের বড় মজা।

এমনিতে কাজটা এক ঘেঁয়ে। এক পাল গরুকে ছেড়ে দিয়ে সারা দুপুর, বিকেল—।

সেই সময়টা রাখাল রাজা ওদের মাতিয়ে রাখে সারাক্ষণ।

গোরুর 'গোঠ' নিয়ে বেরোবার সময় রাখাল রাজা কোমরে গুঁজে নেয় একখানা বাঁশের বাঁশি। গেরুয়া ধুলো পায়ে পায়ে উড়িয়ে ওরা গামিরতলার জঙ্গলে পৌঁছে যায় ঠিক সময়েই।

চোত মাসে শাল গাছে অজস্র ফুল ফোটে। রাখাল রাজা বুনোলতা দিয়ে বানিয়ে ফেলে খান কতক শালফুলের মালা। একটা গলায় পরে। একটা মাথায় মুকুটের মতো। কোমরে একটা, দু'হাতে দু'টো, কঙ্কনের মতো।

গামিরতলার জঙ্গলে বিশাল প্রাচীন বট। তার তলায় অগাধ ছায়া। সঙ্গীরা—মদন, অভিলাষ, পঞ্চু—চাপ্‌টি খেয়ে বসে পড়ে গাছের তলায়। রাখাল রাজা বাঁশিতে ফুঁ মারে। তখন সে কল্পনা করে, সে কৃষ্ণ। ব্রজের রাখাল। মা যশোদার নয়নের মণি। গোপীগণের প্রাণ। ভাবতে ভাবতে দু'খানা উদোম ঠ্যাং আড়াআড়ি রেখে বাঁশি নিয়ে দাঁড়ায় সে। এবং তখনি কল্পনা করে, তার বাঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আয়ান ঘোষের ঘরনী। সেই কারনেই, মাঝে মাঝে বাঁ পাশের ফাঁকা জায়গাটাতে অপাঙ্গে দৃষ্টি ছেনে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে সে।

সঙ্গে সঙ্গে মদনের দল গেয়ে ওঠে, আইজ ক্যানে গ' নিধু বনে, রাধাকিষ্টো একাসনে, যুগল মিলন হইলো—ও ...।

রাখাল রাজা তখন সুমুখের পদকর্তাদের দিকে তাকিয়ে মধুর মধুর হাসতে থাকে।

ছেলেবেলায় এলাকার তাবৎ কেষ্ট যাত্রার আসরে রাখালকে অবশ্যই দেখা যেতো। ঢুলু ঢুলু চোখে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করতো সে। আজ, এই একুশ বছর বয়েসে, তার মনের মধ্যে চিতল মাছের মতো রূপোলী গা' ওল্টায় সেই সব দিনের স্মৃতি।

বয়সের তুলনায় রাখালের বুদ্ধি শুদ্ধি বাড়ে নি। দাড়ি গোঁফও গজায় নি এখনতক। কোলকুঁজো শরীরখানা নিয়ে অন্ততঃ পাঁচ-সাত বছর কম বয়েসীদের সঙ্গে সে মিশে যায় অবলীলায়। তার কারণটাও এ তল্লাটের সবাইয়ের জানা। বড় মর্মান্তিক সে ঘটনা। ছোটবেলায় অদ্ভুত এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল রাখাল। দাপানজুড়ির কামেশ্বর দত্তর কাছ থেকে দানা নিয়ে শোধ করতে পারে নি রাখালের বাপ। এক জনের ঋণ স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলেও খেটে উশুল করতে পারে নি এগারো বছর কাল।

পরের কথায় ভুলে রাখালের বাপ এক অর্বাচীনের মতো কাণ্ড করেছিল। বউ ছেলেকে লুকিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল কয়লাখনির দিকে। সেখানে খাদের মধ্যে সারাদিন কাজ। দিনের শেষে নাকি লগদা মজুরী। ওর বাপের বিশ্বাস হয়েছিল, কয়লা খাদের অন্ধকারে কামেশ্বর দত্ত ওদের খুঁজে পাবে না এ জন্মে।

শেষ অবধি পালাতে পারেনি ওরা। কামেশ্বর দত্তর লোক দুর্গাপুরের কাছাকাছি ধরে ফেললো ওদের। জবরদস্তি ফিরিয়ে নিয়ে এলো কামেশ্বরের গড়ে।

প্রথমেই বাপকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল খুঁটিতে বেঁধে। তারপর মার চললো. অবিশ্রান্ত। থেপে থেপে।

সন্ধ্যে নাগাদ রক্ত বমি হোল বাপের। কামেশ্বর দত্তর গোয়াল ঘরে শুয়ে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লো সে।

মাকে নিয়ে রাখাল থেকে গেল কামেশ্বরের গড়ে। বাপের বকেয়া খাটুনি দিয়ে শুরু হোল মা বেটার জীবন।

সে এখনও চলছে।

কামেশ্বর দত্তর বড় প্রত্যাশা ছিল, রাখালের কাছে। সে বড় হবে। তাগড়া জোয়ান হবে। লাঙ্গল চষবে দিনভর। ভারে ভারে ধান বইবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

রাখাল কারুর কোনও প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি। বয়েস যতই বেড়েছে, কেমন কোল কুঁজোর আকার নিয়েছে সে। বুদ্ধি বৃত্তিও বাড়েনি। শরীরে বলও আসেনি, তেমনটি করে।

তা সে যাই হোক, গাম্ভিরতলার জঙ্গলে সঙ্গীদের রাখাল রাজা।

পদকর্ত্তাদের গান থামলেই মান ভঞ্জন পালা শুরু হয়।

তখন রাখাল রাজা প্রত্যক্ষ করতে থাকে, তার সুমুখে শ্রীরাধিকে দাঁড়িয়ে

রয়েছে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে। অভিমানে থম থম করছে শ্রীরাধার চাঁদমুখ।

সঙ্গে সঙ্গে রাখালের ভাবান্তর দেখা যায়। পায়ে ধরার ভঙ্গিতে সে বারবার মাটির দিকে নুয়ে পড়ে। ঠোঁটে গুনগুনিয়ে ওঠে গান, 'রাধে আমায় ক্ষ্যামা কর। অপোরাধ করেছি বড়। রাধে আমায় ...'

চোখের সুমুখে পিছলে পিছলে দূরে সরে সরে যায় রাধা। রাখাল পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে। বারবার শ্রীরাধার রাঙা চরণ দুটি জড়িয়ে ধরতে চায়।

এইভাবে সারা দুপুর সে বটগাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে শ্রীরাধার দুরন্ত মান ভাঙায়।

দুপুর গড়ালে শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরির দৃশ্য।

বুনো লতাপাতা জুটিয়ে এনে মদন ওর দু'হাত শক্ত করে বাঁধে। অভিলাষরা গলা ছেড়ে গান ধরে, 'ননী চোরা, মাখন চোরা, গোপীগণের বসন চোরা –, ছি রাধিকার মনচোরা, চোরারীতি গেল্যো কই —।'

হাত পা বাঁধা অবস্থায় রাখাল তখন অদ্ভুত কৌশলে ভাঁড়ের মুখে ননী মাখন খেতে থাকে।

বিকেল গড়ালেই মা যশোদার তরে মনটা আঁকুপাকু করে ওঠে রাখালের। সকাল থেকে অবিশ্রান্ত খাটুনি খেটে এতোক্ষণে চাট্টি আকাড়া চালের ঠক্‌ঠকে ভাত নিয়ে হয়তো বসেছে মা খিড়কির দাওয়ায়। মুহূর্ত দেরি না করে গরুর পাল জুটিয়ে বাড়ির পথ ধরে সে। চাকুন্দা আর রাং চিতার ঝোপ দু'পায়ে মাড়িয়ে রোজ এইভাবে ব্রজের রাখাল ঘরে ফেরে।

গভীর রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না রাখালের। বাবার স্মৃতি উপচে আসে মনে। কান্না আসে বুক জুড়ে। বাবাকে তখন বন্দী বসুদেবের মতো অসহায় মনে হয়।

শীতের মরসুমে জয়রামপুরের ডাঙায় তাঁবু খাটিয়ে টকি বসেছে। কামেশ্বর দত্তর বাড়ি থেকে বউ ঝি'রা একদিন গেল গরুর গাড়িতে চেপে। রাখালও গিয়েছিল গাড়োয়ান হিসেবে।

কামেশ্বর দত্ত এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তি। তার টিকিট লাগে না টকিতে। সবাই হুড়মুড়িয়ে ঢুকলো। বাবুর বাড়ির লোক বলে রাখালকেও ঢুকিয়ে নিল ভেতরে।

'উত্তরা' পালা চলছিল। ভারি ভালো লাগছিল রাখালের। দুর্যোধনের

রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের দৃশ্যটাতে বারবার গাটা ফুলে ফুলে উঠলো তার।

মানভঞ্জন শেষ হতে দুপুর গড়িয়ে এলো।

মদন সঙ্গে সঙ্গে ওকে বুনো লতা দিয়ে বেঁধে ফেললো। অভিলাষের দল গলা চড়িয়ে গান ধরলো, 'ননী চোরা মাখন চোরা। গুপীগণের বসন চোরা—।'

আচমকা উঠে দাঁড়ালো রাখাল।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলো, কে বাঁধব্যেক রে মোরে? জান নাই কি ওরে মূঢ় হল্যো পেয়্যোজন, স্বগ্যো মত্তো-পাতাল বিদারি, কাঁপাইয়া চন্দো-সূয্যো -গহো-তারাদলে, বস্তুজের গোপাল কিষ্ণো দেখা দিব্যেক মহাকাল রূপে—?'

'এ্যাই রাখাল, অমন ক্ষেপ্যে গেলি ক্যানে রে।

রাখাল থামে না।

'দেখিতে বাসনা যেদি মহাকাল রূপ, কাল লিত্যো হেরিতে কামনা, বাঁধ বাঁধ তেবে রে কৈরোব—বাঁধ রে গোপালে।'

'এ্যাই শালা কি হোল রে তুয়ার?'

আচমকা হা হা করে হেসে উঠলো রাখাল।

'বিশ্বোরূপ, বিশ্বোরূপ—দ্যাখ্ কৈরোব, বাঁধ্, বাঁধ্।'

বলতে বলতে মুহূর্তে শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে বুনো লতার বাঁধন পটাপট ছিঁড়ে ফেললো রাখাল। সঙ্গীদের পাশে এসে ঝাঁপ্ করে বসে পড়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

মদনরা বিরক্ত।

'খ্যালাটা অমন মাটি কর্যে দিলি যে?'

হাসতে হাসতে রাখাল বললো 'উত্তরা' পালা দেখল্যাস। টকিতে, বস্তুজের রাখাল আর কুরুক্ষেত্তের কিষ্টো একোই জন।'

সঙ্গীরা ভুলভুল করে তাকায়। ওসব শাস্ত্রের বচন তারা জানেও না। তাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই ওতে। উপস্থিত চলতি খেলাটা মাটি হয়ে গেল, সেটাই তাদের আক্ষেপ।

রাখাল ধৈর্য ধরে ওদের বোঝায় বিশ্বরূপ ধারণের বৃত্তান্ত। অর্ধেক কথাই মাথায় ঢোকে না ওদের। ওরা ক্ষেপে যায়।

'শালার ম্যাথায় ঘুরঘুরিয়ে পোক্।'

রাখালের ভারি ভালো লেগেছে শ্রীকৃষ্ণের ঐ পার্টটা। একেবারে বুকের

মধ্যে গেঁথে গেছে কথাগুলো। আরো লম্বা বক্তৃতা ছিল ওটা। সবটা মনে রাখতে পারেনি রাখাল। যতটুকু মনে আছে, সেটারই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে।

এখন মাঝে মাঝেই কথাগুলো ঠোঁটের ডগায় আউড়ে বড় সুখ পায় সে। নির্জন জায়গা পেলেই গলা ফাটিয়ে আবৃত্তি করে। তখন তার সারা গা গরম হয়ে যায়। শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়ে বিচ্ছুরিত হতে থাকে এক গুপ্ত তেজ। তখন একটা ঐশিশক্তি ভর করে ওর ওপর।

ইদানিং কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলো আর তেমন হয় না বটতলায়। রাখাল এখন আর জুত পায় না ওসব করে। এখন সর্বদাই তার বুকের মধ্যে গুর গুর করতে থাকে ঐ কথাগুলো, 'কে বাঁধবোক রে মোরে।'

গামিরতলায় জঙ্গলের দিকে গরুর পাল নিয়ে হাঁটছিল রাখাল। হাঁটতে হাঁটতে বুকের মধ্যে গুর গুর করছিল পার্টগুলো। চোখের পলকে সে বেড়ে যাচ্ছিল লম্বায়। মাথাটা আকাশের দিকে কচি লাউ ডগার মতো লতিয়ে লতিয়ে উঠে যাচ্ছিল। সরু পানা হাত দু'খানা লম্বায় বেড়ে গাঁয়ের দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ইদানিং এই এক বিচিত্র অনুভূতি এসে ভর করে ওকে।

কামেশ্বর দত্তর গড়ে সর্বক্ষণ চোরের মতোটি হয়ে থাকে সে। কামেশ্বরকে যমের মতো ভয় করে। গাঁয়ের মধ্যেও চোর চোর ভাবখানা থাকে। গাঁ ছাড়িয়ে গামিরতলার জঙ্গলের পাশাপাশি এলেই ধারে ধারে কাল ওর কুঁজো শরীরের খোলস ভেঙে বেরিয়ে পড়েন স্বয়ং পার্থসারথি। তখন তার মাথা ধীরে ধীরে আকাশ ছুঁতে থাকে। হাত দুটো গাঁয়ের এধার ওধার। আর তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে এক একটি সচল সজীব ব্রহ্মাণ্ড। তখন বুকের মধ্যে পাঞ্চজন্য বাজে অবিরাম। বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'কে বাঁধবোক রে মোরে...।'

বটের মগডালে বসেছিল রাখাল। পা' দুটো ঝুলিয়ে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছিল, বটের কচি পাতা ভেদ করে, তার মাথা আকাশের কাছাকাছি ঠেকেছে। আর ঝুলন্ত পা' দুটো একেবারে মাটিতে।'

তলায় মদন অভিলাষের দল দাঁড়িয়ে ছিল। মগডাল থেকে ওদের ছোট্ট ছোট্ট লাগছিল।

অন্যকে ছোট দেখলে, নিজেকে বিশাল মনে হয় মানুষের। রাখালেরও তাই হচ্ছিল।

ওপরের দিকে চোখ তুলে খিলখিলিয়ে হাসলো অভিলাষ। চিৎকার করে বললো, 'শালা তুর ছইতার ভিতোর যে আর এক বম্মাণ্ডো রে!'

সে কথায় হো হো করে হেসে উঠলো অন্যরা।

রাখালের মন তখন স্বর্গের কাছাকাছি। ভোঁ ভোঁ হয়ে উড়ছে। তার মনে রাগ নেই, উষ্মা নেই। এসব পার্থিব রিপুর অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছে সে। এখন তার বুক জুড়ে কেবলই করুণা আর উদারতা।

মদনদের উচ্ছসিত হাসিতে সেও মজা বোধ করে। অত্যধিক করুণা বশতঃ আচমকা ওপর থেকে ঝরিয়ে দেয় খানিকটা বৃষ্টি।

মদনরা পলকের মধ্যে সরে গিয়ে কোনও গতিকে গা' বাঁচায়।

এখনও রাতের বেলায় মাঝে মধ্যে মায়ের পাশটিতে শোয় রাখাল। মায়ের বুকের পাশটিতে ঘন হয়ে এসে, সে বাচ্চা ছেলের মতো আবদার জোড়ে, বসুদেব-দেবোকীর গল্প বল্না মা।'

গল্পটা অনেকদিনই শুনিয়েছে মা। বসুদেব-দেবোকীর বন্দী জীবন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। দুর্যোগের রাতে দৈববাণী। এ সবই বহুবার বলা হয়ে গেছে।

মা রাখালের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'অন্য একখান্ গল্পো বলি।'

'লয়'। অন্ধকারের মধ্যে জিদ ধরে রাখাল, 'উই গল্পোটাই।'

ইদানিং রাখালের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে মা। আগের মতো সেই সরলপানা মুখ নেই। মুখের কমনীয় শিরাগুলো অনেক শক্ত হয়েছে। হাঁটায়, চলায়, তাকানোয় কেমন একটা ভারি সারি ভাব। মুখে বিড় বিড় করে কি যেন সব বকে। তখন কপালের রেখায় ঘন ঘন ভাঙচুর হতে থাকে।

গত পরশু কামেশ্বর দত্তর সুমুখে অমন ভারি ভারি পা' ফেলে হাঁটতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে রাখাল। পিঠ ফেটে রক্ত ঝরেছে, সারা রাত কাটা-পাঁঠার মতো ছটকেছে, কাল এবং পরশু।

অন্ধকারে রাখালের পিঠে আলতো আঙুল ছোঁয়ালো মা। কাটা জায়গাগুলোতে লেগে চট্‌চট্ করে আঙুল।

রক্ত। ছেলের গায়ের রক্ত। অন্ধকারেও চিনতে ভুল হয় না।

হংস বাউরী এসে দুপুর নাগাদ খবর দিল, 'অলাদি সিং বেবাক ধান খেয়্যে ফেল্যেছে।' পন্দরো গুলি ঘুষুরশাল ধানের এক দানাও লাই।'

আগের যুগ হলে এক ডজন লগদী ছুট মারতো অনাদি সিংহের ঘরের দিকে এখন যুগ পাল্টেছে। আইন-কানোন বদলেছে। পঞ্চাৎ রাজ হয়েছে দেশে। এখন আর ঐ কায়দা চলে না। এখন বিচার করে সাজা দিতে হয় দোষীকে।

কামেশ্বর দত্ত নিয়ম মতো পঞ্চায়েতে একখানা দরখাস্ত করলেন।

'দাপানজুড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীঅনাদি সিং, পিতা গোষ্ঠ, আমার নিকট মোট দশ গুলি ধান কর্জ লইয়াছিল। সুদে-মূলে তাহা পনের গুলি হইয়াছে। এ বিষয়ে কাগজপত্র সমস্তই আমার নিকট মজুত রহিয়াছে। শর্ত মোতাবেক জমির ফসল কাটিলেই তাহার কর্জ শোধ দিবার কথা। হিসাব অন্তে এই বৎসর মাঘ মাসে তাহার ঘরে আমি পনের গুলি ধান গচ্ছিত রাখি: এক্ষণে জানিলাম, সে আমার সমুদয় ধান্য—'

আসলে অনাদি সিংহের অত সাহস হবে, কামেশ্বর বাবু স্বপ্নেও ভাবেন নি। দাপানজুড়ির গাঁয়ের সব পাড়া মিলিয়ে প্রায় তিরিশটা ঘরে তাঁর ধান থাকে ফি' বছর। লেভী আর ধান সিজ চালু হয়েছে যদ্দিন, তদ্দিন থেকে এই ব্যবস্থা। ফাগুন-চোত-বৈশাখ—এই তিনটে মাস বলকের বাবুরা বড় জ্বালান্। যখন তখন উজবুদ্দা হাজির। কি? না, ধান দেখবো। মড়াই ঢুঁড়বো। এখন ছাখ্। যত খুশি। নিজের ঘরে ঢুঁ। শুধু খাবার চাল আর বীচন ধান। বাকি সব ফক্কা। অনাদি সিংহের ঘরে ঘরে তারা বাচ্চা পাড়ছে।

বৈশাখ মাস পেরোলেই বিপদ কেটে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে বৃষ্টি। রাস্তা-ঘাট কাদা। বাবুদের জিপ ঢোকার অসুবিধে। পাড়ার ঘরগুলো থেকে তখন সমস্ত ধান সুড় সুড় করে ফিরে এলো কামেশ্বরের গোলায়। ঝাঁকের কই ঝাঁকে।

দরখাস্ত পেশ করেই কামেশ্বর দত্ত বললেন, 'শালাকে জোর দাব্ড়ান্ লাগাও হে পড়ধান। ছাশে আইন-কানোন সব গিল্যে থাব্যেক উয়ারা।'

হংস বাউরী সারা গায়ে ঝাঁকি মেরে বললো, 'শালাকে টাঙান্ হউক খুঁট্যায়।'

অকুল প্রধান ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছিল ক্রমশঃ। বললো, 'তাই হব্যেক।'

কামেশ্বর দত্তর জমিনের ওপর ক্লাব বানিয়েছে ছেলেরা। কামেশ্বরের ষণ্ডা-মার্কা ছেলেটাই তার সেক্রেটারি। সেক্রেটারির হুকুমে জনা পাঁচ-ছয় ছোকরা অনাদি সিংহের দুয়োর আগলে বসেছে। সন্ধ্যেবেলায় পঞ্চায়েতের বিচার

বসবে। তার আগে কোনও ক্রমে লোকটা পালিয়ে যেতে না পারে। এ শালাদের পালিয়ে যেতে আর কতক্ষণ। সব কিছু পেটে পুরে স্বর্গের পানে ছুঁঠ্যাং তুলে বসে রয়েছে। থাকার মধ্যে এক চিলতে ভিটের ওপর একখানা ঝুপড়ি ঘর। তাও কামেশ্বর বাবুর দুয়োরে বাঁধা রয়েছে এক যুগ।

কামেশ্বরের গড়েই আজ পঞ্চায়েতের বিচার বসবে। বিকেল নাগাদ হংস বাউরীর তত্ত্বাবধানে উঠোনের মধ্যে একটা শাল কাঠের পোত গড়া হোল। সে পোতের দুদিকে দু'খানা হাত।

কামেশ্বর দত্তর ছেলের বউ বাচ্চা কোলে নিয়ে দোতালার খোলা বারান্দা থেকে অলস চোখে দেখছিল মাহিন্দারদের কাজকর্ম।

কোলের বাচ্চা সহসা শুধিয়ে বসে, 'ওমা, ইতা কি?' 'ইখ্যেনে পোত গাড়তেছে বাপ।' অলস গলায় জবাব দেন মা। 'ক্যানে?'

'ইখ্যেনে সাঁঝের বেলায় ঐ চড়কের উড়া হবেক বাপ।'

দিন কয়েক আগে, মায়ের কোলে চেপে চুয়ামসিনার চড়ক দেখে এসেছে ছেলে। স্মৃতিতে এখনও সে দৃশ্য জীবন্ত। একটা লোককে পোতের সাথে বেঁধে ঘোরানো হয় শূন্যে।

খুশীতে ডগোমগো হয়ে বাচ্চা শুধোয়, 'ওমা, ঢোল বাজব্যেক?'

'বাজব্যেক বাপ। তুই দুধ খাবি চল ইখন।'

রাখাল এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গ জানতো না। সে সারাদিন গামিরতলার জঙ্গলে গরু চরিয়েছে।

সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এসে দেখলো, কামেশ্বর দত্তর দেউড়ির মধ্যে এক জমজমাট চড়কের আয়োজন। পঞ্চায়েতের বাবু ভায়ারা একে একে আসছেন। হ্যাজাক লাইটে কষে পাম্প দিচ্ছে হংস বাউরী। উঠোন জুড়ে একটা আলগা জটলা।

খিড়কির পুকুরে পা ধুতে গিয়ে মায়ের মুখে শুনলো কথাটা আদ্যপ্রান্ত। অনাদি সিংকে টাঙন হব্যেক আইজ। বিচার হব্যেক উয়ার। বাবুর ধান খেয়ে ফেলেছে।

চকিতে রাখালের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বহু যুগ আগের একটা স্মৃতি। একটা শাল কাঠের পোতে বাপের ঝুলন্ত শরীর। এলোপাতাড়ি বেতের ঘা পড়ছে সারা গায়ে। টপাটপ রক্ত ঝরছে।

রাখালের মুখে কড়কড়ে ভাতের দানাও রুচলো না। খিড়কির দাওয়ায়

গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো সে। একযুগ আগের দগদগে স্মৃতিখানা মগজের মধ্যে সক্রিয় অস্থির। নাকে কানে পেঁচিয়ে গামছা জড়ালো সে। ইন্দ্রিয়ের সব দ্বার রুদ্ধ করে শুয়ে রইলো চুপচাপ।

অনাদি সিংহের বুক ফাটা আর্ত্তনাদটা কিছুতেই শুনতে চায় না রাখাল। কিছুতেই না।

সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবের ছেলেরা অনাদি সিংকে নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকলো দেউড়ির ভেতরে।

এদিকের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত। বাবু ভায়াদের চা' পান পর্যন্ত শেষ। উঁচু বারান্দায় চেয়ার চেপে বসে, এখন গুলতানিতে মত্ত ওঁরা।

উঠোনে একটা ছোট খাট ভীড়। মানুষের মুখে কৌতূহল ও আশঙ্কার ছায়া মাখামাখি। কি হয় আজ। অনাদি সিংয়ের কি হয়।

এক কোনে বসে বসে অনাদি সিং ভুল ভুল চোখে দেখছিল সবাইকে। ভাবলেশহীন মুখ। ভয়ে আতঙ্কে কাঠ।

দু' একটা আল্গা কথা চালা চালির পর অনাদিকে পোতের কাছাকাছি আনা হোল।

দু'দিক থেকে দু'জন ছোকরা দড়ি বাগিয়ে নিয়ে দাঁড়ালো। পড়ধান বাবুর হুকুমে অনাদির হাত দুটোকে মুচড়ে পেছনে এনে দড়ি পরাতে লাগলো ওর দু' হাতে।

অকস্মাৎ জমায়েতের ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এলো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে।

'কে বাঁধব্যেক রে মোরে? জান লাই কি ওরে মূঢ় হলো পেয়োজন, স্বগ্যো-মত্তো-পাতাল বিদারি, কাঁপ্পাইয়া চন্দো-সুয্যো-গহো-তারা দলে, বরজের রাখাল কিস্তো দেখ্যা দিব্যেক মহাকাল রোপে—।'

ছইতার ওপর গামছাখানা কষে বেঁধে উন্মত্তের মতো লাফাতে লাগলো রাখাল।

মুহূর্ত্তে জমায়েতের মুখ ঘুরে গেল রাখালের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে তাকে জাপটে ধরলো অনেক। কিন্তু রাখালের শরীরে তখন অসুরের বল। তাকে এখন সামলে রাখা দায়।

ক্লাবের ছোকরাটা অনাদিকে ছেড়ে ছুট মারলো রাখালের দিকে। বাবু ভায়ারা উঠে দাঁড়ালেন ব্যাপার খানা দেখার জন্য।

অন্য চারেক ছোকরা চার পাশ থেকে জাপটে ধরলে রাখালকে। অবিরাম ঝাঁকি মারতে মারতে রাখাল চিৎকার করতে লাগলো, 'দেখিতে বাসনা যেদি মহাকাল রোপ, কাললিত্য হেরিতে কামনা,—বাঁধ বাঁধ তেবে রে কৈরোব, বাঁধ রে গোপালে।'

'আবে শালা, তোকে বাঁধছো কে?' ধমকে উঠলো কামেশ্বরের ছেলে।

'অঝা ডাকো হে।' ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'এ শালা অল্পে চেৎ মান্‌বেক লাই।'

হংস বাউরী এগিয়ে এসে সপাটে এক চড় কষালো রাখালের গালে।

রাখালকে নিয়ে বাবুদের রগড়টা যখন তুঙ্গে, সেই ফাঁকে সুযোগটি বুঝে প্রাণপণে ছুট মারলো অনাদি সিং। অন্ধকার ভেদ করে সে তীরের মতো বেরিয়ে গেল দেউড়ীর বাইরে।

পেছনের হৈ হৈ করে ছুটে আসছিল ছোকরার দল। কিন্তু অনাদির পায়ে যেন হরিণের ক্ষিপ্রতা। সুমুখে গভীর শালবন। একটিবার তার মধ্যে ঢুকতে পারলে আর এ জন্মে খুঁজে পেতে হবে না অনাদিকে।

এই মুহূর্তে দেউড়ির ভেতরে, রাখালের মাথাটা আকাশের ছুঁয়েছে। হাত গাঁয়ের দু'ধারে।

সে কল্পনা করছিল। তার ছোট্ট শরীর খানা এখন বিশাল রূপ নিয়েছে। তার সারা গায়ে অজস্র পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, স্থাবর-জঙ্গম। তার বুকের কাছে ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি। অসংখ্য গাছ-পালা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ।

এখন, তার প্রতিটি রোমকূপে এমনিতরো অগুনতি সচল, সজীব ব্রহ্মাণ্ড।

ঘোর লাগা চোখে সে দেখতে পাচ্ছিল, তাকেই যেন বাঁধতে চাইছে কামেশ্বরের লোকজন। কারণ এই মুহূর্তে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে, নিরাপদে আশ্রয় ভেবে ওর বুকখানার মধ্যে বাসা বেঁধেছে ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বন্দী-প্রায়বন্দী মানুষ।

বৃষ্টিস্নাত জ্যোৎস্নায় এ কার পায়ের
আ....ও....য়া....জ

সুপ্রিয় বাগচী

সুধাময়ের মুখ ফসকে বেড়িয়ে গেল—'সত্যি।' মৃণ্ময় দারুণ ক্ষেপে গিয়ে কাঁচের পেপার ওয়েটটা ছুঁড়ে ফেললো। দরজার কাছে ওটা আছড়ে পড়লো। লীনা খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলো। আর তখনই শোনা গেল পায়ের আওয়াজটা। মৃণ্ময় শুনতে পেল—কে যেন আসছে।

লনটার ওপাশে জ্যোৎস্না লুঠোপুটি খাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও ডাকবাংলোর সামনে দাঁড়ানো বুর্ক গাড়ীটায় বৃষ্টিস্নাত জ্যোৎস্নার রূপটা চক্ চক্ কোরছে। হাইওয়ে থেকে ভেসে আসা একটা ট্রাকের গর্জন স্পষ্ট শোনা গেল। দরজার কাছে এসে পায়ের আওয়াজটা থেমে গেছে।

কোলকাতা থেকে বেরোবার সময় এখানে রাত কাটানোর কোনো পরিকল্পনা অন্ততঃ মৃণ্ময়ের ছিলনা। সুধাময় কিংবা লীনা এবিষয়ে কোনো কথাও বলে নি। নেহাৎ গাড়াটা বিগড়ে যাওয়াতে এই বিপত্তি। দু'জন লোক লাগিয়ে গাড়ীটা যখন এখানে ঠেলতে ঠেলতে পৌঁছালো তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও সেই লোকটার আবছা কটাক্ষ এখনও কানে বাজছে—'ও কুঠি আচ্ছা নেহি সাব। ঠেলে আনা গাড়ীর লোকদুটোকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেও যখন একই উত্তর পাওয়া গেল তখন সুধাময় এবং লীনা হাসলেও মৃণ্ময় কিন্তু প্রথমেই অবাক হয়েছিল ঘরের দরজাটা খুলতে। কে যেন ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। হয়'তো অবচেতন মনের বৈকল্যে অনুভূতিটা বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এই পায়ের আওয়াজ? তাছাড়া সেই ইস্কাপনের বিবি যা মৃণ্ময়কে সমানে তাড়া করে চলেছে বৃষ্টির পরে ওঠা এই জ্যোৎস্নারাতে। ফ্ল্যাশবোর্ডে হাতের তাসগুলোকে ফেলে জমে থাকা নোটের স্তূপে হাত বাড়াতেই শুনতে পেয়েছে—হোটেলের চারতলার সিঁড়িতে উঠে আসা সেই পায়ের আওয়াজ। জানলার দিকে চোখ পড়তেই নজরে পড়েছে গগনচুম্বী

ওপারের কার্নিশে বৃষ্টির পর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। বন্ধুদের সামনেই নোটের স্তূপগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে সামনে রাখা হুইস্কির বোতলটা একনিশ্বাসে শেষ করে কান পেতেছে। দরজার সামনে এসে থমকে গেছে আওয়াজটা।

স্থরমাকে প্রথমে কোথায় দেখেছিল মৃণ্ময় ঠিক মনে কোরতে পারে না। খুব সম্ভব অনিলের বৌভাতে। তারপর অন্তরার বিয়েতে। হয়'তো সেটাই প্রথম দেখা। তাসের টেবিলে স্থরমাকে দেখে অবাক হয়েছিলো মৃণ্ময়, সেটা সম্ভবত উনিশশো পঁচাত্তরের জানুয়ারীতে। 'কি দেখছিস হাঁ করে। তাসের রাণী—আমরা ওকে বলি ইস্কাপনের বিবি। কথাটা মিথ্যে বলে নি প্রদ্যোত। ফ্ল্যাশের রাজা মৃণ্ময় কয়েক রাউণ্ড পরেই শেষ কর্পদকটুকুও পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলো স্থরমার কাছে।

'কি হল? আর খেলবেন না?' স্থরমা মুখ টিপে হাসলো। মৃণ্ময় লক্ষ্য কোরলো ওর মুখের নিপুন সৌন্দর্যে চটুল ব্যঙ্গের রেখা।

'না।' মৃণ্ময় একটা সিগারেট ধরাল। প্রদ্যোত কিছুটা দূরে হিটারে কফি বানাচ্ছিল।

মৃণ্ময় স্থরমা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইলো। সৌন্দর্যের কোনো ঘাটতি কোনো জায়গায় নেই। নিটোল গড়ন, স্থন্দর মুখশ্রী, বিশেষত চোখের তারা এবং ঠোঁটের কাছে এসে থমকে যাওয়া স্থন্দর দুটি ঈষৎবিস্তৃত নরম গোলাকার নাসারন্ধ্র চেহারাটাতে যেন আরও কিছু নমনীয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই চেহারায় তাসের রাণী। প্রদ্যোত বলছিলো—'ইস্কাপনের বিবি'—না বিশেষ কোনো কৌশলের অধিকারিণী এই মহিলা।

বাড়ী এসে সেদিন মৃণ্ময় কিছু খেল না। শুধু হেরে গিয়ে অর্থের জন্যে লোভ নয়—কেমন যেন একটা গ্লানি মৃণ্ময়কে অবসাদে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ঘুম হল না। প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করেও স্থরমার ফ্ল্যাশের অদ্ভুত কৌশল এবং সাফল্যকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত হতাশা হয়ে ইজিচেয়ারে গাটা এগিয়ে দিল। 'ইস্কাপনের বিবি'—হ্যাঁ একটা পথ আছে। অভিনয়—প্রেমের অভিনয়' ইস্কাপনের বিবির গোপন রহস্য সেই সূত্র থেকেই আবিষ্কার করা যাবে। ভোরের দিকে একটু ঘুম হল। সকালবেলায় মৃণ্ময় ফোন কোরলো প্রদ্যোতকে।

'ঐ ভদ্রমহিলা কোথায় থাকেন তুই নিশ্চয়ই জানিস্।'

'কেন ? বিয়ে কোরবি নাকি ?' প্রদ্যোতের হালকা হাসি টের পেল মৃণ্ময়।

'না—ভাবছি।'

'কি ভাবছিস্ ?'

'অদ্ভুত ওর ক্ষমতা। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

'সেজন্যেই ওকে আমরা তাসের রাণী কিংবা ইস্কাপনের বিবি বলি।'

'তোর কি মনে হয় ভদ্রমহিলা কোনো অলৌকিক' ক্ষমতার অধিকারিণী।'

'যদি হয় তা'হলে সাবধান। তুই যা ছেলে ফষ্টিনষ্টি কোরতে গেলে জানে মারা পড়বি।'—প্রদ্যোতকে এবার সিরিয়াস মনে হল।

মৃণ্ময় দাঁতে দাঁত চাপলো। একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

'কি হল ? প্রদ্যোতের গলা শোনা গেল।

'না, কিছু না। ঠিকানাটা বললি না।'

প্রদ্যোত ঠিকানাটা বললো। মৃণ্ময় রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

সেই থেকে শুরু। সুরমাকে কখন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে সুরমা বুঝতে পারে নি। কপট প্রেমের অভিনয়ে দক্ষ মৃণ্ময় সুরমাকে খেলাতে খেলাতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সুরমার চোখে মৃণ্ময় তখন একমাত্র আদর্শ পুরুষ।

হোটেলের পাঁচতলায় সেদিন ফ্ল্যাশবোর্ডে মৃণ্ময় দুর্বার হয়ে উঠেছিল। অরিন্দম, প্রদ্যোত, অভিজিৎ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য কোরছিলো মৃণ্ময়ের অদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা। কিন্তু সুরমা হাজির হতেই মৃণ্ময় চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মতো। সুরমা খেলতে রাজী হয় নি প্রথমে। অনেক পীড়াপীড়িতে বসবার পরই দুর্বার মৃণ্ময় শেষ কড়িটি নিঃশেষ করে সুরমার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য কোরলো সেই হাসি যা জ্বালা ধরায়। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য সুরমা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওর বুকের বাঁদিকে এইমাত্র ছুরি দিয়ে চিরে দেওয়ায় রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে অবিশ্রান্তভাবে। আর মৃণ্ময় ওর দেহের ওপর সেঁটে ঝুঁকে পরে আকণ্ঠ পান কোরছে সেই রক্তধারা!

'কি হল ?'—প্রদ্যোতের কথায় মৃণ্ময়ের চমক ভাঙলো। কিন্তু সুরমার বুকের রক্তের স্বাদটা তখনও ঠোঁটে লেগে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় ওর পাশ দিয়ে টোটন নেমে গেল। সুরমার ছোট ভাই। আশ্চর্য ওদের মুখের মিল। চোখ, নাক, ভুরু। নাসারন্ধ্রের আবর্তিত গোলাকার পরিধি পর্যন্ত। একই ছাঁচে ঢালা। সুরমার চেয়ে আট বছরের ছোট। ক্লাশ এইটে পড়ছে।

টোটন ছটফট কোরতে লাগলো। মৃণ্ময়ের ইস্পাতের মত দেহটা ওর দেহের ওপর সেঁটে বসেছে। মৃণ্ময়ের নিষ্ঠুর ঠোঁটের উন্মাদনায় ওর গাল, ঠোঁট, নাকের পাটাদুটো এবং কপাল জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলো। চিৎ হয়ে শুয়ে মৃণ্ময়ের দেহের তলায় নিষ্পেষিত হতে হতে ওটের পেল মৃণ্ময় আরও অতিকায় এবং স্ফীত হয়ে অন্য এক মৃণ্ময়ে পরিবর্তিত হয়ে ওর ভেতরে প্রবেশ কোরছে। অপ্রতিরোধ্য মৃণ্ময় তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত টোটনের মুক্তি নেই। (সুরমার বুকের মিষ্টি রক্ত) এবং এখন রক্তাক্ত টোটন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তৃপ্ত মৃণ্ময় উঠে দাঁড়াল। ফ্ল্যাশবোর্ডে একবিবি, এক গোলাম রক্তে ভিজে সপ্ সপ্ কোরছে।

সুরমা ঘরেই ছিল। আলগা কটা কথা বলে মৃণ্ময় ফিরে এল। এইবার ফাইনাল শট টেক হবে। বাড়ীতে এসে তাসের প্যাকেটটা টুকরো করে তাস সমেত দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিল। সুরমাকে কব্জায় এনেও ও আশ্চর্যভাবে সুরমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। জেনে নিতে পারে নি রহস্যের মূলসূত্র কিংবা চাবিকাঠিটাকে। সুরমা সতর্ক হয়ে নিজেকে গণ্ডির বাইরে রেখেছে। হোটেলে সেদিনে কথা বলতে বলতে নিজেকে আড়াল কোরছিলো সুরমা। আর সেজন্যেই ফ্ল্যাশবোর্ডের ইস্কাপনের বিবি সুরমায় রূপান্তরিতা হয়ে ঘটনায় গুরুত্ব লাঘব করার জন্যে মৃণ্ময়ের সামনে কত হালকাভাবে নাক খুঁটছিলো। ওর আঙুলের চাপে স্ফীত হয়ে নাকের পাটা ওঠানামা কোরছিলো। কত সহজে দুটো আঙুলে ঘষে ময়লাগুলো ফেলতে ফেলতে মৃণ্ময়কে দুই আঙুলের টিপে পিষে হত্যা কোরছিলো সুরমা, ওর নাক খুঁটবার দৃশ্যটা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মৃণ্ময় তা বুঝতে পারছিলো। মৃণ্ময়কে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুরমা না থেমেই বলেছিল—'আমায় নাক খুঁটবার ভঙ্গীমার মধ্যে কিছু প্রতীকী ঘটনার ছায়াপাত লক্ষ্য কোরছো নাকি ?

'না—' ?

'তবে ?'—সুরমা মুখ টিপে হেসেছিলো।

এই হাসিটা সাপের বিষের মতো মৃণ্ময়ের ভেতরে ঢুকে জ্বলতে থাকে। যে জ্বলুনির ধাক্কায় কিছুক্ষণ আগে মৃণ্ময় টোটনকে ধর্ষন কোরতে বাধ্য হয়েছে। সবকিছু তছনছ করে দেবে মৃণ্ময়। ফ্ল্যাশবোর্ডের অপমান সুরমাকে কড়ায়

গণ্ডায় শুনতে হবে। শুনতে হবে সুরমার নিজের বুকের রক্তে, এমনকি ওর থেকে আটবছরের ছোট ক্লাশ এইটে পড়া কিশোর ওর ছোট ভাই টোটনের ধর্ষিত হওয়ার যন্ত্রনায়—

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় জ্যোৎস্নাটা নজরে পড়লো মৃণ্ময়ের। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছাদের ওপাশে জ্যোৎস্নাটা লুটোপুটি খাচ্ছে। ঠিক যেভাবে সুরমা লুটোপুটি খেয়েছিলো মৃণ্ময়ের কপট আলিঙ্গনে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে মৃণ্ময়। সমস্ত তৃষ্ণার শান্তি মিটিয়ে আকণ্ঠ ভরে পান কোরেছে গ্লানির কিংবা প্রতিশোধের এতদিনের পুষে রাখা সেই লবণাক্ত ফল্গু ধারাকে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মাঝে মৃণ্ময়ের এত-দিনের অদম্য বাসনা মূর্ত হয়ে উঠে নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করে এখন ফিরে যাচ্ছে বৃষ্টিস্নাত জ্যোৎস্নায়। সুরমার চোখের সেই তারাদুটো বিস্ময়ে যেন আরও বড় দেখাচ্ছিলো। নাকের পাটাদুটো ধীরে ধীরে ফুলছিলো। সুন্দর নরম নাসারন্ধ্র দুটির সেই ভঙ্গী দানব মৃণ্ময়ের মনে সাময়িক নেশাও জাগিয়ে ছিলো।

সুরমা বুঝতে পারছিলো সেই পরাজিত তাসের যোদ্ধাটি নিষ্ঠুর আক্রোশে ওর বুকের রক্তপান কোরছে। চিৎ হয়ে শুয়ে নিষ্ঠুর দানবের সেঁটে থাকা দেহটাকে নিজের দেহের ওপর স্থির রাখতে পারছিলো না সুরমা। কিন্তু উপায় নেই। কপট প্রেমের অভিনয়ে বক্ষ আবরণী আলগা করে বুকের অনাবৃত বাঁদিকে ইস্পাতের নিষ্ঠুর ফলা তখন বিঁধে গেছে। বেশ কিছুটা চিরে ফলাটা সরে গেছে। তার পরিবর্তে নেমে এসেছে দানবের একটা মুখ। মুখ ডুবিয়ে আকণ্ঠ ভরে পান কোরছে ওর বুকের তাজা রক্ত। মুখটা বাঁদিকে ফেরাল সুরমা। একবার বাঁ হাতের একটা আঙুল দিয়ে ডানদিকের নাসারন্ধ্রটা খুঁটে পরীক্ষা কোরতে চাইলো নিঃশ্বাসের অস্তিত্ব। পরক্ষণেই দানবের দাঁতের নিষ্ঠুরতার অনুভব কোরলো চিরে যাওয়া বুকের বাঁদিকে। যন্ত্রনায় মুখ ফেরাল সুরমা। বাঁ হাতের একটা আঙুল তখনও ডানদিকের নাসারন্ধ্রে পরীক্ষার অবস্থায় ঢোকানো রয়েছে।

সুধাময়ের মুখ ফসকে দ্বিতীয়বার কথাটা শোনা গেল—'সত্যি!' মৃণ্ময় দারুণ ক্ষেপে গিয়ে কাঁচের আর একটা পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মারলো। দরজার কাছে প্রথম পেপার ওয়েটটার কাছে গিয়ে ওটা সশব্দে আছড়ে পড়লো। লীনা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। তখনই শোনা গেল পায়ের আওয়াজটা শুধু মৃণ্ময়ই শুনতে পেল। কে যেন আসছে।

দুঃসময়

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

শুষ্ক গৈপথের পারে বসে আছে দুটি মানুষ। নেবুগোলার মানুষ। অন্ধকারে মুড়ে আছে তাদের দেহ। সন্ধ্যে এখনো যায়নি। অথচ চারপাশ ডুব মেরেছে আঁধারিতে। কোথা থেকে এক দঙ্গল উটকো মেঘ এসে হাজির হলো কে জানে। অসময়ের মেঘ। অলক্ষণের চিহ্ন। শীতের শেষ বেলায় এরকম উটকো মেঘ মানুষ দুটি আগে দেখেনি।

দেখেনি অনেক কিছুই। এ মুলুকে কেউ কি কখনো দেখেছে ভেড়ির বুক শূন্য। জল নেই ছিটেফোঁটা। থাকবে কোথা থেকে। বর্ষার মুখে ভেড়ি বিক্রী হয়ে গেল ভিন্ দেশী মানুষের হাতে। তারা হিন্দীতে কথা বলে। নতুন মালিক ভেড়িতে চাষ দেবেনা। কথাটা যখন সমস্ত নেবুগোলায় ছড়িয়ে পড়ে লোকে পরস্পরের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। 'এ আবার কি কথা। ভেড়িতে চাষ হবেনা। সে জমিতে পেল্লাই পাকা দালান উঠবে। তৈরী হবে কারখানা-শেড।

শুধু ভেড়িতেই নয় গাঁ জন্তু মানুষের বুক থেকে জল উবে গিয়েছিল। কিন্তু দুটি মানুষ ফুর্তিতে ছিল তখনো। আজিজুল আর ভগীরথ। শুধু নেবুগোলা কেন আশপাশের আর চার পাঁচ গ্রামে তাদের মতো পাকা নিশানাবাজ নেই। বকডোবার ধানক্ষেতের ওপর আকাশের বুক থেকে এক তাকেই উড়ন্ত গোবক নামিয়ে এনেছিল আজিজুল। ভগীরথ তার থেকে এককাঠি ওপরে। কাঁধের ওপর জোড়া কুঁকড়ো চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঝুমরু প্রামাণিকের বৌ। মোরগ মুরগী এক দড়িতে বাধা। শাকরেদ আজিজুল বাজি ধরেছিল, পারবি মুরগীটার গায়ে না লাগিয়ে মোরগটার ঝুঁটি উড়িয়ে দিতে। এক বোতল বিলিতি মাল খাওয়াবো। বন্দুকের দানা লক্ষ্য ফসকে পাখি দুটোর বদলে ঝুমরুর বৌয়ের মাথাটা ফুটো করে দিতে পারে একবারও ভেবে দেখেনি কেউই। কারণ আছে যথেষ্ট। আজিজুল জানে এ ভগীরথের হাত। বড়োজোর মুরগীর গায়ে লাগতে পারে তার বেশী নিশানা ঝুকবে না। শেষ পর্যন্ত ভগীরথ আজিজুলের কাছ থেকে এক বোতল বিলিতি মাল পেয়েছিল।

এমন দুই পাকা বন্দুকবাজের উপযুক্ত কদর করেছিলেন রঘু নস্কর। নেবুগোলার সবচেয়ে বড় ভেড়ি, ঘোড়ার ভেড়ির মালিক। মাঠঘাট থেকে দুই মানুষকে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন আলাঘরের মাচানে। মাচানের ওপর সারা রাত ধরে দুই মানুষ যেমন মৌতাত করেছে তেমনি চোখ জোড়া সজাগ রেখেছে। ভেড়িতে চোর কেন একটা দুটো বনবেড়াল পর্যন্ত ঢুকতে সাহস পেতনা। এর দাম রঘু নস্কর নিক্তিতে মেপে দিয়েছেন। আলাঘরে পাকাপাকি থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। শোবার খাটিয়া থেকে রান্নার সাজ সরঞ্জাম সবকিছু ছিল। জমে উঠেছিল দুই মানুষের সংসার।

সেই সংসার যে এরকম হঠাৎ ভেঙে যাবে কেউ টের পায়নি। ভেড়ির বুকে কারখানা গজালে এ জমি থেকে তাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে এটা আন্দাজ করতে পারেনি। আজিজুল দোনলায় হাত চেপে বলেছিল আমাদের ভয় কি রে ভগী এই বন্দুক যতোক্ষণ আছে পেটের চিন্তা নেই। কারখানা পাহারা দেবার জন্যে লোক লাগবে না! কিন্তু সে মতলবে ছাই পড়েছিল। জমির নতুন মালিক অচেনা লোক রাখতে সাহস পাচ্ছেনা। সে নিজের বিশ্বাসী লোক রাখবে।

বিশ্বাসী লোক! কেন তারা কি কম বিশ্বাসী! তাদের কথায় বিশ্বাস না হয়তো রঘুর কাছেই যাক। তারা দুজনেও রঘু নস্করের কাছে যায়। রঘু মাথা নীচু করে শীতল স্বরে বলেছিল, দুর বোকা আমার কথায় কি কাজ হবে রে, ও জমির ওপর এখন আমার কি আর জোর আছে। এ কথা দু'মানুষ একবারও ভেবে দেখেনি। ও জমির ওপর রঘুর এখন কোন অধিকার নেই। তাহলে! তাদের হাতে যে বন্দুক আছে তা যে নিজস্ব নয়। রঘুই কিনে দিয়েছিল। সেই প্রথম দুই মানুষ টের পায় বন্দুক যে চালায় তার কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা আছে তার যে বন্দুক কিনতে পারে।

চাল কিনিচিস? অন্ধকার থেকে আজিজুলের স্বর ভাসে।

ভগীরথ দেখতে পায়না ওর মুখ। না দেখলেও আন্দাজ করতে পারে আজিজুলের স্বরে কিসের টান। ও স্বরে এখন পেটের টান। শেষ যে লোকটিকে তারা ধরেছিল মাস খানেক আগে তার কাছ থেকে বেশ কিছু আনাজপাতি আর খান পঞ্চাশেক টাকা লগগা হয়। তরকারিপাতি শেষ হয়েছে সপ্তাহ খানেক। টাকা যা ছিল চাল কিনতে খরচ হয়। তবু এর মধ্যে থেকে কয়েকটা টাকা ভগীরথ বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজ হাটে যাওয়ায় সে কটি

খরচ হয়েছে।

আজিজুল ফের ডাকে, কিছু বলতিচিস না যে।

কি বলবে ভগীরথ। যা চাল সে এনেছে দু'মানুষ কেন এক মানুষের অন্ন হবে কিনা সন্দেহ। ভগীরথ বাতাস হাল্কা করতে উত্তর দেয়, হুঁ কিনিচি, হাফ কেজি খানেক।

হাফ কেজি কেন। আজিজুলের কণ্ঠস্বরে উষ্মা। অত্তোগুলো টাকা নে হাটে গেলি যে।

এবার ভগীরথও রেগে যায়। টাকা কি আমি খেয়িচি, দানা কিনতি হয়িচে খেয়াল আচে। দু'টাকা বেশী, আটেরোর মাল কুড়িতে, পুলিশ ধর পাকড় করতিচে বলি বেলাক হচ্চে। দু'টাকা বেশী। আটেরোর মাল কুড়িতে। পাঁচ কেজি চালের দাম। একটা বন্দুক এতো খেতে পারে। কতো বড়ো পেট। তার থেকেও কি বড়ো।

খুব যে ছোট নয় তা আজিজুল বুঝেছিল প্রথম শিকারের দিন। দোনলার গলা উজিয়ে যে শব্দটা বের হয় তা শুধু মাত্র চারপাশের জনহীন ভেড়িপ্রান্তরের বুক চেড়ে নি, খুলে দিয়েছিল দুই মানুষের নসীবের দরজা। আলাঘরের সামনে বসে আসন্ন বিপদের কথা নিয়ে দুই মানুষ যখন সাত সকালে আলোচনায় ব্যস্ত, চোখ পড়েছিল মাঠ জোড়া কুয়াশার ওপাশে লোকটি হেঁটে যাচ্ছে। মাথায় কাচা মালের ঝুড়ি। শস্তায় কিছু কিনে নেবার জন্যে হাঁক পেরেছিল। দুই কে যায় রে .... । শুনশান মাঠে মানুষের গলার স্বরে লোকটি ভয় পায়। হঠাৎই বাড়িয়ে দেয় গতি। তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। এক সঙ্গে ডাক দেয় ফের। আজিজুলের অন্যমনস্ক হাত পড়েছিল বন্দুকের ঘোড়ায়। বন্দুকের নল উজিয়ে আকাশের বুকে মিলিয়ে যায় গুলি। চারপাশ জুড়ে প্রচণ্ড শব্দ ঘুরতে থাকে। কুয়াশার পর্দায় সেই শব্দ ধাক্কা খেতে খেতে ভৌতিক ঢেউ তুলেছিল। আর সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় খুলে যায় তাদের কপাল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আনাজ বোঝাই ঝুড়িটা ফেলে দিয়ে কোনদিকে যে উধাও হয়ে গিয়েছিল লোকটা হদিস পায়নি। জমির বুক থেকে আনাজপাতি কুড়িয়ে নিতে নিতে আজিজুল হাসতে হাসতে বলেছিল কি বুঝলে মিঞা, বলিচিলাম না যতোক্ষোন এই দোনলা আচে পেটের চিন্তা নেই কো।

কিন্তু ঢের চিন্তা আছে। শুধু সব্জী নয়, ঝুড়ির ভিতর টাকার থলেও

পেয়েছিল। প্রথম কটা দিন নিশ্চিন্তে গেছে। নগদ টাকায় আজিজুল হাট থেকে চাল কিনে আনে। অসুবিধায় পড়লে হবে কি মেজাজটা তার নিশানা-বাজের। চোখ সব সময় উঁচুতে। কিন্তু দিনকতক হলো দুজনেই টের পাচ্ছে বন্দুক দিয়ে আর কাজ চলবে না। আমদানির চেয়ে খরচ বেশী। ভগীরথ রাগ করে বলেছিল, এই অসময়ে একটু বুঝিশুনি চল দেকি। দানাটা কি রকম বেমক্কা খরচ করলি! একটা মানুষকে ভয় দ্যাকাতি যদি বিশটা টাকা খরচ হয় জ্যাস্ত মানুষটাকে খতম করতি হলি কি করবি বল দিকিনি! ভগীরথের কথায় রাগ হলেও আজিজুল কিছু বলেনি। কথাটা কঠিন হলেও অন্ধকারের মতো সত্যি।

কিন্তু কতোটা বুঝে শুনে চলবে। দু'কুনকোর জায়গায় এক কুনকো চাল চাপিয়েছে। ঘুমের ঘোরে বন্দুকের গায়ে হাত পড়লেও পেটের নিয়মে সয়ে গেছে আপনাআপনি। এরপরেও কাল রাতে চালের ড্রামে হাত ঢোকাতে দেহে খেলে গেছে কালশীত। ড্রামের উদর শূন্য। তলায় গিয়ে হাত ঠেকাতে আজিজুল শুধু টের পেয়েছে অন্ধকার। আজ ভগী হাফ কিলো এনেছে। কিন্তু কাল। হাড়ে হাড় ঠুকে যায়। এ পৃথিবীতে তাপ কোথাও নেই। দেহের প্রতিটি অঙ্গ অবশ হতে থাকে। সেই প্রথম শিকারের পর থেকে এ পথে আর দ্বিতীয় কোন মানুষ নজরে পড়েনি। অন্ধকারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আজিজুল বুঝতে পারে আজ রাতে যদি কোন শিকার ধরা না পড়ে কাল এই প্রান্তর জোড়া ঠাণ্ডা তাদের গিলে খাবে।

অন্ধকারে দৃষ্টি যখন ঝাপসা হয়ে এসেছিল আজিজুল বুঝতে পারল ভগীরথ তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ রগড়ে নিতে আলো জ্বলল যেন। দূরের অন্ধকারে একটা কাঁপা কাঁপা আলো পথ ভেঙে এদিকেই আসছে। দৃষ্টি সরু করে আনতে দুই মানুষ দেখতে পেল লম্ফর কাঁপা কাঁপা আলোয় ধুতির ময়লা ভাঁজ উঠছে নামছে। গৈপথের শুকিয়ে আসা পরিখায় ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোনর সময় পেশীতে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি জড়ো করে ফেলল। অন্ধকার গেলবার আগেই অন্ধকারকে গিলে খাবে দুই মানুষ।

দশ কদমের ভিতর আলোর বৃত্তটা দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। লোকটির পরণে ফতুয়া। পকেট দুটো বেঢপ ফোলা। দুই মানুষ অন্ধকার কাঁপাল। হুই কে যায় রে....কে···। তারপর শূন্য মাঠে শুধু ছুট। লোকটিকে তাড়া করে দুই মানুষ। দুই মানুষকে শূন্য চালের ড্রাম। অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে

ছুটতে দুই মানুষের চোখ হলুদ হলো। দেহে নোখ গজাল। ছুটতে ছুটতে একসময় দুই মানুষের মনে হলো তাদের জিভ বোধ হয় এবার মাটি ছুঁয়ে ফেলবে। দানার শব্দে অন্ধকার গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যেতে ভেড়ির এবড়ো-খেবড়ো বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটি। ভগীরথ তড়িৎ হাত ঢোকাল ফতুয়ার ডান পকেটে। আজিজুল বাঁ পকেটে। এক হাতে উঠে এলো গোটা কতক সিম। আরেক হাতে দুটো কচি মুলো। প্রচণ্ড আক্রোশে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করল লোকটাকে। লোকটাকি জানে একটা দানার দাম কতো। দু'জোড়া বোবা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে লোকটা কেঁদে ফেলল, বিশ্বাস করেন টাকা পয়সা কিচ্ছুটি নেই কো, চুরি করি দিন চলে। মাচ ধরত্তি এয়িচেলাম। আমাদের ওদিকে তো ভেড়ি সব বেচি দেচে তাই এয়িচেলাম ইদিকে ......।

অন্ধকার একসময় আরো কঠিন হয়। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে দুটি প্রাণী। এ কেমন কাল এলো। চুরি ছেনতাই করি বাঁচপো তার জো নেই। দু'দুটো জলজ্যান্ত বন্দুক থাকতেও কোন কাজ হয়না। অন্ধকারে এক অচেনা শুকনো গন্ধ ভাসতে থাকে। শ্মশানের মধ্যে দিয়ে দুটি প্রাণী হাঁটতে হাঁটতে টের পায় শুধু নেবুগোলা নয় এই চরাচর শুকিয়ে আসছে। আলাঘরের অস্পষ্ট অবয়বের সামনে এসে ভগীরথ বলল, এতো তো কষ্ট করলি, আরো একটু পারবি নি।

আজিজুলের চোখ পড়ে ভগীরথের বুকের ওপর। বন্দুকের নলটা বুকের ওপর ঠেকান, আঙুল ঘোড়ার ওপর। আকাশের দিকে চোখ তুলে ভগীরথ বলল, দেক্ একসঙ্গে এই আলাঘরে এয়িচেলাম, একসঙ্গে চলি যাপো, পারবিনি? কি উত্তর দেবে ভেবে পায়না আজিজুল। নিরুত্তর দেখে ভগীরথ আবার বলে, কি পারবিনি, খুব কষ্ট হবে।

কত্তোটা কষ্ট আজিজুল কি বোঝাতে পারবে। সে যে একটু আগে শিকার ধরার সময় তার দানাটা খরচ করে ফেলেছে। নিজের ইচ্ছেতে সে কোথাও যেতে পারবেনা। এমন কি কবরেও নয়। নিরুত্তর দু'জোড়া দৃষ্টি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা পরখ করে এই অন্ধকারে এই দেহের ওপর তাদের দখল কতটুকু।

ক্যাকটাস

শিশির গুহ

সবে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। অঘ্রাণের শুরু। বাতাসের কামড় তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। গাছে গাছে টুকটুকে লাল বকুলের সমারোহ। ঠিক এরকম সময়ে স্বর্ণ বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ পেল।

শিলিগুড়ি থেকে মাইল আঠেরো দূরের চা বাগান। রোমাঞ্চকর নাম, পিয়াপসন্দ টি এস্টেট। শহর থেকে মাইল আটেক পর্য্যন্ত বাসে যাওয়া যায়, কিন্তু তারপরেই যেন বনবাস যাত্রা। এলাকার মানুষের সুবিধে এবং মজুর কুলী-কামীনদের যাতায়াত ত্বরান্বিত করতেই চা বাগান কর্তৃপক্ষ এই রাস্তাটি তৈরী করেছিলেন। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। দীর্ঘ বেয়াল্লিশ বছরে বার পাঁচেক কিছু খোয়ার টুকরো ছাড়া রাস্তার শরীরে আর কিছুই পড়েনি। তাই চা বাগানে কোন বাবু এলে আগাম খবর আসে, আর জীপ পাঠিয়ে নিয়ে আসা হয় অতিথিকে।

এবড়ো-খেবড়ো ধুলো ওড়ানো পথ বাইতে বাইতে রাস্তার গল্প শোনাচ্ছিল মন বাহাদুর। পিয়াপসন্দ টি এস্টেট ড্রাইভারের চাকরি করছে পাঁচ বছর। এখন বয়স সবে চব্বিশ।

সারাটা পথ পাইন, ফার, দেবদারু গাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই মন বাহাদুরের কথা শুনে যাচ্ছিল স্বর্ণ। ছোট্ট একটা ঝোরা পেরোনোর সময় গাড়ির গতি কমে আসতেই সে বললো রোকো রোকো।

জিপ থেকে নেমে কয়েকপা এগিয়ে মস্ত বড় একটা ক্যাকটাসের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল স্বর্ণ। ততক্ষণে মন বাহাদুরও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বর্ণ মোচার মত সাইজের বেগুনি রংয়ের ক্যাকটাসের ফুলটা দেখিয়ে বললো,

—এই গাছটাকে তোলতো বাহাদুর

—এ জংলী ফুল কেয়া হোগা সাব ?

—গাছটাকেই তুলতে চাই, চন্দনের স্ত্রীর জন্য নিয়ে যাবো।

—চন্দন কোন সাহাব ?

—আরে! চন্দন সেনকে চেনোনা? তোমাদের চা বাগানের ছোট ম্যানেজার!

বাহাদুর যত্নে গাছটাকে তুলে স্বর্ণর হাতে দিয়ে বললো—চলিয়ে সাব, অব থোড়া দূর হ্যায়।

কয়েক মিনিট পরেই চা বাগানের শুরু। পথ ক্রমশ; ছোট হয়ে আসছে। খানিকটা এগিয়ে বাংলোর মুখে ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠলো চন্দন—আয়, আয়, তোর জন্য অপেক্ষা করছি।

বাড়ির বাইরে সাজানো চমৎকার লন। চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল চন্দ্রাবলী আর চন্দনের সাথে।

স্বর্ণ বললো—এটা কি তোর সেকেণ্ড ম্যারেজ?

—মানে? চোখ কপালে তুললো চন্দন।

—বিয়ের সময়তো জানতাম কনের নাম মুকুতা

হো-হো করে বাতাস কাঁপানো শব্দে হেসে চন্দন বললো—এই কথা। সে নাম বাতিল করেছি আমি।

চন্দ্রাবলী আধুনিকা হয়েও কেমন যেন জড়ভরত হয়ে থাকে সব সময়।

স্বর্ণ বলে—তোর বৌতো দেখছি একদম চুপচাপ, আমার উপস্থিতি হয়তো তার ভাল লাগছেনা, মিছেমিছি আমাকে ডেকে এনে ওর শান্তি বিঘ্নিত করলি।

চন্দ্রাবলী ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললো—নটি, লজ্জা নারীর ভূষণ জানা নেই?

বিকেলে অনেকের সাথে আলাপ করিয়ে দিল চন্দন। অনেকেই এখানে চাকরি-বাকরি করেন, আবার ব্যাটমিণ্টনের মাঠেও একত্রিত হয় সবাই। স্থানীয় যুবকেরাও আসে এখানে। খেলাধুলো করে, কিন্তু সব সময় কেমন যেন দূরত্ব বজায় রেখে সম্পর্ক রাখে ওরা। রাগী রাগী চেহারা, দাড়ি-গোঁফ নেই। পীত বর্ণের শরীরের নিচে নীল রংয়ের শিরা-উপশিরা স্পষ্ট দেখা যায়।

চন্দন বলে—এখানকার যুবকেরা সব সময় ভাবে আমরা বাইরের লোকেরা ওদের শোষণ করতে এসেছি। আমাদের সাথে কোন কারণে কথা কাটাকাটি হোলেই ওরা অস্ত্র তোলে।

—এই আমার স্বদেশ, আমার মাতৃভূমি। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করিনা। ভালবাসতে পারিনা অথচ—

—কি হোল? তুই যে কাব্য করতে শুরু করলি। আরে বাবা যতই স্বদেশ স্বদেশ করে চেঁচানা কেন, এদেশে কিছুই হবার নয়।

—তুই এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এলি কেন বাপ। আর জায়গা পেলিনে?

—ঘুরে ফিরে চেনা মুখ দেখতে আর ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম।

চন্দ্রাবলী দু'গ্লাস শরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই স্বর্ণ বলে উঠলো—এটা আবার কি জিনিস ম্যাডাম? জবা ফুল বেটে এনেছেন নাকি?

খিলখিল করে হেসে উঠলো চন্দ্রাবলী, বললো—আপনাকে একটা নতুন জিনিষ খাওয়াবো বলে নিয়ে এলাম।

—কি বস্তু এটা?

—এর নাম পাই ফল। অনেকটা জলপাইর মত দেখতে, কিন্তু স্বাদটি আঙুরের। এর রস শরীর ঠাণ্ডা করে।

—তা আমার শরীর গরম এখবর পেলেন কোত্থেকে? চন্দন বলেছে বুঝি?

—না, বলার দরকার হয় না, আপনার বন্ধুর আচরণ দেখেই বুঝেছি আপনাদের দু'জনেরই পাই রস প্রয়োজন।

ওর কথায় হো-হো করে হেসে উঠলো দু'জনেই, স্বর্ণ আর চন্দন।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে চন্দন বললো—এখানে নানা ধরণের চমৎকার ক্যাকট্যাস দেখতে পাওয়া যায়। চল্ আজকে ঐ নয়নাঝোরার দিকটা ঘুরে আসি। পায়ে পায়ে জংলা পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা, সামনে চন্দন, পেছনে স্বর্ণ মাঝখানে চন্দ্রাবলী।

স্বর্ণ অবাক চোখে প্রকৃতির রূপ দেখছিল। দূরে ছোট ছোট পাহাড় আর অসংখ্য ঝোরা। সারাক্ষণ দাপিয়ে-লাফিয়ে জলে ছুটছে। বিচিত্র বর্ণের ক্যাকটাস আর বুনো ফুলের বাহার চারদিকে। একটা ঝোরার কোল ঘেঁসে বসতে গিয়েই হঠাৎ চন্দনের কোমরের দিকে নজর গেল স্বর্ণের। বললো—সেকিরে? কোমরে আবার এটা কেন?

গম্ভীর হয়ে চন্দন উত্তর করলো—এটাই কোম্পানীর ফরমান। যে কোন সময় একটা তীর ছুটে এসে এফোড়-ওফোড় করে দিতে পারে আমাকে। বাইরের লোককে এরা একদম বরদাস্ত করতে পারেনা, ভাবে এখানকার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, চাকুরি-বাকুরিতে ভাগ বসাতে এসেছি আমরা। তাই এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার চাবিকাঠি। একথা শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠলো চন্দ্রাবলী, ফিসফিস করে বললো—না বাপু, তাহলে বেড়িয়ে কাজ নেই, এক্ষুনি ফিরে চল। চন্দন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বাঁকা চোখে একবার চন্দ্রাবলীর দিকে তাকিয়ে বললো—ভয়ে পিছিয়ে যাবার শিক্ষাতো আমার নেই চন্দ্রাবলী, যদি থাকতো তবে কি আর এতদূরের চাকরিটা নিতাম।

থমথম করে উঠলো চন্দ্রাবলীর মুখ। মুহূর্তে পরিবেশটা যেন গম্ভীর হয়ে উঠলো। স্বর্ণ বললো—চল্‌না ফিরেই যাই, আরেকদিন না হয় আসা যাবে।

চন্দ্রাবলী আতঙ্কিত হয়ে খপ্‌ করে স্বর্ণর হাত চেপে ধরে মিনতি করতে লাগলো—চলুন না ফিরে যাই, আমার খুব ভয় করছে।

ফিরতে হোল চন্দনকে। কোমর থেকে রিভলবারটা বের করে শূন্যে নাচাতে নাচাতে একবার বললো—ধুৎশালা, চিরকাল খালি এটাকে বয়েই মরলাম, কাউরো বুকে ঠেকানোর চান্সই পেলাম না। অসংখ্য নাম না জানা পাখির কলতানের ভেতর দিয়েই বাড়ি ফিরলো ওরা। বিছানায় অবহেলায় ফেলে রাখা রিভলবারটি হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে স্বর্ণ বললো—আচ্ছা চন্দন, এখানে কি আদৌ বাইরের লোক তীরবিদ্ধ হয়েছে?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল চন্দনের মুখাবয়ব। স্বর্ণের চোখে চোখ রেখে বললো—ইয়েস্। এখানকার হসপিটালে চাকরি নিয়ে এসেছিল ছেলেটি। খেলাধূলায় চৌখস ছিল সে। ছ'মাসের মাথায় রিংপো ফরেস্টের একটা বুনো গাছের সাথে ওর মাথাটাকে তীর বিঁধে গেঁথে রাখা হয়েছিল।

—কিন্তু কেন? জানতে চাইলো স্বর্ণ।

চন্দন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে উত্তেজিত স্বরে বললো—জানিনা, তবে শুনেছিলাম একটা লোকাল মেয়ের সাথে নাকি কি একটা অ্যাফেয়ার ছিল ওর।

—অপরাধীরা কি ধরা পরেছিল?

স্বর্ণের প্রশ্নে হো-হো করে হেসে উঠলো চন্দন। মাথা দোলাতে দোলাতে বললো—বিদেশীর জন্য বিচার! ফুঃ।

অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম এলোনা স্বর্ণর। জানলার ওপারে ঘন অন্ধকার, কিছু এলোমেলো জোনাকির ছোটাছুটি, অজানা কীট পতঙ্গের ডাক শুনতে শুনতে অনেকগুলো সিগারেট শেষ করলো সে।

ঘুম ভাঙ্গলো চন্দ্রাবলীর ডাকে। হাতে চায়ের কাপ। সকালেই স্নান করেছে সে। কুচি কুচি জলবিন্দু হিরের টুকরো হয়ে জলজল করছে চুলে। মুগ্ধ চোখে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে স্বর্ণ বললো—তুমি চন্দনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শহরে চলে এস চন্দ্রা, এখানে খাঁচার জীবন, তোমাদের এখানে মানায়না।

চোখ ছলছল করে উঠলো চন্দ্রাবলীর। স্বর্ণর হাতে চায়ের কাপটা দিয়েই

এক ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

দুপুরে চা বাগান ঘুরে বিকেলে একা একা বাইরে এল স্বর্ণ। রোদের তেজ কমে আসছে। গাছে গাছে পাখিদের উল্লাস। সে অবাক চোখে দেখে নিচ্ছিল চারপাশ।

এমন সময় লক্ষ্য করলো দুটি তরুণ এগিয়ে আসছে বিপরীত দিক থেকে কাছে আসতেই দেখলো তরতাজা তরুণ দুটির কুতকুতে চোখ আর গায়ের বর্ণ পীত। খুব কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে উগ্রভংগীতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে একজন বললো—তোমাকে তো ক'দিন ধরেই এখানে দেখছি, কি জন্য এসেছ এখানে?

—তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে? রাগত স্বরে উত্তর দিল স্বর্ণ।

ছেলে দুটি মূহুর্তে দুটো ছোরা তুলে ধরতেই লুকিয়ে আনা চন্দনের রিভলবারটি বের করে স্বর্ণ বললো—এটা চেনো? পরিচয় আছে এর সাথে?

চোখের পলকে ছেলেদুটো উল্টোমুখে ছুটতে লাগলো জঙ্গলের দিকে, পেছন পেছন খানিকটা ছুটে গেল স্বর্ণ। তারপর দাঁড়িয়ে হো-হো-করে প্রাণখোলা হাসিতে ভরিয়ে দিল অরণ্য-আকাশ।

মেঘ ভাঙা রোদ

মঞ্জুশ্রী ঘোষ

সকাল হতেই উর্মি দ্রুত হাতে গোছগাছ শুরু করেছিল। এ অসম্ভব। যেখানে তার মন লাগে না প্রাণের সাড়া নেই সেই কয়লাকুঠীর দেশে কেন থাকবে সে? এ দেশে কি আছে?

দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে সে। সেখানে ছিল প্রাণের উচ্ছল স্পন্দন। তাদের জীবনই ছিল আলাদা। আর এখানে?

যদিও ধানবাদের এ অঞ্চলটা পশ এরিয়াই বলা চলে। কিন্তু উর্মির মন টে'কে না একটুও। একপাশে মধ্যবিত্ত পাড়া কুলী ধাওড়া। অফিসারস্ ক্লাবের জীবন উর্মির মন্দ লাগে না। কিন্তু বড় কৃত্রিম মনে হয়. আর অমিতর এ জীবন একটুও পছন্দ নয়। আশ্চর্য্য ছেলে এই অমিত। পাক্কা পাঁচটি বছর জার্মানীতে থেকে মাইনিং ইঞ্জীনিয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে কোলফিল্ডে চাকরী নিয়েছিল।

উর্মির তখন টুকটাক অ্যাফেয়ার্স চলছিল ইউনিভার্সিটীর ছেলেদের সঙ্গে।

এ সময়েই বাবার বন্ধু ডাক্তার জ্যেঠু নিয়ে এল অমিতকে। তাঁর ভাগ্নে। আর প্রথম দৃষ্টিতেই উর্মি মোহিত।

কি ঝকঝকে ব্রাইট ছেলে।। চেহারা কথাবার্ত্তা সব কিছুই যেন চমকে দেয়। একটা টগবগে ওয়েলার ঘোড়ার তুলনা মনে আসে।

মিথ্যে বলবে না। অমিতর দিক হতে খুব একটা সাড়া আসেনি। উর্মির কাছে সেটাও একটা বড় চার্ম মনে হয়েছিল। আর তাই প্রথম পদক্ষেপটা ছিল তারই।

ঝকঝকে ছেলে অমিত। কেন যে জার্মান ছেড়ে এসে অন্য কোথাও না গিয়ে এই ধানবাদেই কাজ নিল এতেও খুব অবাক হয় নি উর্মি। কারণ তখনো সেই প্রথম দিনের মোহমুগ্ধ ভাবের ঘোরটাই কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

বিয়ে হয়ে গেল। কয়লা কুঠীর দেশে এল উর্মি।

অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে খানিকটা দূরে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীটা ছিল আগে কোন সাহেবের। সেটা কিনেই ফেলল অমিত। প্রথম প্রথম ফুলে

ভরা বাগান লম্বা লম্বা অর্জুন গাছ পামট্রি গুলো উর্মির মনেও জায়গা করে নিয়েছিল। অমিত তো তার ফুলের সখ কবিতার শখ আর আদিবাসী কুলি ধাওড়ায় সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশার শখ নিয়েই মেতে উঠল।

আর এই শেষের শখটার জন্যই অফিসার ক্লাবে নানা চর্চা হয় অমিতকে নিয়ে।

উর্মির প্রথম প্রথম খারাপ লাগে নি। তারপরই এল ক্লান্তি। দিনগুলো যেন গর্ভবতী নারীর মত মন্থর, রাতটা জরাগ্রস্ত স্থবির।

গায়ে পড়ে মিশে যেতে পারে না উর্মি বা মধ্যবিত্ত গিন্নীদের পর চর্চার আসরে যোগ দিতেও পারে না। এজন্যই তার কোন সঙ্গী নেই। কাউকে সে আপনার করে নিতে পারে নি, অমিত অবশ্য প্রতিমাসেই তার জন্য অঢেল ম্যাগাজীন কমিকস আর বিভিন্ন রকম বই আনায়। অজস্র সেলাই বোনার সরঞ্জাম। ডিজাইনের বই-এর সম্ভার। কিন্তু সোয়েটার বুনে খুলে, নতুন নতুন ডিজাইন বানাতে বানাতে ক্লান্ত উর্মির মনটাও এখন কয়লাখাদের ভেতরটার মত কালো হয়ে যায়।

অনায়াস দক্ষতায় খনির তলার খবর আনে অমিত অথচ উর্মির মনের খনিতে সে নামতে পারল না।

অমিত নিজেকে অনায়াসে ছড়িয়ে দেয় তার কাজ ছাড়াও চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে। কুলী ধাওড়ার খাটিয়ার ওপর বসে গল্প করতে পারে মুখিয়ার সঙ্গে। হৈ হৈ করে হাসি ঠাট্টা করতে পারে কুলী ধাওড়ার ছেলেদের সঙ্গে বা মউলি রামপিয়ারীর মত কামিনদের সঙ্গে।

মউলি! ঐ আরেকটা কাঁটা উর্মির মনে। বিয়ে হয়েছিল। ছাড়াই হয়ে গেছে মরদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়। এখন ধাওড়ার অনেক জোয়ানই ঘুরছে ওকে সাদী করতে। বিশেষ করে সুখন। কিন্তু মউলি কাকেও পাত্তা দেয় না কিম্বা বলা চলে মউলি সকলকেই খুব বেশি পাত্তা দেয়। সোজা কথায় নাচিয়ে বেড়ায়।

মউলি পাত্তা দেয় না সুখনকে।

তাই সুখন ফুঁসে ফুঁসে বেড়ায়। নেশা করে মার পিট বাঁধায় যার তার সঙ্গে আর একটু বাঁকা চোখে তাকায় অমিতর দিকেও। মউলিকে একটুও সহ্য করতে পারে না উর্মি। দিনে দিনে দু'জনের মনের ফাটলটা বাড়ছেই। কতটুকু পায় উর্মি অমিতকে।

এই জীবনে ক্লান্তি এসে গেছে তার। এই নিয়ে বারবার তীব্র বাদানুবাদ হয়ে গেছে। নাঃ ভুল হল একতরফাই জ্বলে উঠেছে উর্মি। অমিত নিষ্ঠুর উদাসীনতায় উড়িয়ে দেয় সব অভিযোগ। সে যেন বুঝতেই চায় না উর্মির কিসের অভাব।

কালই হয়ে গেছে একচোট। উর্মির নিষ্ঠুর ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের উত্তরে অমিত হঠাৎই বলে উঠল, সবই যদি ফাঁকি বলে মনে হয় তবে আমি তোমায় মুক্তি দিতে রাজী আছি উর্মি।

সমান তেজে উর্মিও বলেছিল, হাঁ৷ আমাদের বিয়েটাই ভুল। একালের মেয়ে হয়ে সে ভুলটা আঁকড়ে রাখতে চাইনা আমি, কালই বাড়ী চলে যাব। ডিভোর্স স্যুট করব, উর্মির মনে হয়েছিল এক লহমায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে অমিতর মুখ। পরক্ষণেই—'তোমার যা খুশী কর'। বলে বেরিয়ে গিয়েছিল সারারাত ফেরেনি।

সকালে মউলি হেসে হেসে জানিয়ে গেছে 'তু কিরে? জামাই দাদাবে তাড়াই দিছিস। ভোর রাতটে মুখিয়ার দাওয়ায় পড়ে রইলেক'। অপমানে রাগে জ্বলে উঠেছিল উর্মি। দ্রুতহাতে নিজের জিনিষ গোছাতে শুরু করেছিল। আর এক দিনও এ বাড়ীতে নয়।

ভোঁ—ও—ও—ও—

হঠাৎই তীব্র সাইরেন বেজে ওঠে। থমকে যায় উর্মি। কোলিয়ারী এলাকার এ সঙ্কেত সবাই চেনে।

সর্বনাশের সঙ্কেত এ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে সকলে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটছে কোলিয়ারীর দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে উর্মি। কানে আসে ধ্বস নেমেছে খাদানে। অসহায়ের মত বসে থাকে উর্মি।

তার প্রতীক্ষা বৃথাই হয়। না আসে অমিত, না পায় তার কোন খবর।

একটা রাত আতঙ্কে আশঙ্কায় কেটে যায়। সকালে শোনা যায় চরম সর্বনাশই ঘটতে যাচ্ছে জলের স্রোতে ডুবে যাচ্ছে কোলিয়ারী। নীচে অন্ততঃ একশজন কর্মী আটকে আছে।

সব ভুলে উর্মিও ছুটে চলে। তার দু'চোখ ব্যাকুল হয়ে খুঁজে ফেরে অমিতকে।

নাঃ নেই। কোথায় গেল অমিত। এই বিরাট কোলিয়ারী এলাকায়

সব জায়গায় ব্যারিকেড। পরিত্যক্ত বিভিন্ন খনিমুখ দিয়ে কর্মীদের বার করে আনার বৃথা চেষ্টা চলছে।

কি করবে ভেবে পায়না উর্মি।

এক সময় চোখে পড়ে মউলিও পাগলের মত কাকে খুঁজছে।

কানে আসে পথ একটা পাওয়া গেছে। মাইনিং ইঞ্জীনিয়ার অমিত চৌধুরী কূপ খুঁড়ে ক্যাপস্যুল নামিয়ে তুলে আনার ব্যবস্থা করেছেন শ্রমিকদের। উর্মি বুক ফাটা চিৎকার করে ওঠে, অমিত যেওনা তুমি, নেব না।'

কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না। শুধু প্রাণপনে কামড়ে ধরে হাতের তালু। পাশেই বুক চাপড়ে মউলি কাঁদছে, 'সুখনরে'। লাজ লজ্জা ভুলে মউলি আর উর্মি এক হয়ে যায়।

কতক্ষণ কেটেছিল? একটা পুরো দিন রাত ভোর সকাল—জ্ঞান ছিল না উর্মির তার হাত দিয়ে রক্ত ঝরে কাপড় ভেজে, চোখে জল নেই। ধোঁয়া, যেন গলগলে নরকের ধোঁয়া বেরোচ্ছে খনিমুখ থেকে। যে খনিতে নেমেছে অমিত রেস্কিউ পার্টির হেড হিসেবে নিজে।

চারদিকে কিসব কথা হচ্ছে, কারা যেন অমিতর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

মউলি লোকলজ্জা ভুলে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সুখনের বুকে।

মাত্র দশজন ছাড়া আর সকলেই উঠেছে। কান্না হাসি কথা সব ছাপিয়ে উর্মির কানে আসে একটা শান্ত স্বর। কে যেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'আপনারা কেউ দয়া করে আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যান, ওর শক লেগেছে। ফার্স্ট এইড দরকার।'

জ্ঞান হয়ে উর্মি দেখে সে নিজের ঘরেই শুয়ে আছে। মউলি সুখন আরো কত লোক সকলেই তাকে ঘিরে আছে মাথার কাছে অমিত। কথা না বলে অমিতর হাতটা টেনে নেয়। অমিত চুপি চুপি বলে 'তুমি বাড়ী যাবে না।'

তার থেকেও চুপিচুপি উর্মি বলে 'বাড়ীতেই তো আছি।' অমিতর হাতটা চেপে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে উর্মি।

জল পড়ে পাতা নড়ে

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

যেরকম ধোঁয়ার সঙ্গে মানায় চৈত্র সেলের ছাপা শাড়ী, যেরকম শাড়ীর সঙ্গে মানায় সন্ধ্যাবেলা চুল আঁচড়ানোর পর লাল চিরুণীতে লুজ নারকোল তেলের ঘ্রাণ, তার সাথে রেপসীডের তেলে ভাজার গন্ধমাখা যেরকম বাতাস মানায়, সে বাতাসে চিরুণীতে আটকে থাকা চুল দু' আঙুলে টেনে থুথু ছিটিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দেয় মাধুরী। তারপর জানালার কাছটাতে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা বাঁকিয়ে হাত দুটো পিছনের চুলে রেখে ঠোঁটদুটো অল্প একটু ফাঁক করে দুটো দাঁতে আলগোছে আটকে রাখে ফিতে।

রোয়াকে এসে বসেছে সাট্টা পার্টি। সন্ধ্যে হলেই নম্বর বের হবে। ফ্ল্যাট বাড়ীর লোকেরা এদের গুণ্ডা বলে। রবিদা কোথায়, রবি? আসেনি এখনো?

—আজ মাইরী স্রেফ তোর বাওলিতে দুগ্‌গি সাত খেলেছি, না লাগলে ভরে দেব।

—পদ্মা টকীজে দি বডি আসছে, টিকিট গুদাম করতে হবে। কিছু ধার দিস।

এইসব কথার ভিতরে রবিদাকে খুঁজছে মাধুরী। রবিদা নেই এখন।

একটু আগে মাধুরী ওর মাসতুতো বোন সুধাকে একটা চিঠি লিখছিল। 'মাই ডিয়ার সুধা' লেখার পর কি লিখবে ভেবে না পেয়ে উনুনে আঁচ দিয়ে দিয়েছিল। উনুন থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা ধোঁয়া অন্ধের পয়সা খোঁজা হাতের তালুর মত ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে রান্নাঘরের বাইরে আসে, ঘরে এসে দেয়াল বেয়ে মা কালীর ছবি ও জামাকাপড়ের দড়ি বেয়ে কড়িকাঠের গায়ে ছেঁচড়াতে থাকে।

কয়েক বছর আগেও এরকম তালগোল পাকানো ধোঁয়া দেখলে অবাক হত মাধুরী। কাঁচ কারখানার চিমনী থেকে উগরে ওঠা ধোঁয়ার রাশ দেখে ছোটবেলায় পড়া বোতল দৈত্যের কথা মনে পড়ত। ছোটবেলায় অনেক কিছুর মধ্যেই অনেক কিছু দেখতে পেত মাধুরী। পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে সত্যি সত্যি দেখতে পেত বসে থাকা খরগোশ, মেঘের মধ্যে ছুটন্ত হরিণ, ভারত

বর্ষের ম্যাপ, এমন কি অমিতাভ বচ্চনও।

এখন মাধুরীর সেই বয়স নেই আর। ব্রণ খুঁটে কালচে ছোপ। হোমিও-প্যাথ ডাক্তার যখন বলেছিল, ইয়ে রেগুলার হয়? মাধুরী মাথা নেড়েছিল। কবে থেকে? মাধুরী সেই দিনই বুঝেছিল ওর অনেক বয়েস হয়ে যাচ্ছে।

কাঠের বাক্সো মাথায় করে যে মাদ্রাজী ম্যাজিকওলা দু' হাতে চারটে সাদা রংএর বল নাচাতে নাচাতে যেত,—আর তার জোকার, যার মাথায় ঝাংলা ঝাংলা চুল, সামনের দাঁতকটা নেই, যাকে দেখবার জন্য দুপুর থেকে বসে থাকতো মাধুরী, সেই ম্যাজিকওলাটা শুধুমাত্র একজন লোকের মত কখন যে চলে যায়…। ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল মাধুরী শৈশবের প্রথম দাঁতটা পড়ে যাবার পর। তারপর আবার পড়ল, উঠল, কতবার, আর কাঁদেনি। এমনি করেই সব সয়ে যায়। পরীক্ষায় ফেল করলে আর ততটা দুঃখ হয়না। অম্বলের ব্যাথায় আর ততটা কষ্ট নেই। বেপাড়ার ছেলেরা যখন ওকে ফ্যাঁসা মাছ কিম্বা নিমাই বলে টিটকিরি দেয়, ওর দুঃখ হয়না।

চিঠিটার কাছে গেল একবার মাধুরী। কি একটা কথা মনে পড়েছে। মাধুরী লিখল, 'তোদের ওখান থেকে ফিরে কলকাতায় এসে আবার আগের মত রোগা হয়ে গেছি।'

এইটুকু লিখে থামল মাধুরী। আয়নার সামনে গেল। শেষ বিকেলের তেরচা আলো মুখে এসে পড়েছে। গালটা একটু ভাঙা বলে মুখের উপর দু'টুকরো ছোট্ট অন্ধকার গুটিশুটি মেরে বসে আছে। গালটা একটু ফুলিয়ে ভাবল যদি এরকম ভরা-ভরা হত গালটা আর ওমনি পাউডার কৌটো, ঝোলানো বাল্ব আর কাঁচের গেলাস সমস্বরে বলল—চ-অং

মাধুরীর মাসতুতো বোন সুধা। ঠিক আপন মাসী নয় সুধার মা, মায়ের খুড়তুতো বোন, তাতে কী, খুব যেতে বলে। সুধার বাবা ম্যাসেঞ্জোর-এ ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টের ইঞ্জীনিয়ার। মাধুরী ম্যাসেঞ্জোরে এক মাস কাটিয়ে কিছুদিন আগে ফিরেছে। সুধা শান্তিনিকেতনে পড়ে, সুধা ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিল, আর মাধুরী গিয়েছিল শরীর সারাতে। সুধার ছুটি শেষ হবার আগেই মাধুরী চলে এসেছিল। ছোটমাসী বলেছিল এখন যাবি কিরে? সুধার ছুটি শেষ হোক, তারপর যাস।

'আমার বুঝি পড়াশুনো নেই'—মাধুরী বলেছিল।

'ওঃ তোর পড়াশুনো তো, তা এখানে একটু আধটু করলেই হবে।'

মাধুরীর মনে হ'ল 'ওর পরীক্ষার যেন কোন গুরুত্বই নেই—যেন লুডো খেলা—যেন ছাগলকে ঘাস খাওয়ানো যেন....

হোকনা প্রাইভেটের মাধ্যমিক, তবুতো পরীক্ষা, আচ্ছা পরীক্ষার সময় কি কেউ ভাব নিয়ে যাবে ওর জন্য ? সন্দেশ। রবিদা। যদি বাবাও যায় ?

মাধুরী একদম থাকতে চায়নি ম্যাসেঞ্জোরে, ও কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলনা। সকাল বেলা দুটো দেবদারু গাছের মাঝখান দিয়ে যখন সূর্য্যের আলো উঁচু টিলার উপর ছোটমাসীর বাংলো বাড়ীর পিছনের বারান্দায় সাদা মেঝের উপর কচি শিশুর মত হাত পা নেড়ে খেলতো, বেতের চেয়ারে বসে ময়ূরাক্ষীর জলে পানকৌড়িদের ডুবোডুবি দেখবার সময় যখন ছোটমাসী পটে করে চা নিয়ে আসতো, তখন মাধুরীর মনে হ'ত ঐ চা টা তৈরী করা উচিত ছিল মাধুরীর। সুধা যখন ফুলফুল কাপে চা ঢেলে চামচ দিয়ে টুং টাং চিনি নাড়তো, তখন মাধুরীর মনে হত সে এরকম ছন্দের মত শব্দ করে চিনি মেশাতে পারেনা। মাধুরীর মনে হত— গোলাপী রং-এর মিষ্টি গন্ধের সাবানটা প্রতিদিন ওর শরীরে ঘষে ফুরিয়ে দেয়। উচিত নয়, এ সাবান এ শরীরের জন্য নয়। লুডো খেলা হ'লে মাধুরীর মনে হ'ত ওরই হেরে যাওয়া উচিত। ফ্রীজ থেকে বার করা চাকা চাকা বরফ ভাসানো অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাওয়া তার সাজেনা। তাই মাঝে মাঝে মিথ্যে বলত মাধুরী। বলতো আজ গলা ব্যাথা করছে, শরবত খাবনা। সুধা ট্রিরিওতে গান চালিয়ে দিত। তখন ঘুমোতে ইচ্ছে করলেও মাধুরী বলতে পারত না এবার বন্ধ কর সুধা। সাদা ধবধবে চাদরের নরম বিছানায় শুয়ে মাধুরীর কেবলই মনে হত ও দ্রুত নোংরা করে দিচ্ছে চাদরটা।

অরূপদা বাঁধের ইঞ্জীনিয়ার। অরূপদার সঙ্গে সুধার বিয়ে হবে। সুধা হয়তো জানালার শিকের সামনে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে দেখছে হাওয়া কেমন করে টেনে হিচড়ে হলুদপাতার অবসাদকে গাছের গায়ের থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উড়িয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে ময়ূরাক্ষীর জলে। অরূপদা আঙুলটা রেলের সিগন্যালের মত সুধার দিকে উঁচিয়ে বলত, 'জানালার শিকে তুমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে আছো নারী।'

আর রবিদা ? রবির সঙ্গে যদি কোনদিন পাহাড়ে বেড়াতে যায়, মাধুরী জানে রবি সিগারেটে ঢুকিয়ে গাঁজা খাবে। টেপ বাজিয়ে হিন্দি গান শুনবে আর হয়তে কোলে মাথা দিয়ে বলবে—'দিল দিয়া জান লিয়া-তে ঠিক এরকম

একটা সীন ছিল, এরকম একটা পাহাড় ছিল, আর গাছের তলায় মাইরী, মিঠুন না, সারিকাকে নিয়ে দেখ, ঠিক এমনি করে....

মাধুরী তখন নিশ্চই বলত—ছাড়ো অসভ্য। রবি বলত—হার্গিস ছাড়বোনা। —ছাড় ছাড়। রবির হাসি অরূপদার মতই নয়। যখন সুধার সঙ্গে অরূপদা হাসে, তখন কুঁচো কাগজ বাতাসে ছড়ায়।

বাতাস অরূপের পাঞ্জাবী যে ভাবে ওড়ায়, কিম্বা সুধার আঁচলে যে ভাবে খেলা করে, মাধুরীর মনে হ'ত বাতাস ওর সাথে কিছুতেই সে ভাবে খেলবেনা অরূপের বন্ধুদের সাথে সেবার সুধা হাতিমুণ্ডি পাহাড়ে গেল, মাধুরীকেও যেতে বলেছিল সুধা, কিন্তু তখন মাধুরীর মনে হয়েছিল—ওতো একটা বোকা সোকা মেয়ে, শচীন সরকার লেনএ থাকে, এইটে ফেল করে, নাইনে ফেল করে, পাড়ার রবিদা ওর প্রেমিক, যাকে সবাই গুণ্ডা বলে জানে। এ তখন কী করবে যখন ওরা—এইসব কথা নিয়ে আলোচনা করবে, তর্ক করবে, যেমন—অরূপ সুধাকে বলছিল—আচ্ছা, ঐ যে সিজিন্যাল পাখিরা মানস সরোবর বা আরও দূর সাইবেরিয়া থেকে ঠিক ঠিক পথ চিনে চলে আসে, কে ওদের পথ চেনায়। তোমার কি মনে হয় সবই হরমোনাল ফাংশন নাকি জিও-ম্যাগনেটিজম, নাকি কোনো সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার, তখন কি করবে মাধুরী? যখন ওরু পাশে বসা সুধা এসব নিয়ে ভাববে, কানের কাছে ঝুলে থাকা চুল আঙুলে মোড়াতে মোড়াতে উত্তর দেবে। মাধুরী কি ততক্ষণ ডিমের খোসা ছাড়িয়েই যাবে? তাই মাধুরী যায়নি পিকনিকে। মিথ্যে মিথ্যে শরীর খারাপের গল্প বানিয়েছিল। ইংরিজি কাগজের দিকে চোখ রেখে যদি সুধা বলতো, ইশ্‌ কি কেলেঙ্কারী, বলেই কাগজের কালো অক্ষর দেখাতো, মাধুরী বুঝি তখন রান্নার লোককে বলতো—ইশ্‌ মাছের ঝোলের আলু বুঝি এত বড় বড় করে কাটে?

এইসব কারণেই পাহাড়, ময়ূরাক্ষী আর মহুয়া বন ছেড়ে শচীন সরকার লেনের খুপরীতে ফিরে এসেছে ফের, ফের নোংরা জল মাড়িয়ে মাড়িয়ে। সন্ধ্যায় ঘুগনীওলা টিনের বাক্স নিয়ে ঠিক হাজির হয়ে গেছে সামনের রোয়াকে। লণ্ড্রীর পিছনেই চুন্নুর দোকান। রানুদি ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে গালে পাউডার লাগিয়ে কালো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছে। ভট্টাচার্য্যদের নিত্তি পুজোর ঘণ্টা বাজছে, মনখারাপের বাতাসে দুঃখর শালপাতা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নর্দমার দিকে যায়। বাবা-মা এখনো এল না।

বাবা-আর মা গেছে একটা ফ্যান কিনতে। ওপরের কড়ি কাঠের ঐ থাকটায় এখন যেখানে কালো রং-এর ঝুল হয়ে আছে, সেখানে একটা সাদা ধবধবে ফ্যান ঘুরবে। পেঁচিয়ে ওঠা ধোঁয়ার শরীরকে মেরে, ভেঙে, ছিন্নভিন্ন করে দেবে ফ্যানের হাওয়া। কতদিন ধরে একটা ফ্যান কেনার ইচ্ছে মাধুর মায়ের। ক' বছর ধরে ভাড়ায় ফ্যান আসে তিন মাসের জন্য। বর্ষা নামলেই বিদায়। ভাড়াই কি কম কিছু?

পচা ভাদ্রমাসে যখন ফাটা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে হাঁসফাঁস করে মাধুর মা, আর জানালা দিয়ে দেখা যায় সব বাড়ীগুলোর ঘরে ফ্যান ঘুরছে।

মা বলতো—নিজে তো দিব্বি অফিসে ফ্যানে বাতাস খাও।

বাবা বলতো—সামনের বছর ভাতের ফ্যান খেয়েও ঘরের ফ্যান আনবো।

মা বলতো - রাগটা রাখো। অভাব সবারই আছে। তোমাদের রাধারমণও ফ্যানের বাতাসে ঘুমায়। ওর তো সেদিনের চাকরী।

বাবা বলেছিল—ওর কথা রাখ। ওতো সাহেবের সঙ্গে যে দেখা করতে চায় তার কাছে আটআনা একটাকা চায়। ভিকিরি। আমিতো বড় সাহেবের ডিউটি করেছি, এরকম ছেঁচড়ামি করিনি।

গনগন করে উনুন থেকে আগুন বেরুচ্ছে। ভালই আঁচ উঠেছে। মাধুরী ডাল চাপিয়ে দিল। আবার চিঠিটার কাছে গেল মাধুরী। কী যে লিখবে ও। আজ দুটো আনন্দের খবর আছে। যেমন আজ ওদের ঘরে একটা ফ্যান আসছে। যদিও সুধার কাছে এটা কোনো খবরই নয়। হাসির ব্যাপার। বরং আমাদের বেড়ালের দুটো বাচ্চা হয়েছে—সুধার কাছে এটা একটা দারুণ খবর। আর একটা খবর—রবি একটা ইন্টারভিউ পেয়েছে। আজই। এটাও কি সুধাকে জানানোর মত কিছু।

কী যে লিখবে চিঠিতে, কিছু ভেবে পায়না মাধু। রবি কখন আসবে? ইন্টারভিউ কি এখনো শেষ হয়নি? ইন্টারভিউতে কি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে? কঠিন কঠিন? রবি কি পেরেছে? মা কালী, যেন রবির চাকরীটা হয়ে যায়, জিভে লেগে থাকা টিকটিকি সমেত মা কালীর ছবিটাকে প্রণাম করে মাধুরী। মা কালীর কাঁচে নিজের ছায়া দেখতে পায় মাধুরী। দেখে বেশ ভাল লাগে। এবার দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়ালো। চোখের তলার কালি যেন অনেক কম মনে হচ্ছে। মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিজের হাতের কব্জীর বেড় মাপল মাধুরী।

আহা, রবির যদি চাকরীটা হয়, তবে ও আর সাট্টা খেলবেনা। রবিদা ওকে নিয়ে যাবে ভিক্টোরিয়ার মাঠে, কাপের আইসক্রীম খাবে। রবিদা আর সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করবে না। অফিস থেকে বাড়ী এসে সে খেতে খেতে গল্প করবে। মাধুরী সেন্ট মাখবে গায়ে, উপর থেকে ফ্যান ঘুরবে বন বন বন। সেন্টের সুবাস ছড়াবে বাতাসে, পর্দা উড়বে জানালায়। মাধুরীর কল্পনায় চারের তিন শচীন সরকার লেনের ক্ষয়া জানালায় ফুল ফুল পর্দা দোল খায়। দোল-দোল-দুলনী—হাওয়ায় পর্দা ওড়ে. আঁচল ওড়ে। হাওয়ায় সূর্য্যমুখী দুললে ভাল, জুঁইলতা দুললে ভাল, জানলা জড়িয়ে লতা আসে, ফুলদানী আসে, ফুলে ভরে যায় ফুলদানী। ছু-মন্তর-ছু ঘরের দেয়াল আবছা রংএর। বিছানায় সাদা চাদর, রবি এল অফিস থেকে। গলায় অজগরের মত টাই। টাই খুলে দিল মাধুরী। ঝকমকে মেঝের ওপর মাধুর পা ফেলা সুধার মতই মানিয়ে যাচ্ছে। মাধুরী আবার আয়নায় মুখ দেখে। ঠোঁট দুটো টিপে সুন্দর ভঙ্গী করে। গালে পাউডার বোলায়, ঠোঁটে লিপষ্টিক মাখে, গায়ের আঁচলটা ফেলে দিয়ে একবার শরীরটা দেখে। কী যে ভূতে পেল ওকে, ও ট্রাংকটা টেনে নেয় চৌকির তলা থেকে, ওর একমাত্র গার্ডেন শাড়ীটা পরে, ঘোমটা উঠিয়ে দেয়, আর ওমনি জলের কলসীটা, ভাতের হাঁড়িটা, আলনাটা, চেয়ারটা একসঙ্গে উলু দিয়ে ওঠে। দরজা বন্ধ করে ঐ ভাবে থাকে কিছুক্ষণ; ঘামে। এ সময় মনে হয় হারটা পরলে কেমন হয়?—যে হারটা পাড়ার বিষ্ণুদা বিক্রী করে গেছে কিছুদিন আগে। বিষ্ণুদা বলেছিল এটা ওর বৌ-এর হার। টাকা পয়সার খুব দরকার তাই অনেক কম দরে বিক্রী করে দিয়েছিল। বাবা ওটা মাধুরীর জন্য কিনে রেখেছিল। কিন্তু মাধুরী জানে বাবাও জানে ওটা চোরাই মাল। রবিও বলেছিল ওটা তোল্লাই।

মাধুরী ট্রাংকটা খোলে। হারটা একবার পরেই খুলে ফেলবে, শুধু দেখবে—এই শাড়ীতে, এই ঘোমটায়, ঐ হারে ওকে কেমন দেখায়।

হারটা কোথায়?—নেই। হার নেই। অথচ পরশু ছিল। সোয়েটারের তলায় ছিল। সমস্ত জামা কাপড় ঘেঁটে ফেলে মাধুরী। ট্রাংক তোলপাড় হয়ে যায়। নেই। সোয়েটার, শাড়ী, পুঁতির ব্যাগ, ছোটবেলার গরম জামা, ছবির এ্যালবাম, মা কামাখ্যার ছবি, বাবার বিয়ের পোকা খাওয়া তবু যত্নে রাখা গরদ, মৃত ঠাকুমার ক্যাকাশে নামাবলী সব নামিয়ে ফেলে। ট্রাংক খালি হয়ে গেলে তলায় পাতা পুরোন খবর কাগজে 'দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ

থেকে দারিদ্র্য দূর করব'। ইন্দিরা গান্ধীর ছবি, আরশোলার ডিমের খোলশ, ছোট হয়ে যাওয়া সাদা দুটো ন্যাপথলিনের গুলি। হারটা নেই। নেই। অথচ পরশু দিনও ছিল। কে নেবে হারটা? কেউতো আসেনি, কেবলমাত্র রবি গতকাল দুপুরে এসেছিল। তখন বৃষ্টি এল। রবিকে ঘরে বসিয়ে মাধুরী ছাদ থেকে কাপড় আনতে গিয়েছিল। মা দাঁত তুলতে গিয়েছিল হাসপাতালে। না, রবি ছাড়া বাইরের কেউ আসেনি। তাহলে?

জ্বালা করতে থাকে; ঝিম ঝিম ঝিম। ঘাম। কাপড় অবিন্যস্ত, চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। বাবুই পাখির পরিত্যক্ত বাসার মত ঝুলছে ওর খোঁপা, সারা ঘরে ছেটানো তৈজস। যেন এইমাত্র ওকে কেউ ধর্ষণ করে গেছে।

দরজা ধাক্কানোর শব্দ। বাবা-মা এল হয়তো, পাখা নিয়ে এসেছে। ওর তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা খোলার কথা। কথা ছিল দমকা হাওয়ার উচ্ছ্বাসে বলা—কই, দেখিতো পাখাটা, কিন্তু দুপুরের দুখী শালপাতার ছেঁচড়ানোর মত দরজার খিলের দিকে এগিয়ে যায়। দরজা খুলেই দেখে রবি।

'কতক্ষণ ধরে ধাক্কাচ্ছি, ঘুমুচ্ছিলে? জানো, ইন্টারভিউটা শালা পুরো ভিত্‌ভাল হয়ে ভোগে গেল। যত সব আলফাল কোশ্চেন? বলে কোন মেঘে বৃষ্টি হয়। এত সেজেছো কেন? ঘরটর এরকম কেন? মাধুরী নিশ্চুপ।'

'এই, জামাটা কি রকম ফিট করেছে বল না, ইন্টারভিউর জন্য সাদা জামাটা নতুন বানিয়েছি।'

ট্রাংকের কালো ঢাকনাটা বন্ধ করল মাধুরী, ঢাকনাটার উপর সজোরে কিল মারল। ঝং শব্দের ওপর চীৎকারে বলল—যাও। এক্ষুনি যাও। মাধুরীর গাল বেয়ে দুটো নদী।

রবি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার পিছনে হাত বোলায়। মুখ থেকে যা-ব্বাপ জাতীয় কিছু একটা শব্দ করে চলে যায়।

একটু পরেই দরজায় হাওয়াই চটি বুট। হরেন কাকা ও পিছনে পুলিশ। হরেন কাকা পাড়ার মাতব্বর। হরেন কাকা বল্লেন, 'এঁরা আমার কাছে এলেন, তোমাদের ঘর দেখতে চায়। কি সব বলছে। নিরঞ্জন কোথায়?'

'বাবা-মা তো ফ্যান কিনতে গেছে।'

'আপনার বাবা মা থানায় আছে। চোরাই মাল বিক্রী করে আপনার বাবার। ঘরটা সার্চ করব। আরও থাকতে পারে।'

পুলিশ। সুতরাং আশে পাশের মানুষ জড়ো হ'ল। একজন লাল লুঙ্গি ও ভুঁড়ির উপর গোটানো গেঞ্জী, ঘরে ঢুকে বল্ল 'আমি এ বাড়ীর ল্যাণ্ড লর্ড কেসটা কি বলুনতো মেজবাবু?'

'মেজবাবু বল্লেন' সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। কিছুদিন আগে নেবু তলার লোকাল এম. এল. এ. র পিসতুতো বোনের একগাছি হার ছিনতাই হয়েছিল, গোল্ড। সোনার হার। ডায়রী হবার থেকেই সোনারূপোর দোকানগুলোর ওয়াচ রাখা হচ্ছিল। আজ সকালে আপনার নিরঞ্জনবাবু হারটা বিক্রী করে দেয়। বিক্রীর সময় বলল এটা ওর স্ত্রীর হার। বিকেলে স্ত্রীকে নিয়ে বের হন। ওর স্ত্রী বলছে তিনি কোন হার বিক্রীর জন্য দেন নি।'

'না-না উনি খুব নিরীহ তিনি এসব কি করে'........ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলছিল। পুলিশের লোক গলা চরিয়ে বল্ল—কারোর আউট সাইড দেখে ইনসাইড বোঝা যায় না। আমার মনে হচ্ছে এরা পুরোন পাপী। ঘর লণ্ডভণ্ড, ট্রাংক বাইরে। সামবডি এসেছিল, এবং সাম থিং টেকেন এওয়ে, খবর হয়ে গেছে। বুঝলেন না? মাধুর দিকে এগিয়ে এল পুলিশ। এরকম বিশ্রী সেজেছেন কেন? ঘরে অন্য কিছু হয় নাকি?

ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রবি।

—ভদ্রভাবে কথা বলুন স্যার।

—আরে রবি যে, তোমাকেও যে দরকার; ভালই হ'ল। থানায় চল। থানায় গিয়ে ভদ্রতা শিখিয়ো। বড্ড বেড়েছ তোমরা। বিষ্ণু কোথায়?

রবি বলে—বিষ্ণুর খবর আপনি জানবেন। ওতো আপনাদের রেগুলার গুঁড়ো দিয়ে যাচ্ছে। ওর খবর আমি রাখিনা। ওর সঙ্গে আমার খিচাইন।

একটা লাঠির ডগা দিয়ে কুঁদো মারল একজন কনষ্টেবল।

ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলল—বাড়ীতে চুরি হ'লে শালা এনকোয়ারীই হয় না, বিষ্ণুটিষ্ণুর নামে ডায়রী নেয় না পুলিশ, আজ এম. এল. এ.র কেস বলে বিষ্ণুর খোঁজ পড়েছে।

পুলিশের লোক মাধুরীর দিকে তাকায়। নম্র গলায় বলে—তবে মা একটু উঠুন দেখি, থানায় যেতে হবে। আপনার ঘর লণ্ডভণ্ড দেখলুম কিনা, ট্রাংকটা বাইরে বার করা, কেন এরকম হ'ল একটু খবর নেবো। আর রবি, কাল সকালে থানায় এসে একবার দেখা কোরো।

সব কিছু শীতল শীতল লাগে। মা কালীর জিভটা ছবি থেকে বের হয়ে

মাধুরীর গায়ে এসে লাগে। পৃথিবীটা পুলিশের পোষাকের মত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে। চোখের সামনে ঝরতে থাকে একটা একটা হলুদ হলুদ পাতা। চৌকির পায়ায় ইঁটে মাথা রেখে শুতে চায় মাধুরী। ইলাটিং বিলাটিং সইলো. কিসের খবর আইল, রাজা একটি....

রবি বলে—কাল কেন, এক্ষুনি যাচ্ছি থানায়। ওর সঙ্গেই যাচ্ছি। ইঁটের কোনায় লেগে একটু কেটে যাওয়া মাধুরীর মাথায় হাত রেখে রবি বলে, 'ফালতু ভয় পাচ্ছ মাধু, আমিতো আছি।'

আর অমনি খুলে গেল ময়ূরাক্ষী ড্যামের সমস্ত লক গেট। জলের স্ফূর্তি। জলের প্রচণ্ড উল্লাস। মাধুরী আস্তে আস্তে উঠে বসে। জলের প্রচণ্ড হল্লা। জল নাচে। আমি আছি। আমি আছি।

মাধুরী উঠে বসে। দাঁড়ায়। হাতের চেটোয় মুছে নেয় চোখ। বলে চলুন।

সুধার চিঠিটা শেষ করার মত বাক্য পেয়ে গেছে মাধুরী।

নিজের খোঁজে

জলি সরকার

'আঃ ছাড়ো তো'

শৈবালের বাহুবন্ধন শিথিল হ'য়ে গেলো। রমা পাশ ফিরে শুলো। এর পরেও প্রায় ঘণ্টাদুয়েক কেটে যায়। দু'জনের কারো চোখেই ঘুম নেই।

শৈবাল চিত হ'য়ে শুয়ে। দুটো হাত মাথার তলায় রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঝুলন্ত ফ্যানের দিকে। রাস্তার ল্যাম্পপোষ্ট থেকে আসা আলোয় ঘরটা কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে। একটা লাল রঙ শুধু দেখা যাচ্ছে। ওটা রমাকে বিবাহ বার্ষিকীতে দিয়েছিল শৈবাল। রমারই পছন্দে কেনা। ক'দিন আগে গেল ওদের বিবাহবার্ষিকী? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই শুক্রবারের আগের শুক্রবার। ছাব্বিশে এপ্রিল......দু-দু বছর পূর্ণ হল। দু'বছর আগে ঐ দিনে লাল টুকটুকে বেনারসী পরে রমাকে কি সুন্দরই না লাগছিল। কেন, এই দু'বছর পরে শৈবালের কিনে দেওয়া লাল শাড়িটাতেও রমাকে অপূর্ব লাগছিল।

আচ্ছা, প্রথম যেদিন রমাকে দেখেছিল সেদিন হ্যাঁ মনে প'ড়েছে, সেই দেওঘর, সেই ত্রিকূট পাহাড়। দেওঘরে শৈবালের মামার বাড়ি। বড় মামার বড় ছেলে রিন্টুর সঙ্গে শৈবালের খুব ভাব ছিল। ওখানে যাওরার নাম শুনলেই শৈবাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। আর মেজমামার মেয়ে মাস্তর বন্ধু ছিল শৈবালের বোন রিমা আর পাশের বাড়ির মেয়ে রমার সঙ্গে ওদের ছিল গলায় গলায় ভাব।

শৈবালের মামার বাড়ীটা ছিল খুব বড়ো। আর তাতে লোকজনও ছিল অনেক। চার মামা-মামী, তাদের ছেলেমেয়ে. দিদা—সবাইকে নিয়ে যেন এক উৎসব লেগে থাকত সর্বক্ষণ।

এক সন্ধ্যেবেলা বোনেরা লুকোচুরি খেলছিল। হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। শৈবালের ইচ্ছে হল ছাদে উঠে চারিদিকটা দেখতে। দুদ্দার ক'রে ওরা দৌড়াচ্ছে। হঠাৎই বাঁকটা ঘুরতেই শৈবালের ঠোঁটে কি একটা

লাগল। ঠোঁটটা চেটে নিল, নোনতা নোনতা লাগল। একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল শৈবাল। বোনেদের কেউ।

—কে? মান্তু?

—না, আমি রমা।

বলেই তরতর ক'রে নেমে গেল। শৈবাল কেন জানি ছাদে ওঠার বদলে ওখানেই নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। কানে এল—

—কি রে, এই সন্ধ্যেবেলায় মাথায় জল দিচ্ছিস কেন?

—না কাকীমা, অন্ধকারে কপালটা ঠুকে গেল।

রমার কপালে যত না লেগেছে, তার চেয়ে বেশি লেগেছে মনে। তখন থেকেই রমার মনে গুনগুন ক'রে উঠছিল—'আমার পরাণ যাহা চায়'। ওই ঘটনার দু'দিন পরেই ওরা কোলকাতায় চলে যায়। তারপরই শুরু হয় রমার ছটফটানি। এরপর চারমাস কেটে গেল। পুজোর ছুটিতে ওরা আসে দেওঘরে। সেই সময়ে রমা আরো বিপদে পড়ল। কারণ ও তো জানেই না শৈবালের মনের কথা. রমা তো শুধু নিজের মনেই কল্পনা ক'রেছে। মান্তুর কাছেও যেতে পারছে না ভয়ে লজ্জায়। অবশেষে লক্ষ্মীপুজোর দিন রিমা জোর ক'রে ওকে ডেকে নিয়ে যায়।

এবার এসে অবধি শৈবাল উসখুশ ক'রছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন দেখতে পেল। রমার সামনে খুব স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা ক'রল। মান্তুকে কিছু কোলকাতার গল্প শোনাল. তারপর রিণ্টুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। এদিক-ওদিক ঘুরল, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করল—কিন্তু মন প'ড়ে রইল অন্য জায়গায়। মান্তুরা নিজেদের মধ্যে কি একটা আলোচনা করছিল আর খিক্ খিক্ ক'রে হাসছিল। রমার পরণে ছিল চুড়িদার। ওড়নার এক প্রান্ত মুখে চাপা দিয়ে হাসির শব্দ রোধ করতে চাইছিল। খুব মিষ্টি লাগছিল ওকে। যেখানেই যাচ্ছে—ওই একটা দৃশ্যই চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

রমা ডায়েরী লেখে। আজ যে কি লিখবে ভেবেই পেল না। বাড়ি ফিরে খুব মন খারাপ লাগছিল। কারণ রমা তো শৈবালের কথা জানতেই পারে নি। হুট ক'রে বেরিয়ে গেল ওরা। কেন একটু থাকলে কি হতো? দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে....... পেছন থেকে কি ভালই না লাগছিল। খুব স্মার্ট

আর সুইট লাগছিল। শৈবাল এক ছেলে। রমার এক ছেলের বৌ হওয়ার খুব শখ ছিল। দু-এক বার কোলকাতায় গিয়েছে কিন্তু তেমন কিছু মনে নেই। ইস্ কতো দুর। মাকে ছেড়ে কি ক'রে থাকব? অ-নে-ক-দূ-র-অ-নে-ক-দূ-র—

মার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল।

—আঃ কি হ'ল? অত চেঁচাচ্ছ কেন?

—আরে কি সব্বোনাশ হয়েছে—

—কেন কি হয়েছে?

—ও বাড়িতে কোলকাতা থেকে রিন্টুর পিসতুতো ভাই এসেছে না।

এক ঝট্‌কায় রমার সব ঘুম যেন ছুটে গেল,

—হ্যাঁ, এসেছে, তো তার কি... কি হয়েছে?

—আরে বাবা তার নয়, খবর এসেছে কোলকাতা থেকে যে ওর বাবার স্ট্রোক হ'য়েছে।

গুম্ হ'য়ে ব'সে থাকে রমা। নিজেকে বড়ো স্বার্থপর মনে হয়। মার প্রথম কথায় ভেবেছিল শৈবালের বোধহয় কিছু হয়েছে, তারপর ওর বাবার কথাটা শুনে আশ্বস্ত হয়।

ছদিন পর খবর এলো শৈবালের বাবা মারা গেছেন।

বাড়ীটা ভীষণ খাঁ খাঁ করছে। বাবা এতো আমুদে, এত মিশুকে ছিলেন। শৈবালের মনে হয় জীবনের সব থেকে বড় বন্ধুকে সে হারাল। ওরা সবাই যেন বাবাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো। সব ব্যাপারে কী উৎসাহই না ছিল। যখন যেখানে যেতে চেয়েছে, তখন সেখানে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে। এই তো মামার বাড়ীতে একা একা দুই ভাই-বোন যাব—এতে মার কিছুতেই মত ছিল না। বাবার জন্যই তো যাওয়া। সেবার বাবার স্ট্রোকের খবর পেয়ে সেই রাত্রেই রওনা দিয়েছিল ওরা। রমা নিশ্চই জানে। ও তো একটা খবর নিতে পারত, ইস্ কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ক'দিনের জন্য দেওঘর ঘুরে আসলে হয়। দেখাও হবে, বলাও হবে।

ডিসেম্বর মাস। বেশ ছুটির মেজাজ। রমা আজ খাওয়া দাওয়া সেরে মাস্তুর কাছে এসেছে অঙ্ক করবে বলে। দরজা বন্ধ ক'রে জমিয়ে বসেছে।

শুরু হয়েছে। তবে ঐ একটাই। তারপর থেকেই চলেছে ওদের গল্প। কতক্ষণ ওদের কোনো খেয়াল নেই। হঠাৎ দরজায় টক্ টক্ আওয়াজ। ওরা ঘড়ির দিকে তাকাল—সাড়ে তিনটে। মানে তিন ঘন্টা। তাড়াতাড়ি পুরোনো খাতা সামনে খুলে মাস্তু দরজা খুলতে গেল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়েই রমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো। পিসিমণি এসেছে শুনে মাস্তু নীচে চলে গেল। শৈবাল সোজা এসে দাঁড়াল ওদের পড়ার টেবিলের সামনে। রমার মুখোমুখি।

—আমার এত বড় একটা দুর্যোগ গেল, একটা পোষ্টকার্ড আশা করাও কি অন্যায়?

—না, মানে—

রমার গলা শুকিয়ে গেল। শত চেষ্টাতেও আর একটা কথা বেরোনো তো দূরের কথা চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারল না। রিমা হঠাৎ দৌড়ে ঘরে ঢুকল—দাদা, মা আবার ঐরকম করছেন।

—চল।

যাবার আগে আর একবার ভাল ক'রে দেখে গেল রমাকে।

একদিন শৈবাল রিন্টুকে বলল—চল না সবাই মিলে ত্রিকূট পাহাড়ে যাই।

—হ্যাঁ চল, তাহলে কাল সকালে সবাইকে খবর দিয়ে দেবো।

—সবাইকে মানে?

—ওই মানস, প্রদীপ··

—না, না, বন্ধু বান্ধব না, চল বাড়ির লোকজনকে—

—বাড়ির লোকজন! তুই তো এতদিন বাড়ির কাউকে নিতে চাইতিস না।

—হ্যাঁ মানে এখন হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল।

—আচ্ছা চল।

রমার জন্ম রাঁচিতে। ওরা দেওঘর এসেছে ছ'বছর। এতোদিনে একবারও ত্রিকূট পাহাড়ে যায় নি—ভয়ে, কিন্তু আজ যখন শুনল শৈবাল যাচ্ছে—তখন ভাবল ভয় কি? শৈবাল তো আছে।

একটা মাঝবয়সী গাইড নিয়েছে। ভাইবোনেরা আগে আগে যাচ্ছে। ওদের বোঝাচ্ছে রিন্টু। গাইড যত না বলছে, তার চেয়ে বেশী বলছে রিন্টু। সবার শেষে যাচ্ছে রমা আর শৈবাল। অবশ্য পাশাপাশি নয়, আগে পরে।

সেদিনের পর রমার সঙ্গে আর কথা হয় নি, কিন্তু মনে মনে অনেক অ-নে-ক কথা বলেছে। আনমনা চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেল, পেছন থেকে শৈবাল চট্‌ ক'রে হাতটা ধ'রে ফেলল। উ....হু....। কিন্তু এবার যে রমা আরোই চলতে পারছে না।

এই জায়গাটায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে। রমা থমকে দাঁড়াল

—কি হ'ল চল

—ভয় করছে

—কিচ্ছু হবে না, আমি তো আছি।

রমা আস্তে আস্তে উঠতে আরম্ভ করলো।

—ওরে বাবা, আমরা কত উঁচুতে উঠে এসেছি—কত উঁচু। ওমা ওরা তো আবার নামতে আরম্ভ করছে।

—পেছন দিকে তাকিয়ে দেখো।

—ও মা গো—বলে রমা শৈবালের বুকে মুখ লুকলো। শৈবাল আলতো ক'রে রমাকে ধ'রে ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সাহস দিতে লাগল। শৈবালের মনে হ'ল জীবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরতম মুহূর্ত।

ফেরার পথে রমা চুপচাপ। ভীষণ লজ্জা ক'রছে ওর। ইস্‌ কেন অত ভয় পেল? নিজের কাছেই নিজে ধরা প'ড়ে গেছে যেন। কী সুন্দর এই পৃথিবীটা। ও তো দু'দিন বাদে চলে যাবে, তখন কি হবে?

এখন এক দিনও রমাকে না দেখে থাকতে পারে না শৈবাল। অথচ বাবার জায়গায় নতুন ঢুকেছে, ছুটি পাবে না। দেখতে দেখতে দেড়মাস কেটে গেল। এর মধ্যে পনেরো খানা চিঠি এসেছে। প্রত্যেকটা চিঠিই কি সুন্দর। প্রত্যেকটা চিঠি পড়ে-শুঁকে চুমু খেয়েও নিস্তার পায় না। ক'দিন মার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। মা বলছিলেন 'কবে তোর একটা বউ আসবে, আমি নিস্তার পাব'। সত্যি কবে যে রমাকে কাছে আনতে পারব? রমার সামনে পরীক্ষা। পরীক্ষাটা মিটে গেলেই কথা তুলবো।

দুর্গা-দুর্গা ব'লে পরীক্ষাটা শেষ হ'ল। উফ্‌ কতদিন দেখিনি শৈবালকে। পুজোর সময় আসবে বলেছে। আবার সেই পুজো। এই সব কথাগুলো মনে করতেও খুব ভালো লাগে। শেষবার যখন শৈবাল এসেছিল তখন কী কাণ্ডটাই না

হয়েছিল। আসলে রমা তো জানত না যে শৈবাল এসেছে। মাস্তুর ডাকে রমা এক দৌড়ে মাস্তুর ঘরে ঢুকেই দেখে শৈবাল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে যাবে, এমন সময়ে শৈবাল ধ'রে ফেলে। দরজা খোলা। রমা শৈবালের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আর শৈবালের বন্ধন ততই দৃঢ় হয়। একসময়ে রমা হার মানে। নিজের শরীরটাই যে এমন বিদ্রোহ করবে কে জানত। রমা শুধু বলেছিল 'অসভ্য'।

ওরে বাব্বা চিঠির কি সম্বোধন—'অসভ্য': কি সুন্দর চিঠি লেখে রমা। এই তিন বছরে কত কথা নিয়ে কত চিঠিই না এসেছে। একটা আর একটার থেকে আলাদা। ওদের বাড়িতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। আর পাক্কা আঠাশ দিন বাকী, তারপরই ব্যস্। একেবারে কাছে পাবে। আর ছাড়বে না, সারা জীবনের জন্য একসঙ্গে চলা আরম্ভ হবে।

এত লোকজন যে বাড়ীটার কোথায় কি আছে রমা বুঝতেই পারছে না। ভেতরে ভেতরে কেমন একটা গুড়গুড় করছে। গুড়গুড় করছে বুকের মধ্যে—ভয়, আনন্দ, লজ্জায়। আজ রমার বৌভাত। রমা আর কিছু ভাবতেই পারে না।

শৈবাল ভাবছে রাত দশটা বাজতে চলল এখনো লোক আসার শেষ নেই। উফ। আচ্ছা রমা কি ভাবছে? কি সুন্দর লাগছে। কখন যে এই দুই হাতের মধ্যে পাব।

অনেক খাবারের সামনে রমা আর শৈবালকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রমার গলা দিয়ে যে কিছুতেই কিছু নামছে না। যাইহোক খাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর সকলে হৈ হৈ করে ওদের দু'জনকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। রমা একেবারে রুদ্ধশ্বাস হয়ে বসে রইল মাথা নীচু করে।

শৈবাল রমার কাছে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে ওর মুখটা তুলে ধরল। ওকে ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর পরিয়ে দিল একটা মুক্তো বসানো সুন্দর আংটি। তারপর? তারপর এতদিনের জমানো সব ইচ্ছা নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল রমার ওপর।

ওঃ কী ঘুম পাচ্ছে। কি করি? শৈবাল তো ছাড়ছে না। ওর ইচ্ছে সারা রাত জেগে গল্প করি। কিন্তু আমি যে আর পারছি না।

আচ্ছা রমা আজ তোমার কি মনে হচ্ছে? বল—রমা—রমা—

রমা ঘুমিয়ে পড়ল। এই রাতে কেউ ঘুমোয়? ওর কি কিছুই ইচ্ছে করছিল না?

মধুচন্দ্রিমায় কাশ্মীরে আসার পরিকল্পনাটা আমাদের দু'জনেরই। ট্রেন জার্নিটায় একটুও খারাপ লাগেনি। আরো এক দলের সঙ্গে আলাপ হ'লো আসার পথে। ওরা সবাই নব-বিবাহিত। খুব মজা হবে সবাই মিলে।

জানো রমা জীবনটা যে এত সুন্দর—এর আগে বুঝিনি। রমা আমার রমা। কি গো ঘুম পাচ্ছে?

—হুঁ?

—আচ্ছা একটা কথা বলবে?

—কি?

—আমাকে তোমার ভালো লাগে না?

—কেন লাগবে না?

—তাহলে এমন ঘুমোও কেন? আচ্ছা তুমিই বল—তোমার কি ভালো লাগে। জানো রমা আমার এক বন্ধু বিয়ের পর—টানা একমাস ঘুমোয় নি, আমারও খুব ইচ্ছা ছিল। রমা—রমা—যাঃ ঘুমিয়ে পড়ল।

শৈবাল বোধহয় রাগ করছে। কিন্তু আমার যে ভেতর থেকে তেমন কোনো তাগাদা আসে না। তাই তো অত ঘুম পায়। বিয়ের আগে শৈবালের আচমকা ক্ষণিকের স্পর্শে রমার যে শিহরণ—কোথায় গেল সেইসব। এখন রাত্রিগুলো রমার কাছে বিভীষিকা বলে মনে হয়। কিন্তু না, উপায় একটা আছে। আমারই হাতে। শৈবালকে আমি সুখী করবই।

আমি ঠিক যা চাই রমা এখন তা-ই। অনেক স্বতঃস্ফূর্ত। এখন অনেক রাত অবধি আমরা গল্প করি। বিয়ের পর পরই রমার দাম্পত্য মিলনে যে অনীহা দেখা দিয়েছিল—তা এখন একদমই নেই। আমার নিজেকে পৃথিবীর

সবথেকে সুখী মানুষ ব'লে মনে হয়।

দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল। নিজের সঙ্গেই নিজে যুদ্ধ করে ক্লান্ত আমি। আর পারছি না। রমা ভাবে।

রমা যেন আবার সেই বিয়ের পরের সময়ে ফিরে যাচ্ছে। আজ অফিসে পল্লব, উদয় রমার কি প্রশংসাই না করল। শুনতে শুনতে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। রমা বাপের বাড়ি যেতে চেয়েছে। ক'দিন ঘুরে আসুক।

অনেকদিন পর রমার চিঠি পেল। আসলে বিয়ের পর রমা শৈবালকে ছেড়ে বিশেষ কোথাও যায় নি। এবারের যাওয়াতে তাই অবাকও কম হয় নি শৈবাল। রমার স্পর্শ আছে এই কাগজগুলোতে। আঃ। কি লিখেছে দেখি—

—না রমা না. তুমি ভুল ক'রছ। তুমি লিখেছ—'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'

—রমা আমার জীবন তো ব্যর্থ হয় নি আমায় তুমি ভালোবাসো ব'লেই সুখী করতে চাও বলেই—তো অভিনয়ের পথ নিলে। আর আমাকে বিশ্বাস করো বলেই তো তা জানালে। রমা জীবনে জীবন তো আমরা যোগ করেইছি—

পাশের বাড়ির গ্রামোফোনের আওয়াজে এই বাড়িটায়ও গম গম ক'রে ওঠে "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে"........

বাল্মীকির মা

মিহির ভট্টাচার্য

এখন মুনশিডাঙ্গার মোড় বললে কেউ চিনবে না। বলতে হবে রানী রোডের মোড়। রানীরোড, গাঙ্গুলিপাড়া, কালাচাঁদ পতিতুণ্ড লেন, সিমলাই-পাড়া—এ সব ছিলো হিন্দুপাড়া। মুনশিডাঙ্গার মোড় থেকে পুব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো মুসলমানদের ঘরবাড়ি, পতিত জমি, ধোপাপুকুর, চাষের খেত। এগুলো রাজা মনীন্দ্র রোডের উত্তরে। দক্ষিণে টালা পার্ক, জিমখানা, আর্মড পুলিস ব্যারাক, ভেটিরিনারি কলেজ আর অনাথ দেবের বাগানের দু'দিকে কয়েকটা হিন্দু বাড়ি। একদম পশ্চিমে বিটি রোডের ওপর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রাজবাড়ি। এখানে এখন মুসলমানদের চিহ্ন হিসেবে পড়ে আছে মুনশিডাঙ্গার মসজিদ, নিয়াজের দখল হয়ে যাওয়া জমি। দেশভাগের পর মুসলমানরা কাশীপুর বা বেলগাছিয়ার মুসলিম বস্তিতে সরে গেছে। দখল হয়ে গেছে তাদের জমি। গড়ে উঠেছে রিফিউজি বস্তি বা বস্তির মতো কলোনি। তাছাড়াও অঞ্চলটা পালটে গেছে। নতুন নতুন চোখ ধাঁধানো বাড়িতে নতুন পয়সাওয়ালা চোখ ধাঁধানো মানুষেরা ক্ষেত, পতিত, বাগান, ক্যাম্প, ধোপাপুকুর, ধানকলের মাঠ হজম করে নতুন নাম দিয়ে দিয়েছে জায়গাগুলোর।

পুববাংলা থেকে মানুষের প্রথম ঢেউ এসে যেসব জায়গায় প্রথম থিতোয় তার মধ্যে মুনশিডাঙ্গার মসজিদের পেছনের জমি একটা। এ-ও সেই নিয়াজের জমি। এর পরেই হাতিবাগানের মিত্তিরদের জমি। সেখানে তাদের একটা বাড়িও আছে একতলা। এখন ভেঙে পড়ছে, তবু আছে। মসজিদের পেছনের জায়গাটা যারা দখল করে বসতি গেড়েছে তারা প্রায় সকলেই ঢাকা জেলার একই অঞ্চলের লোক। প্রথম প্রথম তাদের বাড়ির মাথায় লাউডগা, কুমড়োডগা লতিয়ে উঠেছিলো। বাড়ির সামনে জায়গা পেয়েছিলো যেকোন একটা গাছ। এখন তারা শহরে। লাউডগা, কুমড়োডগা শুকিয়ে গেছে। গাছগুলো অযত্নেও টিকে আছে। শুধু একটা পেয়ারা গাছ মরু পায়। পাড়ার

হার্মাদ ছেলেরাও সাহস পায় না তার ডাল ভাঙতে, পাতা ছিঁড়তে, ফল পাড়তে। সেই গাছের গোড়ায়, মনীন্দ্র রোডের দিকে মুখ করে একটা জল-চৌকির মাপে, সেরকম উঁচু একটা বেদী আছে। এক প্রৌঢ়া রোজ দুপুর বেলা থালায় ভাত সাজিয়ে, চারপাশে ব্যঞ্জন দিয়ে ঐ বেদীতে এনে রাখে। হাঁটু মুড়ে বসে একটা হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে। কতক্ষণ তার ঠিক নেই। একেক দিন একেক সময় উঠে পড়ে। ভাতের থালাটা হাতে নিয়ে কী যেন বলতে বলতে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। আশপাশের পুরনো বাসিন্দারা এখন লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করে না। তাদের বুকের মধ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস থমকে থাকে। সকলের সেই শ্বাস কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে চরাচরের দীর্ঘশ্বাসে মিশে পেয়ারা গাছের পাতা ঝির ঝির কাঁপিয়ে বয়ে চলে।

ঐ প্রৌঢ়া রতুর মা। রতুর নাম শুনলে এখনও পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া দত্তবাগান, বীরপাড়া, সিমলাইপাড়া, সেভেন ট্যাঙ্কস্, শেঠবাগানের মানুষ কেমন সতর্ক হয়ে যায়। ছিপছিপে কালো চেহারা, গভীর কালো দুটো চোখ, মুখে সারল্যের ছাপ কিন্তু ডাকাতে স্বভাব। পুরো নাম রত্নাকর চক্রবর্তী। ওর বাবা মহেশ্বর চক্রবর্তী কোন দিন কোন কাজ করেনি। এখনও করে না। দখল করা জায়গায় ওদের যে বাড়ি সেটাও তার করা নয়। দেশে থাকতে সে ছিলো ঘরজামাই। রতুর দাদু তাঁর আদরের একমাত্র মেয়েকে ভালো বংশ দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন আর শর্ত করে নিয়েছিলেন জামাই তাঁর বাড়িতেই থাকবে। তাঁর ছিলো প্রচুর সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি। শিষ্য যজমানের সংখ্যা অনেক। থাকলে কী হবে। স্ত্রী গত। দুই ছেলে বড়। মেয়ে ছোট। ছেলে দুজনই হার্মাদ। যজন যাজন শিখতে চায় না। বিষয়-আশয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু বোন বলতে অজ্ঞান। নাম অমল আর বিমল।

তারপর দেশভাগ। রতুর মামারা বোনের মর্যাদা হারাবার ভয়ে রাতারাতি সবাইকে নিয়ে পালিয়ে এলো। জায়গা দখল করে বাড়ি করলো। ওর বাবা নির্বিকার ঘরজামাই। আগে যেমন কাজকর্ম না করে ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে খেতো তেমনিই কাটাতে লাগলো। মামাদের আর বিয়ে হলো না। কলকাতায় এসে রুজি-রোজগারের রাস্তা না পেয়ে হার্মাদ অমল আর বিমল মারদাঙ্গার জীবন বেছে নিলো। প্রথম প্রথম আশপাশের কলকারখানার ইউনিয়নের ওপর হামলার কাজ করতো। একটা থেকে আরেকটা হয়। ধীরে ধীরে দু-ভাই গুণ্ডা

হিসেবে নাম করে ফেললো। অমল বেশি। বিমল কম।

রতু যখন ছোট সেই সময় একদিন অমল অন্য একদল গুণ্ডার হাতে খুন হয়ে গেলো। সে ছিলো গোঁয়ার গোবিন্দ। গায়ে মোষের মতো জোর। সেই জোরে সব মেটাতে চাইতো। পাঁচ-ছ বছরের রতু মায়ের হাত ধরে সেদিন মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিলো। ওর বড় মামার অসুরের মতো পেটানো স্বাস্থ্যের শরীরটা পাড়ার ছেলেরা মর্গ থেকে বয়ে এনেছে। দূর থেকে ছুঁড়ে মারা বোমায় দেহের খানিকটা উড়ে গেছে। ঝলসে গেছে আশপাশের চামড়া। দাদু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিথর। মার শরীরটা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর বাবা ধারে কাছে কোথাও নেই। পলাতক। হয়তো টালাপার্কে তাসের আড্ডায়। লোকটা এরকমই। ছোট মামা বিমল গাঢাকা দিয়েছে। তার ওপর আক্রমণ হবার ভয় আছে। ওদের পরিবারের সামনে অনিশ্চয়তা।

সেদিন ছোট রতু নিজেদের অসহায়তা বুঝতে পেরেছিলো কিনা কেউ জানে না। তবে অমলের মৃতদেহ যতক্ষণ ছিলো ততক্ষণ সে মার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো। একবার মা-র মুখের দিকে, আরেকবার দাদুর মুখের দিকে পড়শিদের মুখের দিকে, তারপর বড় মামার শায়িত দেহের দিকে ঘুরে ফিরে দেখছিলো। হয়তো ওর মনে বড় মামার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমনিতে সে বাড়িতেই থাকতো কম। থাকলেও তেমন কথা বলতো না। যা দু-একটা তা ওর মাকেই বলতো। কিন্তু দাদুর মনে শান্তি ছিলো না। তাঁর জান্য অধঃপতনে। বস্তিতে বাস, ছেলেদুটো গুণ্ডা-বদমাশ, মানুষের কাছ থেকে দেশের মতো মর্যাদা পান না। তিনি ভাবেন—ছেলেরা কাজকর্ম জোটাতে পারলে অন্ততঃ কিছুটা মান-সম্মান ফিরতে পারে। তাই মামারা বাড়িতে ঢুকলেই দাদু মুখ খুলতেন—'আমার মহাপাপ। সারল্যার জানকী ভট্‌চাইজ্যের পোলারা কী না গুণ্ডা-বদমাইশ। সকলের কাম জোটে তগো জোটে না ক্যান? মামাবাড়ির দোষ। সেগুলানে লুটপাট কইর‍্যা খাইতো। সেই নরানাং মাতুলাক্রম।'

রতুর মামারা যতই দুর্দান্ত হোক না কেন কোনদিন দাদুর মুখে মুখে কথা বলেনি। তারা মুখ বুজে শুনে যেতো। মাঝে মাঝে বড় মামা কেমন কাতর-ভাবে ওর মাকে শোনাতো—"বুনডি, তুই-ই ক। বাবায় যে অ্যাতো রাগ করে তার কোনো মানে হয়। কেউ আমাগো কামকাজ দিবো না। এই রকম মাইর-ধইর কইর‍্যাই খাইতে হইবো আমাগো। বাবায় জাশের কথা

গেলে ওর মা ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো। দাদু বাড়ির ভেতরে ঢুকে নিজের চৌকিতে উঠে বসেছিলেন। বাবা সারাদিন বাড়িতে ঢোকেনি। উনুন জ্বলেনি। পাশের বাড়ির গাঙ্গুলিদের বড়বৌ একসময় এসে ওকে নিয়ে গেছে। সে-ই স্নান-খাওয়া করিয়েছে। দাদুকে, মাকে তারা খাওয়াতে চেয়েছিলো। পারেনি। শুধু রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে সে প্রশ্ন করেছিলো—"ছোট মামা আসবে না?" রাতে বিমলের পাশে শোয়া অভ্যেস। মা তখন ছোড়দার চিন্তায় আকুল। ছেলের প্রশ্নে অতিকষ্টে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেও কান্নাভাঙা আওয়াজ লুকোতে পারলো না—"তুই ঘুমা। ছোট মামায় আইবে নে।" রতু মার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলো। কেউ বলতে পারবে না জীবন সম্পর্কে ও সেদিন কী শিখেছিলো।

বিমল প্রায় তিন-চার মাস পাড়া ছাড়া হয়ে রইলো। তবু সময়মতো লোক মারফত বাড়ির খরচ পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত পাড়ার এক রাজনৈতিক নেতার মধ্যস্থতায় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংয়ের সঙ্গে মিউচুয়াল হলো। বিমল স্বাধীন গুণ্ডা থেকে ঐ রাজনৈতিক নেতার চামচা গুণ্ডা হয়ে গেলো। থানার ও-সি, স্থানীয় সি-আই-ডি কর্মচারী আর ঐ রাজনৈতিক নেতার কাছে বিমল ওয়াদা করলো ও নিজে থেকে কোন অপারেশন করবে না। বিনিময়ে ও একটা ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটির চাকরি পেলো।

বড় মামার মৃত্যুর পর দিনসাতেক ওর দাদু জবুথবু হয়ে কাটালেন। তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ওঁর মধ্যে কেমন একটা ভরগ্রস্তের ভাব। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠেন। রতুকে সব সময় কাছে কাছে রাখেন। একেক সময় আবেগে নাতিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন—"দাদু, তুই আমার রত্নাকর। বল্ দাদু, তুই মামাদের মতো দস্যু রত্নাকর হবি না? বল্, তুই বাল্মীকি হবি?"

রতু কথার গভীরে যেতে পারে না। শব্দগুলো ওর চেতনায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু দাদুর আবেগটা বোঝে। বোঝে দাদু তার কাছে কিছু চাইছে। শিশু মন আবেগে সাড়া দেয়। মাথা নেড়ে বলে—"আমি বাল্মীকি হবো।"

বাল্মীকি হওয়ার জন্য তাকে স্কুলে পাঠানো হয়। ছোট মামা চাকরি করে। পাড়ায় সে ঠাণ্ডা। কিন্তু বেলঘরিয়ার একটা দলে ভিড়ে গেছে। গুণ্ডামির উটকো রোজগার ছাড়তে পারে না। সে বড় ভয়ঙ্কর নেশা। আরেক বড়

নেশা লোকের মনের ভয়।

রতুর যখন বছর চোদ্দ বয়স ওর দাদু মারা গেলেন। পরিবারে এই দ্বিতীয় মৃত্যু ওর ওপর কী প্রভাব ফেললো কে জানে। ও হঠাৎই পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো। পয়সা রোজগারের ধান্দা না থাকলেও মার-পিটে ওর স্বাভাবিক প্রবণতা। ধীরে ধীরে অল্পবয়েসি একটা দল ওর চারপাশে গড়ে উঠলো। ওর ছোট মামার পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক নেতা একদিন যেচে ওকে ডেকে কথা বললেন। অমল-বিমলের ভাগনে বলে বেশ স্নেহ আর আদরের সুরে ওকে আপন ভাব দেখালেন। ওদের পাড়ার সাদা পোষাকের পুলিসের লোক শচীন বাগচি একদিন নিমাই সাহার পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান খেতে খেতে ওর পিঠে হাত রেখে গল্প করলো। ওদের পাড়ার টপ রংবাজ শিলু বিমলের বন্ধু। সে-ও একদিন বললো—"কি রে ভাগনে, কেলাবে যাস না কেন? রোজ আসবি।"

লোকমুখে রতুর মা সে খবর পায়। ছেলেকে চেপে ধরে। সে রুক্ষ স্বরে উত্তর দেয়—"আমি কী স্কুলে যাচ্ছি না? পড়াশুনাও তো করছি।"

ব্যাপারটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি হৈ চৈ করে বিমল। সে আজকাল কোন কোন দিন মাতাল অবস্থায়ও বাড়ি ঢোকে। আগে ভুলেও আসতো না। সে বোন আর ভাগনের ওপর দারুণ হম্বিতম্বি করলো—"আমাগো জীবন তো গ্যাছে। কী করুম, ভাইগ্যর ফ্যার। কিন্তু তুই ক্যান সেই রাস্তা ধরতেছস। আমাগো খাওয়ার উপায় ছিলো না। তোর অসুবিদাটা কোথায়? ফ্যার যদি তোরে অগো লগে দেখি তয়ালে তোর অ্যাকদিন কী আমার অ্যাকদিন।"

রতু চুপ। মামার হম্বিতম্বির বিরুদ্ধে টুঁ ফাঁ করলো না। কিন্তু নিজেও পালটালো না। এজন্য একদিন মার খেলো বিমলের হাতে। বিমল খ্যাপার মতো বিবেচনা না করে তেড়েমেরে শিলুর বাড়ির দরজায় হাজির হলো। ওকে ডাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে বললো—"তুই আমার কইল্জায় হাত দিছস ক্যান?"

শিলু খুব ঠাণ্ডা মাথার মস্তান। তাই সে আজও বেঁচে। তার হাল চিলে হয়নি। এখনকার উঠতি মস্তানেরাও সমীহ করে। সে বিমলের দিকে বরফ চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধীর গলায় বললো—"তুই শালা বরাবর মাথামোটা বাঙাল রয়ে গেলি। তোর ভাগনে অনেক সেয়ানা। নিজে না হতে পারলে দুনিয়ায় কেউ কাউকে মস্তান বানাতে পারে? তুই রতুকে ঠেকাতে পারবি?"

বিমল যতখানি তেড়েফুঁড়ে এসেছিলো ঠিক ততখানিই চুপসে গিয়ে বললো —"তুই তো অরে দাবড়ানি লাগাইতে পারস।"

শিলু কোন জবাব দিলো না।

ছোট মামার হাতে মার খেয়ে রতু কোন শব্দ করেনি। মার ঠেকাবার চেষ্টাও করেনি। দাদার হাতে ছেলেকে মার খেতে দেখে রতুর মার অন্তরে মোচড় দিলো। সে রাতের বেলা শোয়া ছেলের পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো—"তয় কি তুই দস্যু রত্নাকরই হবি? তোর দাদুর আত্মাডা তো কাইন্দা কাইন্দা মরবো?"

রতু হঠাৎই ছেলেমানুষের মতো মা-র কোলে মাথা রেখে বললো—"না মা, আমি এখন থেকে শুধুই পড়াশুনা করবো।"

ও নিজের চালচলন পাল্টায়। সঙ্গী-সাথীদের এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। পুরোপুরি পারে না। তবে যখনি মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে সামলে নেয় নিজেকে। কিন্তু একটা ঘটনায় সব তছনছ হয়ে গেলো।

বিমল মার্ডার কেসে ধরা পড়লো। বেলঘরিয়ায় একজন স্ত্রীলোককে হত্যার দায়ে পুলিস ওকে ধরে নিয়ে গেলো। ঐ স্ত্রীলোকটিকে ও পুষতো। সে ওর আড়ালে অন্য আরেকজনের সঙ্গে পিরিত করতো। বিমল তক্কে তক্কে থেকে দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে যায়। দুজনকেই খুন করার চেষ্টা করেছিলো। লোকটা নেপালার কোপ খেয়েও পালিয়ে যেতে পেরেছে। চোট লেগেছে কাঁধে। স্ত্রীলোকটি পালাতে পারেনি। তার গলা নামিয়ে দিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ায় বিমল চাকুরি থেকেও সাসপেণ্ডেড হয়ে গেলো। তার রাজনৈতিক দাদা সমস্ত ব্যাপারটা থেকে হাত ধুয়ে বসে রইলেন। তিনি রতু আর তার মাকে সাফ বলে দিলেন—"এ তো ক্রিমিনাল কেস। এতে আমি জড়াতে পারি না। পলিটিকাল মার্ডার হলে আলাদা কথা।" তারপর তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মুখটা প্রসন্ন করে রতুকে বললেন—"ভাগনে, তোর মা-র আসার কী দরকার। তুই একবার বরং সন্ধের পর, না থাক সন্ধেবেলা হবে না, কাল সকালে দেখা করিস। এখন তো তোদের খাওয়া-পরা নিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে। তার ওপর বিমলের কেস!"

হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি রতু। সারাক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে নেতার দিকে তাকিয়ে ছিলো। মুখ ভাবলেশহীন। ওর মা-র মুখেচোখে কাতরতা আর অনুনয়-বিনয়ের ছাপ ছিলো। নেতার কথা শুনতে শুনতে সে ভঙ্গি পালটে গিয়ে

রাগের ছাপ ফুটে উঠলো। কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটলো না। ওরা দুজনে চুপচাপ উঠে এলো।

রতু সকালে নেতার কাছে যায়নি। সে আবার পুরো মাত্রায় শিলুর দলের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করলো। সরকারি দলের ঐ নেতার সঙ্গে শিলুর সম্পর্ক ভালো না। সে বিরোধীদের সঙ্গেও নেই। নিজের বুদ্ধির জোরে চলে। থানা হাতে। বিরোধীদের সঙ্গে গেলে রোজগারপাতির সম্ভাবনা কম। ওরা শ্রমিকের পক্ষে। কিন্তু পয়সা তো দেয় মালিকরা। পয়সা আসে বেআইনি কাজে, ওয়াগনভাঙ্গায়, মালপাচারে। রতু অবশ্য বিরোধী দলের ছেলেদের সঙ্গেও ঘোরাফেরা করে।

রতু দস্যু রত্নাকর হয়ে গেলো। বিমল কয়েদ থাকলেও সংসারের চাকা আগের মতোই চলতে লাগলো। মামাদের মতো সে-ও বাড়িতে ফেরে না। ওর মা অস্থির হয়ে ওঠে। সে প্রায়ই ছটফটিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। অকারণ মণীন্দ্র রোড, রাণী রোড, গাঙ্গুলিপাড়ায় চক্কর দেয়। পনেরো নম্বরের রাস্তায় হাঁটে। রতুর বাবা নির্বিকার। সে তার সুখ, অকর্মণ্যতা আর আড্ডা নিয়ে দিনযাপন করে। সময়মতো স্নান-খাওয়া আর রাতে শোওয়া—এটুকুই তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক। রতুর মা যেদিন যেদিন সামনে বসিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে পারে সেদিনই বলে—"ভাইগ্যের ফ্যারে তুইও দাদাগো মতো দস্যু হইয়া গেলি। উপায় তো নাই। কিন্তু তোর দাদু বড় কষ্ট পায়!"

বিমলের সাজা হয়ে গেলো। রতুদের লাগানো উকিল খুব খেটেছে। বিমলের সাজাও তাই কম। সাত বছরের সশ্রম কয়েদ। এদিকে রতুর ওপর পুলিসি হামলা হতে শুরু করেছে। শিলু আর শচীন বাকচির প্রোটেকশনে ও বেঁচে যাচ্ছে। পুলিস লাগানোর পেছনে সরকারি রাজনৈতিক দাদার হাত যে কাজ করছে এ খবর ও জেনে গেছে। পাড়ায় মস্তান নামে পরিচিত হয়ে গেলো। ওর ছাত্রজীবন শেষ। ভদ্রবাড়ির সহপাঠীরা, বন্ধুরা ওকে দেখে সমীহ করে। এড়িয়ে চলে। এতে ওর ভেতরটা আরো পাথুরে হয়ে যায়।

এমনি করেই হয়তো দিন চলে যেতো। হয়তো একসময় মস্তানির খেসারত হিসেবে বিপক্ষ গুণ্ডাদলের হাতে খুন হতো অথবা শিলুর মতো ধূর্ততার জোরে বেঁচে থাকতো। কিন্তু রতু সত্যি সত্যিই সেই প্রাচীনকালের দস্যু রত্নাকরের মতো সংসারের জন্য সমাজবিরোধী। শ্রমিকদের পক্ষের দলের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ও এটুকু বুঝেছে যে রিফিউজিদের সঙ্গে দেশনেতারা অন্যায়

করেছে। ওর মামাদের বা ওর মেহনত করে বেঁচে থাকার পথ রাখেনি সমাজ। তাই ভোটের সময় সে শ্রমিকদের পক্ষের দলের পাশে রইলো। ওর মামার রাজনৈতিক দাদা এবারে আর কব্জির জোরে নির্বাচন করতে পারলেন না। সরকার-বিরোধী দল রাজ্যে ক্ষমতায় এলো। ওদের পাড়ায় উদ্দীপনা। মামার রাজনৈতিক দাদা হেরে গেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁর দলের অনেক ছেলে আস্তে আস্তে বিরোধীদের দিকে ভিড়তে শুরু করলো। তাদের মধ্যে ক্যাম্পবাগান, দত্তবাগান এলাকার অনেক মস্তান ছেলেও ছিলো। নির্বাচনের ছ মাস যেতে না যেতে নিজের দলের কাছে রতুর পুরনো গুরুত্ব কমে গেলো। নেতারা ওকে আগের মতো খাতির করে না। ও এখন তাদের কাছে আর পাঁচজনের একজন।

নতুন সরকার আসার কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রমিক দলের পুরনো আর নতুন বহু কর্মী নেতাদের অধঃপতন হয়েছে বলে বিদ্রোহ করলো। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের কোলে নতুন সূর্য উঠেছে। তার রশ্মিতে তারা সারা দেশকে আলোকিত করতে চাইলো। সূর্যের ঠিকানার খোঁজে গোটা দেশের প্রান্তে প্রান্তে জীবন্ত মানুষেরা ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে, জলে-জঙ্গলে, খেতে-খামারে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের গলায় আওয়াজ—সময় এসেছে এবার তৈরি হও। সেই আওয়াজ রত্নাকরের মনের কন্দরে প্রতিধ্বনিত হলো। ও বুঝলো—ব্যবস্থাকে না বদলালে দস্যু থেকে বাল্মীকি হতে পারবে না।

রতুর দিন-রাত পালটে গেলো। খেতে আসার ঠিক নেই। রাতে বাড়ি ফেরা অনিশ্চিত। দিনকে দিন চারিদিকে ভয়ের ভাব বেড়ে চললো। নতুন সরকার, তাদের দল, পুরনো সরকারী দল সবাই সূর্যসন্ধানী ছেলেগুলোর মুণ্ডপাত করতে শুরু করলো। তাদের সঙ্গে সর্বত্র মারদাঙ্গা, বোমাবাজি, খুন-খারাপি। ওরা নাকি সব সমাজবিরোধী, খুনী। ওরা নাকি নিরীহ মানুষকে মারছে। কাগজে, রেডিওতে, বক্তৃতায় এসব শুনতে শুনতে যাদের জন্য সূর্যের সন্ধান সেই সব সাধারণ লোক ঐ ছেলেদের ভয় পেতে শুরু করলো। ছেলে-গুলোও কেমন অস্থির। যা করার নয় তাই করছে। কুঁড়িতে ফুল হতে না দিয়ে পাপড়ি কোটাতে চাইছে। রতুও কেমন ছটফটে। একদিন লুকিয়ে রাতের বেলা বাড়ি এলো। মা-র হাতের রান্না খেতে খেতে বললো—"মা, দাদু আর কষ্ট পাবে না। এবার আমি সত্যি সত্যি বাল্মীকি হয়ে যাচ্ছি।"

—"কিন্তু তুই বাড়িতে আসস না ক্যান? ছোড়দা খবর পাঠাইছে।

শিগগির ছাড়া পাইতে পারে। তোরে সাবধানে থাকতে কইছে। সময় নাকি খুব খারাপ। হ্যাঁ রে, তোর কোন আপদ-বিপদ হইবো না তো?"

—"ছোট মামা ছাড়া পাবে? তার মেয়াদ শেষ হতে তো বাকি।"

—"কী জানি। সেই রকম কথাই তো জানাইছে। মুখার্জিদাও একই কথা কইছে। ঠিক কইরা ক তো মুখার্জিদা তোর উপর চটছে ক্যান? তুই অ্যাখন ঠিক কী করস?"

মুখার্জিদা বিমলের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকের নাম। তিনি এসে রতুর মাকে ভয় দেখিয়ে গেছেন। ইঙ্গিতে জানিয়েছেন ছেলের জীবন যেতে পারে। মার কথা শুনে রতু চিন্তান্বিত হলো। মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী খুঁজছে। হঠাৎ সে গলা নিচু করে ফিসফিসিয়ে বললো—"শোন, মুখার্জীদা যখন গাইল পাড়ছে তখনই বুঝছি তুই কোন ভালো কাজে লাগছস। কর, সেই কামই কর। বাড়িতে আসনের দরকার নেই। তুই সাবধানে থাকিস, বাইচা থাকিস। আমাগো য্যামন-ত্যামন কইরা চইলা যাইবো।"

রতু অন্য কিছু ভেবে থাকলেও বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। পুলিশ ওদের বাড়ি সার্চ করেছে। মুখার্জিদার দৌলতে তছনছ করেনি। এ সময় ওর মা-বাবা খুব কষ্টে কাটিয়েছে। পয়সা-কড়ির অভাব। মাঝে মাঝে অপরিচিত কচিমুখের এক একটা ছেলে আসে। সামান্য কয়েকটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। রতুর মা ছেলের খবর জানতে চায়। প্রতিবারই জবাব পায় —"উনি ভালো আছেন মাসীমা। আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করেছেন।"

রতুর মা-র বুকে মোচড় দেয়। পা দুটো ছেলেদের পেছন পেছন পৌঁছতে চায় ওর কাছে। সামলে নেয় নিজেকে। চারদিকের হালচাল দেখে সে বুঝতে পেরেছে তার ছেলের জীবন আর নিরাপদ নয়। কতদিন ছেলের মুখটা দেখেনি। সে আপন মনে ছেলের চিন্তা করে। রাণী রোডের মুখে কিছু না ঘটলেও কাছাকাছি নিত্য মারদাঙ্গা; মাঝে মাঝে রাস্তাঘাটের আলো নিভে যায়। কচি কচি ছেলেদের মুখচোখের চেহারা পাল্টে গেছে। রায়টের সময় যেমন হিন্দু-মুসলমান জোয়ানদের চেহারা পাল্টে গিয়েছিলো সেরকম। অথচ নেতাদের মুখে কোন উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। মুখার্জিদা খুশি খুশি। তিনি সকলকে বলে বেড়াচ্ছেন—"দেখেছেন, আমরা ক্ষমতায় না থাকলে কী হয়?"

রতুর মার এক নতুন উপসর্গ হলো। দুপুরে ভাতের থালা নিয়ে খেতে বসে

হঠাৎই থেমে যায়। আর খায় না। জল ঢেলে উঠে যায়।

বিমল ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলো। এসে প্রথমেই রতুর ব্যাপারে বোনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিগ্‌গেস করলো। জেল খেটে সে আর আগের মতো নেই। চেহারায়, ভাবে, ভঙ্গিতে একটা খুনে লক্ষণ। বোন-ভগ্নিপতির ওপর বিচ্ছিরি হম্বিতম্বি করলো সে। অস্থিরভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। রতুর দলের ছেলেদের বিরুদ্ধে বিমল উঠে-পড়ে লাগলো। ওকে মুখার্জিদা সেই শর্তেই মেয়াদ মকুব করিয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন। সে বাড়িতে ফেরে। কিন্তু এক মিনিটও তিষ্ঠোতে পারে না। নানাভাবে ভাগ্নের খোঁজ করে, খবর পায় না।

রতুর মা-র ভরসা ছিলো—ছোড়দা যতই হম্বিতম্বি করুক ছেলের খোঁজ সে বার করবেই। কিন্তু দিনের পর দিন যায়। ছোড়দার মুখে কালির ছোপ পড়ে। চেহারায় কেমন ক্লান্তি, বয়সের ছাপ। চোখ দুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে। রতুর মা লোকের কাছে শুনেছে তার ছোড়দা আশপাশের এলাকা থেকে রতুর দলের ছেলেদের পুলিশের ব্যাকিংয়ে পাড়া ছাড়া করেছে অথবা খতম করেছে। তার যত রাগ ওদের ওপর। ওরাই তার ভাগনেকে বিগড়েছে। কিন্তু সে তো তার ছোড়দার মতো ভাবতে পারছে না। রতু যা বলেছে তাতে তো খারাপ কোন কাজ নয়। আর কাউকে যাতে দস্যু হতে না হয় ওরা তো তার চেষ্টাই করছে।

রাজ্যে আবার নির্বাচন এলো। মুখার্জিদার দল জিতলো। বিমল খুব ব্যস্ত। শিলু আবার ওর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নতুন সরকার আসতেই পুলিস মিলিটারি বিমল শিলু সব জায়গায় রতুর দলের ছেলেদের ওপর হামলা করতে লাগলো। কাগজে ছবি বেরোয় কচি কচি তরুণ ছেলেদের মৃতদেহের, গঙ্গায় ভেসে যাওয়া লাশের, দলবদ্ধ শবদেহের। পাড়া ঘিরে বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালাচ্ছে মিলিটারি। রতুদের পাড়া ঘেরেনি। কিন্তু ওদের দলের ছেলেরা পলাতক। আর কেউ রতুর মা-র সঙ্গে দেখা করতে আসে না। সে সকলের কথা শুনে সব বুঝতে চেষ্টা করে। রেডিও শোনে। পড়তে জানে না তবু খবরের কাগজ দেখে। ছবি দেখে যদি চেনা যায়।

রতুর কোন খবর নেই। ওর মা মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্ন দেখে। ছেলের চোখে ঘুম নেই। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার মুখে দু-মুঠো ভাত জোটে না। মনে পড়তেই তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখনই একটা থালায়

ভাত সাজায়, ব্যঞ্জন দেয়। থালা হাতে বেরিয়ে রাস্তার মুখে দাঁড়ায়। কবে কোন এক দিন থেকে সে ঐ পেয়ারা গাছের গোড়ায় বেদীতে থালা নামিয়ে রাখতে শুরু করেছে। ওটা তার ছেলের লাগানো গাছ। ঐ বেদী তার মামারা বাঁধিয়ে দিয়েছিলো। কবে আর এক দিন থেকে ভাতের থালাটা তুলে নিয়ে বিড় বিড় করতে করতে চলে যায়। কেউ যদি কান পেতে শোনে, সে শুনতে পাবে রতুর মা বলছে—"অ রতু, রতুরে, তুই কি বাল্মীকি হইতে গিয়া উই ঢিবির নিচে চাপা পইড়া গেলি? কিন্তু আমার যে গলা দিয়া ভাত নামে না।"

শুঁয়োপোকা

অমর মিত্র

পাঁচবাড়ির বউ ঝিয়ারি গড়ানো দুপুরে এ বাড়ির বারান্দায় বসে গল্প জোড়ে। এ বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই, আছে এক ষাট পার হওয়া বিধবা পঙ্কজিনী। ছেলে থাকে দূর দেশে রাজস্থানে, স্বামীর ভিটে ছেড়ে সে নড়বেনা কোথাও।

পঙ্কজিনীর গায়ের থান কাপড় অনেক দিনের। তখন পালদের বউ মালতি বিয়ে হয়ে এ গঞ্জে আসেনি, দাসদের বিয়ে না হওয়া মেয়েটা ফ্রক পরে, রায় বাড়ির বড়ছেলের বউ-এর কোলে ছমাসের ছেলে পিন্টু। অনেকদিন তো হলো।

এ বাড়ির চালা বারান্দাটি বেশ চওড়া, বেশ লম্বা, বেশ ঠাণ্ডা, মসৃণ লাল মেঝে। পুরোন পাঁচিলে এই বর্ষা ফুরোন শেষ ভাদ্রের দিনে শ্যাওলা, বটের চারা, এককোণে একটি আকাশ ছুঁই ছুঁই তাগড়াই সজনে গাছ। গাছটি বেশ মস্ত। এত বড় সজনে গাছ এ তল্লাটে আর কোথাও নেই। চোত বোশেখে ডাঁটার সিজিন শেষ হলে ডাল ছেঁটে গাছগুলিকে সাইজে রাখতে চায় সব ঘরে। পঙ্কজিনীর তা করা হয়না, ডাল কেটে দেবে কে? মজুর মুনিষের ব্যবস্থা করার জন্যও তো ঘরে একটা পুরুষ মানুষ দরকার। পাড়াসুদ্ধ সকলে ডাঁটা নিয়ে যায় ফাল্গুন চৈত্রে, তারা সব নানা ঘরের বউ ঝিয়ারি, কেউ মাথাও দেয়না গাছটা যে এত বড় হচ্ছে, এরপর সজনে হবে মেঘের গায়ে। ডালগুলো ত্যাখো, এক একটা হয়েছে দশাসই পুরুষের দাবনার মত, মনে করলেই কম বয়সীর হাতে পায়ে শিহরণ উঠবে। পাঁচিলের ওপারে বাগদীদের খোলার ঘর। ঝড়ে যদি ডাল ভাঙে তো ও ঘরে সব চাপা প'ড়ে মরবে। পঙ্কজিনী ভাবেন হোকনা বড়, যত বড় হয় হোক।

ভাদ্রমাসের দুপুর। ক'দিন আগেও ঢেলে বৃষ্টি হয়েছে। দু'দিন ধরে রোদ হচ্ছে চচ্চড়ে। এ বারান্দায় রোদ আসে বেলা দেড়টা থেকে দুটো পর্যন্ত। তারপর সূর্য চলে গেলে ছায়া পূর্ব গামিনী। তার আঁধারে ঢাকে লম্বা লাল

মেঝের বারান্দাটি। এখন এই ছায়ায় এসে বসবে দাসদের বিয়ে না হওয়া মেয়ে কাকলি, পালদের বউ মালতি, রায়দের ছোট তরফের বউ নন্দিতা, আরো কেউ কেউ। পঙ্কজিনীর সামান্য দিবানিদ্রা শেষ, বারান্দায় পা-ছড়িয়ে ব'সে একা চেয়ে আছে সজনে গাছের গায়ে। তুলো তুলো শুঁয়োপোকা চাক বেঁধেছে এবার বেশি। গুটি গুটি কখনো এসে উঠছে এই বারান্দাতেও, তা বাদে কুচি কুচি ব্যাঙের বাচ্চাও আছে। ভাদ্র-আশ্বিন না গেলে রেহাই নেই। সদর ঠেলে ঢুকল কাকলি, বছর তিরিশ বয়স হয়ে গেল মেয়েটার। বিয়ে হবে ব'লে মনে হয়না। এখন না হলে আর হবে কবে। এই বয়সের দশবছর বাদে তো সে বিধবা হয়েছিল।

কাকলির নামের সঙ্গে তার স্বভাবেরও মিল খুব, কথা বলতে আরম্ভ করলো আর থামতে চায়না। পরেছে ফুলছাপ দেওয়া ম্যাক্সি, ঢিলেঢালা। পঙ্কজিনী কাকলির এ রূপ দেখে অবাক, জিজ্ঞেস করল, 'কিনলি ?'

—না এটা বউদির, তবে এ রকম দুটো কিনলে হয়, কি বলো। কাকলি মেঝের উপর শরীর ভাঙল, কেমন মানিয়েছে ঠাকমা ?

পঙ্কজিনী স্মিত হাসে, 'বেশ, বেশ তো, তোরা তো পরবি এখন, শখ আহ্লাদ করবি, তা তোর বউদিকে আনলিনা ?'

মাথা নাড়ল কাকলি, রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবু বিবি এখানে এসেও গা শোঁকাশুঁকি না ক'রে থাকতে পারেনা ঠাকমা, কম দিনতো বিয়ে হলনা। গেল এখন সিনেমায়।'

কাকলির বড় ভাই হিরন্ময় থাকে কলকাতায়, ব্যাঙ্কের চাকুরে। তার কথাই হচ্ছে এখন। ওর চোখে যেন ঈষৎ আগুনের ফুলকিও ছাখে পঙ্কজিনী, তাই কথা ঘুরিয়ে দেয়। গাছটা কাটলে হতো, কত বড় হবে বল দেখি।

—লোক দেখব ? কাকলি জিজ্ঞেস করে।

—যদি পাঁচিলে প'ড়ে পাঁচিল ভাঙে। বাগদীদের ঘর ভাঙে ?

সাবধানে কাটতে হবে, কী শুঁয়া হচ্ছে ছাখো, এত বড় গাছ দেখতেও তো ভাল লাগে না, শুঁয়া গুলো যদি ঘরে ঢোকে।

কাকলির কথা শেষ হতে না হতে রায়দের ছোট তরফের বড় ছেলের বউ নন্দিতা তার কোলের পাঁচ বছরের রুগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে ঢোকে, 'কে কার ঘরে এসে ঢুকবে কাকলি ?'

কাকলি দুই ওষ্ঠ প্রসারিত ক'রে হাসল, 'কী যে বলনা তুমি বউদি, মুখের

কোন রাখ ঢাক নেই।'

—কেন ভুল বললাম কি, যা একখানা পরেছিস তোর ঘরেই না ভঁয়াগুলো দল বেঁধে ঢোকে, ফুলের বাগান হয়েছিস যেন।

কাকলি মসৃণ লাল মেঝের হাত ঘষে। এক্ষুণি একটা আয়না পেলে সর্বাঙ্গ দেখে নিত, কেমন ফুল ফুটেছে তার সর্বাঙ্গে। মেঝেয় হাত ঘষতে ঘষতে লাল ক'রে ফেলল হাতের তালু. তারপর বুকের কাছে ম্যাক্সির বাহারি লেসের গিঁট আলগা ক'রে ঢিলেঢালা হলো, একটু লজ্জারক্তিম গলায় বলল, 'বউদি এটা দিল আমাকে।'

—তাতো দিল, বরটা কবে এনে দেবে। বেটা ছেলে? নন্দিতার মুখ একটু আলগা। এই গঞ্জে দশবছর বিয়ে হয়ে এসেছে। এসেছিল যখন সুন্দর একটা আলগা শ্রী ছিল, মুখে কচি কচি ভাব ছিল, দশবছরে তিনটি বাচ্চা একটি মৃত সন্তান প্রসবের পর এখন সব শ্রী অন্তর্হিত। শরীর ভেঙেচুরে দরকচা মেরে গেছে। স্বামী থাকে মেমারিতে, ব্লক অফিসের কেরাণী।

কাকলি নন্দিতার হুল গায়েই মাখল না, বলল, 'যার যখন হবার হবে। আমার তাড়া নেই।'

—তাড়া নেই বললে তো হবে না, সময়েরটা সময়ে হওয়া দরকার, তোর বউদি বলছে কি। তার নাকি মাসতুতো না পিসতুতো····

কাকলি বলল, 'তোমার দেখি মাথা ব্যাথা বেশি, নিজের মত থাকনা।'

কথা ক্রমশ অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে তা বুঝতে পারে পঙ্কজিনী। নন্দিতা বড় একটা আসেনা, এলে কাকলির সঙ্গে ওর খটাখটি লেগে যায়। বয়সে তো খুব একটা তফাৎ নেই।

পঙ্কজিনী বলল, 'যা বলো কাকলিকে দেখাচ্ছে বেশ। তুই ও তো একটা এ রকম কিনে পরতে পারিস।

নন্দিতা জোর করে হাসল, তাতে মালিন্য অন্ধকারই বেশি, 'কী দরকার সিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকার, ঠাকমা বরং তুমিই পরো।'

নিঃশব্দে ফুলে ফুলে হাসল পঙ্কজিনী, 'তোর ঠাকুর্দা থাকলে পরতাম, হ্যাঁরে গাছটা নিয়ে কী করি বল দেখি, কী শুঁয়ো হয়েছে ভাখ।'

নন্দিতা বলল, 'কেরোসিন আর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দাও।'

নন্দিতার বছর পাঁচের রুগ্ন মেয়েটা মায়ের আঁচল চেপে পাথরের মত নিঃশব্দে ব'সে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। তাকে কোলে টেনে কাকলি

আবহাওয়া লঘু করার চেষ্টা করতেই মেয়েটা চিৎকার করে মাকে আঁকড়ে ধরল। পাঁচ বছরেই সে খুব খিটখিটে, প্রায় তার মায়ের মত। মেয়েকে এক হাতে টেনে নন্দিতা নিজের মনেই বলল, 'পাল বাড়ির ঝুমুরটা কত বড় হয়ে গেল।'

—কত আর বড় হলো। কাকলি কেন যেন প্রতিবাদ করে উঠল।

—কলেজ যাচ্ছে, আর বড় হলো না?

—কলেজ তো না, উচ্চ-মাধ্যমিক। বিড়বিড় করল কাকলি।

—ওই হলো, এই সেদিনের মেয়ে, আমার শাশুড়ি বলে কোলে করে আমার বিয়ের ক'বছর আগেও ঘুরেছে, বিয়ের সময় তো এই টুকুন।

পঙ্কজিনী মাথা হেলায়, 'হ্যাঁ, সেদিন হ'তে দেখলাম, ওর বাপ মার বিয়ের সময় তো আমি আমিষ ছুঁইনা।'

নন্দিতা বিড়বিড় করল, 'বিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

কাকলি মাথা নাড়ে, 'না তা হয়নি, ঝুমুরটা দেখতে বড়সড়ো।'

নন্দিতা তার কথায় বাধা পেয়ে একটু রেগে গেল, বলল, 'তাহলে বল এখন খুব তাড়াতাড়িই সবকিছু হচ্ছে, ঠাকমা যদি ছাখো মনে হবে যেন এই কাকলিরই এক দু'বছরের ছোট, শাড়ি পরলে তো মস্ত।'

কাকলি নিঃশব্দে মেঝেতে চেয়ে থাকে, খুব আস্তে বলে, 'তাইতো, কতই বা আর ছোট, আমিই বা কত আর বড়....

নন্দিতা শুনল কথাগুলো, কিন্তু সোজাসুজি জবাব দেয় না, বলল, 'আমার বিয়ের সময় কচি মুখে কী সুন্দর কথা বলত, গড়গড় ক'রে ছড়া বলত, তুইতো ওকে দিয়ে ছড়া বলাতিস কাকলি, অথচ এখন দেখলে কি মনে হয়। কী বাড়ই না বেড়েছে, যদি ঠাকমা তুমি ওর বুক ছাখো, কাকলির চেয়েও....।'

—চুপ করোতো, তোমার বর ওকে কোলে করে একদিন পাড়া ঘুরিয়েছে, কী সব বলছ। কাকলি মৃদু ধমকে ওঠে।

—সে তো তুই ও ঘুরিয়েছিস। নন্দিতা কায়দা ক'রে কাকলির কথায় কাকলিকেই যেন জব্দ করে।

—না, না আমি কবে ঘুরলাম?

—মনে ক'রে ছাখ।

—কি আর মনে করব, তুমি তো তখন এখানে বউ হয়ে আসনি।

—আমার শাশুড়ি বলছিল .. ....

কাকলি অন্ধ হতে হতে হঠাৎ যেন পরিত্রাণ পায় অন্যদিকে, চিৎকার করে ওঠে, 'ও ঠাকমা শুঁয়া শুঁয়া, ও বউদি তোমার মেয়ের গায়ে উঠবে।'

নন্দিতা খুব ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে। কুচুটে স্বভাব, তাই ওর উত্তেজনাও কম মেয়েকে টেনে নিজের কাছে সরিয়ে এনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মসৃণ লাল মেঝের তুলোর টুকরোর মত নিঃসঙ্গ একটি শুঁয়োপোকা উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে আসছে তাদের দিকে। সে কাকলিকে বলল, 'ঝেঁটিয়ে দে—'

কাকলি কথাটা শুনতে পায়না। সে নিচু হয়ে চলমান তুলোর টুকরোটিকে দেখছে স্থির দৃষ্টিতে। পোকাটা সত্যিই যেন নন্দিতার দিকে ঘুরছে। নন্দিতা নড়লো না একটুও নিচু হয়ে উঠোন থেকে একটা কুটো তুলে নিয়ে তা দিয়ে পোকাটাকে জড়িয়ে উঠোনে ফেলে দিয়ে বলল, 'তুই এমন চিৎকার করলি যেন শুঁয়া দেখিসনি, কচি খুকি।'

—আমার বাবা দেখলে গা কাঁপে। কাকলি বিড়বিড় করে।

—তোর দিকে তো যাচ্ছিল না। চাপা রাগে নন্দিতা বলে।

কাকলি নন্দিতার কথায় আমল না দিয়ে পঙ্কজিনীকে বলল, 'গাছটাকে কেটে দাও, ঠাকমা।'

—লোক নিয়ে আয়না, দিই একেবারে শেকড় সমেত।

নন্দিতা মাথা বাঁকায়, 'বরং ডাল কেটে ছোট করে দাও।'

পঙ্কজিনী নিঃশব্দে গাছের দিকে তাকায়। ডালে পাতায় আড়ে বহড়ে কী মস্তই না হয়েছে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে উঠোন ভরে ছায়া আলোর নক্সা নামায়। কেটে দিলে সব উধাও হয়ে যাবে। আকাশ খালি হয়ে ঠ্যাং ঠ্যাং করবে উপরটা। মায়া পড়ে গেছে, তাই কাটার কথা ভেবেও কাটা হয় না।

নন্দিতা আবার পুরোন কথায় ফেরে, 'শুনেছো ঠাকমা, ঝুমুর নাকি রায়দের ছেলে পিন্টুর সঙ্গে এখন ঘুরছে খুব, তুই জানিস কাকলি?'

কাকলি যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'ওমা তা কি করে হবে, ওতো এইটুকু মেয়ে, ওসবের ও কি বোঝে?'

—পিন্টুও তো এইটুকু ছেলে। নন্দিতা যেন উল্টে বলল। মাথা দোলাল কাকলি, না, না, পিন্টুর বয়স হয়েছে।

—পিন্টুর বয়স হলো আর ঝুমুরের হলো না? নন্দিতা রেগে বলল।

পঙ্কজিনী চুপচাপ। কথা তার কম আসে। শুনতে শুনতে যদি কিছু বলার মত হয় তবেই। কাকলি হঠাৎ তর্ক থামিয়েছে, তাই নন্দিতাও। দীর্ঘ লাল

বারান্দায় তিনজন এক এক দিকে চেয়ে। সজনে গাছটা ঝির ঝির পাতা নাড়ছিল, পাকা হলুদ পাতা টুপটাপ ঝরছিল মাটিতে।

কাকলি ফিসফিসিয়ে বলল, 'এ গাছটার খুব বাড়, তাই না ঠাকমা?'

—বয়েস তো হলো। অন্যমনস্কের মত পঙ্কজিনী জবাব দেয়।

—কত আর বয়স। এই সেদিন তো উঠোনে দাঁড়িয়ে লগি দিয়ে মা ফুল পেড়েছে। কাকলি বিড় বিড় করল।

—তোর মা কেন, তুইও তো। নন্দিতা যেন স্মরণ করালো।

—আমি আবার কবে। আমি তো দেখছি গাছটা এত বড়ই হয়ে আছে। পঙ্কজিনী নিশ্চুপ। শুনছে দুজনের কথার পিঠে কথা।

—তোর দেখি কিছুই মনে থাকেনা, ঝুমুর এইটুকুন হলো আর পিন্টু হলো খুব বড়। তা পিন্টু কি করে জানিস? নন্দিতা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল।

—কি আর করবে, চাকরি পাচ্ছেনা নিশ্চয়ই। কাকলি জবাব দেয়।

—ঝুমুরটা যে কি করল, ভাল বিয়ে হতো ওর।

—হবে, এখন কি বিয়ের বয়স হয়েছে বিয়ের কি কিছু বোঝে ও?

—যেমন তুই বুঝিস না। কথাটা বলে ফেলেই নন্দিতা শঙ্কিত হয়ে উঠল। কাকলি রেগে দু চার কথা না শোনায়। কিন্তু তা হলো না। ও পদ্ম হাতের রেখা দেখছে নিবিষ্ট হয়ে।

নন্দিতার স্বর এবার নরম, সে চাইছিল ঝুমুর আর পিন্টুর খবরটি রসিয়ে রসিয়ে শোনায়। তা শোনানোর জন্যই ওর এই আসা, কিন্তু কাকলি বার বার অগ্রাহ্য করতে চাইছে ওই ঘটনা। অথচ খবরটা তো মিঠে। ঝুমুর আর পিন্টুকে বাঁকুড়ার সিনেমা হলে কে যেন দেখেছে। কলেজে না গিয়ে নাকি সিনেমায় গিয়েছিল ঝুমুর পিন্টুর সঙ্গে। এরকম প্রায়ই যায়। এই নিয়ে পাল বাড়িতে খুব গোলমাল, ঝুমুরের বইয়ের ভিতরে পিন্টুর ছবি, চিঠি এমন ঘটনা এই লাল বারান্দায় ব'সে চুলচেরা বিচার না করলে, কোথায় করবে।

নন্দিতা বিড়বিড় করল, 'সেদিনের ছেলে সে দিনের মেয়ে, এই তো পিন্টু জলে ডুবে যায় যায়, তোর দাদা তুলল।'

—তাতে কি বয়স হিসেব হয়?

—না হোক। কিন্তু ওদের সাহস বলিহারি।

—সাহসের কী আছে, ভাইবোনের মত গিয়েছিল হয়ত সিনেমায়।

নন্দিতা বলল, 'তুই থাম দেখি, ভাইবোন শেখাস না।'

কাকলি বলল, 'বউদি ঝুমুরটা কত ছোট, ওর নামে এসব রটিয়োনা।'

—হ্যাঁ মায়ের কোলে ব'সে দুধ খায়। বিয়ে দিলে ছেলে মেয়ের মা হয়ে যেত। কাকলি বোকার মত বলল, 'তাই কি হয়। এই তো আমার দাদা বউদির হচ্ছে না।'

অবাক হলো নন্দিতা এক কথার অন্য জবাব শুনে, মেয়েটাকে টেনে কোলে বসায়; তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'সে ওদের একজনের গোলমাল আছে, না হলে সম্পক্কো হবে অথচ ছেলেপুলে হবে না, একী হয়, তোর বউদি তো আমার কাছে কম কথা বলেনি, সে বার কেঁদেছিল পর্যন্ত।'

—তুমি বললেই হবে। কাকলি রেগে উঠেছে।

নন্দিতার রাগও কম নয়, বলল, 'তোর বউদির কাছে জিজ্ঞেস করিস, বাদ দে, তোদের কারোর বয়স বাড়ে না, ঝুমুরের না অন্য কারোর, ও ঠাকমা দেন দেখি একটু কেরাচিনে ন্যাকড়া ভিজিয়ে, লাঠির মুখে লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই শুঁয়োগুলো।'

—এক্ষুণি পোড়াবি?

—হ্যাঁ এক্ষুণি।

পঙ্কজিনী উঠল। মেয়েটাকে মেঝেতে বসিয়ে নন্দিতাও। কাকলি চুপচাপ ব'সে ব'সে কী যেন ভাবছে। নন্দিতা উঠতে উঠতে বলল, 'তুই যা পরেছিস তা ঘরেই পরা যায়, বাইরে নয়।'

—তোমরা বিয়ে অলা মেয়ে তোমরা পার না, আমি পারি, আমি ঝুমুর। বলতে বলতে কাকলি যেন দুচোখে তীব্র বিষ হানে নন্দিতার দিকে চেয়ে।

নন্দিতা তখন লাঠির আগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিনে তা চোবাচ্ছে, বলল, 'ঝুমুরকে মানাতে পারে, কিন্তু তুই ...।'

কাকলি বলল, 'পুজোয় আমি তো এবার সালোয়ার কামিজ কিনব, তোমাদের তো ওসব পরার উপায় নেই।'

নন্দিতা জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। আকাশে হঠাৎ মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, নন্দিতা দেশলাই আর কেরোসিনে চোবান লাঠিটি নিয়ে উঠোনে নামল, বলল, 'হ্যাঁ এবার তাহলে ঠাকমাও পরবে। যার সারা জীবন বিয়ে হবে না সেও পরবে।'

কাকলি হুলটা যেন গায়েই মাখেনা। বলল, 'মেঘ আসছে, আচ্ছা ঠাকমা

তোমার মনে আছে ঝুমুর আর আমি একবার বিষ্টিতে খুব ভিজেছিলাম ওদের আম বাগানে, জ্বর এল আমার।'

পঙ্কজিনীর মনে থাকার কথা নয়, বলল, 'কবে ?'

—বউদি জানে, আমি আর ঝুমুর, বিষ্টিতে ভিজলে যে জ্বর হতে পারে তাও যেন জানতাম না।

নন্দিতা আগুন জালিয়েছে লাঠির আগায়। ঘুরে বলল, 'তা জানতিস না, কিন্তু জানতিস বাগানে কে একজন থাকবে তোর জন্য।'

কাকলি চট ক'রে ঘুরে তাকায়। নন্দিতা তখন আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছে সজনে গাছের গায়ে শুঁয়োপোকার চাকে, আগুনে পোকা ছটফটিয়ে পুড়ছে, পোড়াতে পোড়াতে নন্দিতা বলল, 'বনমালির বউ-এর বছর বছর বাচ্চা হচ্ছে। পাঁচটা মেয়ে, তবু লাইগেশন করাতে দেয়নি। তুই বেঁচে গেছিস ওই দৈত্যের হাত থেকে।'

কাকলি থর থর ক'রে কাঁপছে, খুব নরম জায়গায় ঘা দিয়েছে নন্দিতা, হাসছে খিল খিল করে। আগুন হাতে প্রদক্ষিণ করছে গাছটাকে। যেন গাছের চিতায় মুখাগ্নি করছে ঘুরে ঘুরে, পুড়িয়ে দেবে গোটা গাছই। আবার বলল, 'ও তোকে ছাড়ল কেন ?'

কাকলি কাঁপছে ভীষণ। চোখে ওর ঘৃণা। মাথা দুলছে। জুতসই কথা আসছে না মুখে। বনমালি আর তার সম্পর্কের কথা তো সকলেই জানত, অস্বীকার করবে কি করে জোর গলায়।

নন্দিতা বলল, 'ওই জন্যেই তো আমার ভয় হচ্ছে যদি ঝুমুরটার দশা ও তোর মত হয়ে যায় ফুর্তি ক'রে পিণ্টু পালিয়ে যায়।

চড়চড়িয়ে কালো দগ্ধ শুঁয়োপোকা গুলো গাছের গোড়ায় ঝ'রে পড়ছে, নন্দিতা বিড়বিড় করে, 'ঠাকমা দ্যাখো সব শেষ, কীভাবে পুড়ছে দ্যাখো ?'

—তুই ভাখ, আমার বাবা ভয় করে।

নন্দিতার মেয়েটা মেঝের পাছা ঘষতে ঘষতে বারান্দার ধারে আসে। বারান্দা খুব নিচু তাই পড়ার ভয় নেই। বাচ্চাটা আগুন আর গাছের খেলা দেখছে ভাবলেশহীন মুখে।

কাকলি এতক্ষণে একটু স্বাভাবিক। বলল, 'আমি আর ঝুমুর পিণ্টুকে ডেকে এনে গাছের ডাল কেটে ছোট ক'রে দেব ঠাকমা।'

নন্দিতার কাজ শেষ, মাটিতে লাঠিটা আছড়ে আগুন নেভায়, তারপর

বিজলিনীর চোখে তাকায় কাকলির দিকে, বলল, 'পিন্টু পারবে না, দুর্বল শরীর, শুধু সিগারেট আর চা খায়।'

—পারবে। কাকলি হঠাৎ রেগে ওঠে।

—ঝুমুরকে তাহলে বলিস, ও বললে পিন্টু তালগাছের মাথায়ও উঠবে ওই দুর্বল শরীর নিয়ে।

—দুর্বল কিনা তুমি তার জানো কি? চাপা গলায় কাকলি হিসহিস করছে।

হাসল নন্দিতা, 'আমি আর কি করে জানব, জানে ঝুমুর।'

কাকলি নিজেকে পরখ করছিল, ভারীবুক, বাহু, উপরি বাহু, গলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হাসল, 'না বউদি ঝুমুরও জানে না।'

—তবে কে জানবে। তুই যেমন জানতিস ওই বনমালির খবর তেমনি পিন্টুরটা জানে ঝুমুর।

নিঃশব্দে হাসল কাকলি, 'না তুমি যেমন জান দাদার খবর, কতটা শক্তি ধরে। আমিও তেমন জানি পিন্টু কতটা পারে।'

নন্দিতা অবাক, তার মুখে কথা সরছিল না, রাগ হচ্ছিল আধবুড়ি তার বয়সী মেয়েটার কৃত্রিম আদুরে গলা শুনে। বাচ্চাটাকে ঝট তুলে নেয় কোলে, তারপর কেমন ব্যঙ্গের স্বরে বলে, 'বড় যে অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছিস, ওতো তোর হাঁটুর বয়সী।'

—কে বলল?

পঙ্কজিনী আর না পেরে কাকলিকে ধরল, 'আয় দেখি তোর চুল বেঁধে দিই। এমন থাকিস কেন, বিনুনি কর দুটো।'

—চুল বাঁধতেই তো এলাম ঠাকমা, খোঁপা করে দাও, পিন্টুর আবার খোঁপা পছন্দ।

—কে বলল, ঝুমুর?

—তা তোমার দরকার কি, তুমি নিজেরটা সামলাওনা, ও বউদি, দাদা তো এখন হপ্তা হপ্তা আসেনা, খিদে মিটে গেল!

নন্দিতার কর্ণমূল লাল। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। বাচ্চাটাকে কোল থেকে আবার নামিয়ে দিল উঠোনে। মাথা নিচু হয়ে গেল তার। কাকলির কথা যেন ধারালো ছুরির মত কেটে কেটে বসে যাচ্ছে তার খসখসে চামড়ায়: মলিন মুখে, লালিত্যহীন শরীরে।

—৮

খিল খিল করে হাসল কাকলি এতক্ষণে যেন বাগিয়ে ধরেছে প্রতিপক্ষকে, বলল, 'এখন তো মাসে একবার আসে। এ হপ্তায় তো আসেইনি।'

নন্দিতা অপমানে কাঁপে। কাকলি মোক্ষম জায়গাটিতে ঘা মেরেছে। তার স্বামী যে এখন অন্য মেয়ে মানুষে আসক্ত, এ সত্য বহুজনের জানা। তা নিয়ে মাঝে মধ্যে নন্দিতা কম অশান্তি করে না। অশান্তি করলে লোকটা মেমারী থেকে আসাই বন্ধ করে দেয়। এখন সেই পর্ব চলছে। মাস পয়লায় এসেছিল সুশান্ত, আবার মাস শেষ হতে চলল, বাড়ি মুখো পা দেয়নি।

নন্দিতা একটু ধীর গলায় বলল, 'সব সময় তো আসতে পারেনা, বেটা-ছেলের তো কাজ থাকে।'

—বাহ্‌, রোববারেও কাজ, মেমারি তো দূরে নয় বউদি ; কলকাতা থেকে লোকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে, আর তোমার বর পারে না। বউ-এর সঙ্গে থাকতে হয় জানে না।

নন্দিতা লজ্জায় অপমানে ফুঁসে উঠতে চেষ্টা করল, 'কী জানে আর না জানে তা আমরা জানি, ছেলেপুলে গুলো কী আকাশ থেকে পড়ল।'

—কবে কি হয়েছিল, কবে ঘি খেয়েছিলে, সেই গন্ধ এখনো শুঁকছ ?

—সে খোঁজ আমি রাখবো নাতো অন্য কেউ রাখবে নাকি ?

—না, না তুমি খোঁজ পেলেই হলো, আর খোঁজ পাবেই বা কি করে, কী তোমার রূপের হাল হয়েছে বউদি, দাদাকে বাঁধতে পারছনা, গ্যাখো গিয়ে কী করছে মেমারিতে।

নন্দিতা শেষ কুটোটি ধরে বাঁচার চেষ্টা করে, মুখে কৃত্রিম হাসি আনে, 'আচ্ছা ঠাকমা, এ মেয়ের বিয়ে হয়নি, ও কী বুঝবে স্বামী-স্ত্রীর কথা, কখন আসবে না আসবে তাতো আমাদের হিসেব, হিসেব রাখতে হয় স্বামী-স্ত্রীর তা ও জানবে কি করে ?'

কাকলির মুখে যেন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, সে পঙ্কজিনীকে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হাসে, 'সারামাস কি বাদ থাকে তাতে ঠাকমা, আমরাও তো মেয়ে, আজকাল তো পুরুষ লোকেও জানে কখন আমাদের কী হয়।'

একথায় নন্দিতা ঝুঁকে পড়ে। সে দেখল বিধবা পঙ্কজিনীর ঠোঁটের কোণেও যেন বিচিত্র হাসি জেগে উঠছে ভাদ্রমাসের মানুষ পচানো ভ্যাপসা রোদ্দুরের মত। পঙ্কজিনী যেন আমোদ পায় কাকলির ইঙ্গিতে, কাকলির হুল ফোটানো কথায় নন্দিতার জ্বলনে। সে চাপা গলায় বলল, 'এখনকার কী সম্পর্কো তা

আমি জানব কি করে, তবে আমরা জানতাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কো তো শুধু বিছানাতে নয়, ছেলেপুলেকে না রেখে বাইরে পড়ে থাকে কেন ?'

নন্দিতার দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। কথাটা তার মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল, বিছানার সম্পর্কের কথা সে বলেছে, কিন্তু হক কথাটা তো বলে দিল বুড়ি পঙ্কজিনী। ছেলেপুলে তিনটে যেন অনাথের মত তাকে আঁকড়ে আছে সর্বক্ষণ, তাদের বাবা একরাত্তির এসে পরের ভোরে চলে যায়, সেও তো মাসে একবার। নন্দিতার মাথা লজ্জায় কষ্টে ঠুকে গেল রোদ বিহীন ঠাণ্ডা লাল বারান্দার মেঝের। থমথমে নৈঃশব্দে তিনজন বসে আছে তিন কোণে।

অনেকবাদে কাকলি একটু স্থির হলো। নন্দিতাকে সে প্রায় কামড়ে ধরেছিল যেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল অপমান করার প্রবল তাগিদে। সে আর নন্দিতা যেন একে অপরের পরিপূরক। পারলে কেউ ছাড়ে না। এখন নিঃঝুম নন্দিতাকে দেখে তার বুকটা হঠাৎ টনটন করে উঠল। মুখ নিচু করল সে। কথাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।

পঙ্কজিনী উঠে নন্দিতার রুগ্ন মেয়েটিকে হঠাৎ কোলে নিয়েছে। বাচ্চাটাকে দেখে তার ভিতরে সামান্য ব্যাথার ছোঁয়া যেন। নাড়ু দিতে হবে এর মুখে। তার কথায় রায়বাড়ির বউটি ঘা খেয়েছে বেশি। তার ঘরের অন্ধকার বাইরে টেনে বার করেছে সে আর কাকলি।

পঙ্কজিনীর কোলে উঠে নন্দিতার মেয়েটি হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'ও ঠাম্মা শুঁয়া শুঁয়া, শুঁয়াতে কী পরজাপতি হয় ?'

—কে বলল ? কাকলি মুখ তুললো।

নন্দিতার মেয়ে আবার চুপ। লাল বারান্দায় বিকেল ঘন হতে থাকে। শুঁয়ো পোকাটা উঠোন বেয়ে বারান্দার দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। আগুনের হাত থেকে সে কি করে বাঁচল, আশ্চর্য। বোধহয় পাখা মেলার জন্যই। নন্দিতাকে কাকলি দুহাতে ধরতেই সে রুদ্ধ কান্নায় আছড়ে পড়ল ছায়ায় ঢাকা মেঝেয়।

মালিকানা

দীপঙ্কর দাস

এখনো ভোর হয়নি ভাল করে। সবে মাত্র রাতের বাসি আঁধার সরে গিয়ে কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মতো ফ্যাকাশে আলো ফুটেছে। পশ্চিমের দেশে এমনিতেই এদিকে সূর্য উদয় হয় দেরিতে। আশালতার দেশ-গাঁয়ে যে সময়ে সুয্যি ঠাকুর দিকচক্র ঠেলে উঠে এসে ঘরদালান,উঠোন আঙ্গিনা আলোয় রাঙ্গিয়ে দিতেন, এখানে সেই সময়ে সুয্যিঠাকুর আধহাত ঘুমের নিচে তলিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম বেলা আন্দাজ করতে ভারি অসুবিধে হত আশালতার। সকালের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মেলে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের আঁধার দেখে সময় ঠাহর করতে বড় ভুল হয়ে যেত। মনে হতো বুঝি রাত এখনো পড়ে আছে বিঘৎটাক। আবার চোখ বুঁজে আধঘুমে তলিয়ে যেত আশালতা। তারপর জানলার কাঁচে সূর্যের প্রথম রশ্মির ছোঁয়া দেখে যখন বিছানায় হুড়মুড় করে উঠে বসত আশালতা তখন ঘড়ির কাঁটা সকালের সংক্ষিপ্ত অবসরের আধখানা পার করে ফেলেছে। ফলে আশালতার মাথায় তখন আকাশ ভেঙ্গে পড়ত। কর্তা অফিসে বেরুবে ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে আটটায়। দুই ছেলে, দুই মেয়ে—তারাও ততক্ষণে লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরুতে হবে সাড়ে নটায়। তখন আশালতা একার হাতে আর ক'দিক সামলাবে। অফিস স্কুলের ভাত, কর্তার এবং ছেলেমেয়েদের টিফিনের রুটি, তরকারি,—এরই ফাঁকে সকালের চা।—এতসব সামাল দিতে গিয়ে আশালতা তখন খাবি খেত।

মহীতোষ বলেছিল,—আমাগো ঢাকা শহরের সঙ্গে দিল্লী শহরের সময়ের তফাৎ কিন্তু অনেক। ঢাকায় যে সময়ে সূর্য ওঠে এখানে ওঠে একঘন্টা সোয়া ঘন্টা পরে। তাই সকালের আলো ফুটতে দেরি হয়। এই দিকটা কিন্তু খেয়ালে রাইখো।

খেয়াল তো রাখতেই হয়। দিল্লী শহরের ঘড়ির সঙ্গে ঢাকা শহরের ঘড়ি মেলাতে চাইলে কি এখন চলে? না, মেলাবার সেই অবাস্তব ইচ্ছাটাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা ভাবতে পারে আশালতা। ওপারে এক জীবন, এপারে আরেক জীবন। সময় এই দুই জীবনের মাঝখানে যোজন যোজন দূরত্ব সৃষ্টি

করে ফেলেছে। কষ্ট হলেও বর্তমানের এই বাস্তবতাকে একটু একটু করে মেনে নিতে শিখে গেছে আশালতাও।

সময়ের এই রসিকতাটা গ্রীষ্মের দিনে যেমন তেমন, শীত হেমন্তে যেন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। 'দেওয়ালি' গেল কি গেল না, ওমনি হুড়মুড় করে দিল্লীর আকাশে ছুটে আসে সিমলা পাহাড়ের ভাসা ভাসা মেঘ। সেই সঙ্গে হুল ফোটানো বাতাস। সেই বাতাসের কামড় সামলে শরীর ছাড়তেই শহরের মানুষেরও যেমন একটু বেলা খরচ হয়ে যায়, তেমনি সূর্যি ঠাকুরও সহজে আর দিকচক্র ঠেলে মাথা তুলতে চান না। ঘড়ির কাঁটা সাতটা সোয়া সাতটার ঘর পার হলে পর দেখা মেলে তার।

এ সময়টায় আলো ফোটার আগেই উনোনে আঁচ পড়ে আশালতার। তারপর রাতের বাসি কাপড় চোপড় বদল করে হেঁসেল ঘরে ঢোকা। ততক্ষণে মহীতোষও গায়ে খদ্দরের চাদর জড়িয়ে ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে দুধ এনে বাজার সেরে দাড়ি কামানোর আয়োজন করতে বসে গেছে। আর একটু পরেই চার ছেলেমেয়ের উঁচু গলার পড়া মুখস্থের পালা শুরু। অবশ্য সকালে আর কতটুকু সময় পায় পড়ার। বড়জোর ঘণ্টাটাক। তার পরেই তো স্কুলের জন্য দৌড়। ছেলে দুটোর স্কুল ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি। আর দুই মেয়ে—শ্যামাপ্রসাদ হায়ার সেকেণ্ডারি। দুটোই লাজপত নগর থেকে কম দূরের নয়। বাস ধরে স্কুলে পৌঁছতে পাক্কা এক ঘণ্টা যায়। আর স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। তারপর একটু জিরিয়ে জলখাবারটুকু মুখে দিয়ে আর কতটুকু বাকি থাকে রাতের? বই নিয়ে বসতে না বসতে ঢুলুনি এসে যায়। ছেলেমেয়েদের আর দোষ কি! দুবেলা বাস ঠেঙিয়ে এতদূর রাস্তা পেরিয়ে আসার পর শরীরে আর থাকে নাকি কিছু! তবু যদি স্কুলবাসের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু স্কুল বাস তো কল্পনার অতীত। বাসের মাসোহারা দিতেই গোটা সংসার বিকিয়ে যাবে।

এবারে নভেম্বরের শুরুতেই সিমলা পাহাড়ের দিক থেকে উত্তুরে বাতাস মার মার করে ছুটে এসেছে দিল্লী শহরের ওপর। সিমলা পাহাড়ে নাকি ক'দিন বরফ পড়ছে খুব। তারই জের টানছে দিল্লী শহর। সারাদিন আকাশ যেন ইস্পাতের রঙ ধরে আছে। সেই সঙ্গে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও। ফলে বাতাস বড় ধারালো। একবার শরীর ছুঁলো কি ছুঁলো না অমনি একেবারে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। সারা শহরে এখন নাকি একটাই আলোচনা,—

নভেম্বরেই যখন এই অবস্থা, তখন এবারের পৌষ মাষে না জানি কত ঠাণ্ডাই পড়বে।

হেঁসেল ঘরে ঢোকার আগে ছোট ছেলে দেবতোষকে কয়েকবার তাড়া দিল আশালতা। রাতে শুতে যাওয়ার আগেই দেবতোষ পই পই করে আশালতাকে বলে রেখেছিল,—ঠিক ছ'টায় তুলে দিও মা। সকালেই ছুটতে হবে স্কুলে। প্যারেড আছে। একটু দেরি হলে পি. টি. স্যারের হাতের বেতের বাড়ি পড়বে গুনে গুনে চোদ্দটা।

এই এক চণ্ড শুরু হয়েছে ক'দিন। সকাল আটটায় স্কুলের মাঠে প্যারেড। সামনে চোদ্দই নভেম্বর। প্রধানমন্ত্রী নেহরুজির জন্মদিন। এই দিনটাকে নাকি ভারত সরকার এ বছর থেকে 'বাল দিবস' নামে চিহ্নিত করেছে। নেহরুজির অন্তরে নাকি 'শিশু প্রেমের' সুধারস সদাই প্রবহমান। সেই শিশুপ্রেমী প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনটায় বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীরা আনন্দ-উৎসব করবে না তো আর কে করবে ?

তাই দিনটাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করার জন্য সারা দিল্লী শহরের আশি শতাংশ স্কুলই তৈরি হচ্ছে তাদের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে। সরোজনী নগরের মাঠে শহরের দক্ষিণ এলাকার স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এসে জমায়েত হবে। ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে বুকের স্নেহ সুধা ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্বয়ং পণ্ডিতজি আসবেন। কম কথা নয়।

দুই

দেবতোষের বয়স যখন ছ'য়, দেশের স্বাধীনতার মূল্য চুকোতে দাদা দিদিদের সঙ্গে বাবা-মার হাত ধরে পৈত্রিক ভিটে-মাটি, ঘর-বসতি ফেলে রেখে প্রাণের দায়ে ভিন দেশে রওনা দিতে হয়েছিল। দেশ গাঁ ছেড়ে চলে আসার পর প্রথম ক'দিন কেটেছিল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। তারপর একদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ডাকে মহীতোষ তার পরিবার নিয়ে রওনা হয়েছিল খোদ রাজধানী দিল্লী শহরে। সেই শ্যামাপ্রসাদজীর চেষ্টা-তদ্বিরে কেন্দ্রের ওয়ার্কস অ্যাণ্ড হাউজিং মন্ত্রণালয়ে একটি চাকরি জুটে যায় মহীতোষের। সে টুকুকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে গোটা পরিবারটা।

ছ'বছর বয়সটা এমন কিছু নয়। স্মৃতিও এখন তেমন ভার সহনশীল হয়ে ওঠেনি। ফলত দেবতোষের কাছে এখন আর মহীতোষ কিংবা আশালতার

মতো 'দেশ-গাঁ'-এর কোন স্মৃতি বেঁচে নেই। তার কাছে এই দিল্লী শহরটাই প্রত্যক্ষ। এখানেই বড় হয়ে উঠেছে দেবতোষ। দেখতে দেখতে বছর ছয়েক কেটেও গেল এই শহরে।

তবু মস্ত এক হেঁয়ালির মতো আজও একটা প্রশ্ন দেবতোষকে ঘিরে আছে। দেশটা ভাগ হলো কেন মা? আর আমাদের দেশটাই বা কেন পররাজ্যে চলে গেল? এমন কিছু জটিল প্রশ্ন আশালতাকে করে বসে দেবতোষ। বেচারা আশালতা তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে এমন সব প্রশ্নের জবাব দেবে কেমন করে? তবু বলে, সবই অদৃষ্টরে, সব অদৃষ্ট। কপালে ল্যাখা না থাকলে পরে বাংলা ছাইড়া এই পোড়ার দেশে মরতে আসি? আত্মীয় নাই, স্বজন নাই—একবার চক্ষু বুঁজলে কেউ টেরই পাইবো না।.... এর চেয়ে ঢাকায় পইড়া থাইকা প্রাণ দেওয়াও ভাল ছিল।

বেচারা দেবতোষ। আশালতার আক্ষেপ শুনে কতটুকু হেঁয়ালি থেকে মুক্ত হয়, সেই জানে। এই যেমন একদিন ক্লাশের সহপাঠী অরবিন্দ কোহেলি বলেছিল দেবতোষকে—ইয়ে শালা রিফিউজি লোগ হিন্দুস্তান কি নসিব বরবাদ কর দিয়া। আজাদী কা সারা মজা বরবাত কর দিয়া। শালে লোগ ফ্রেফ লেনে শিখা হ্যায়। ঘর দেও. মকান দেও, জমিন দেও, নোকরি দেও। য্যাসে কি রিফিউজি লোগ হিন্দুস্তান কি দামাদ বনকর আয়ে হ্যায়।

তা কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। অরবিন্দ কোহেলির চোখে রিফিউজিরা ভারত সরকারের জামাই বলে মনে হলে খুব একটা দোষ দেওয়ার নেই। বেচারা রিফিউজি বলতে তো পশ্চিম পাকিস্তান আর সিন্ধু অববাহিকার মানুষদেরই চেনে। ভারত সরকার তাদের জামাই আদরে বরণ করেছেন। এই যে গোটা লাজপত নগর-এর কথাই ধর না কেন। সমস্ত লাজপত নগর জুড়ে কত যে দোতলা বাড়ি উঠেছে, ইয়ত্তা নেই। এক একটি দোতলা বাড়ি ভারত সরকার উপহার দিয়েছেন ঐ পশ্চিম পাঞ্জাব ফেরত রিফিউজিদের। ব্যাপার স্যাপার দেখলে চোখ আপনা থেকেই ট্যারা হবার জোগাড়।

সেই রকম এক রিফিউজির দোতলা বাড়ির এক তলায় ভাড়া আছে দেবতোষরা। এক রিফিউজির বাড়িতে আর এর রিফিউজি পরিবার ভাড়ায় আছে,—এও যেন এক হেঁয়ালি। এসব কারণেই হয়তো একদিন মহীতোষ রাতে খেতে বসে বলেছিল,—ভারত সরকারের আচরণটা দেখলো। পশ্চিম পাকিস্তান থিকা আসা এক একটি রিফিউজি পরিবার পিছু এক একখানা

কইরা দুই তলা বাড়ি দিল সরকার। আর পুব-বাংলার রিফিউজিগো দেখাইয়া দিল আন্দামান। দণ্ডকারণ্য, মালকানগিরি, সানাক্যাম্প। সৎমা আর কারে কয়!

শুনতে শুনতে দেবতোষের চোয়ালের নিচে ব্যথা টনটন করে উঠেছিল।

পাঞ্জাব আর দিল্লী,—মাঝখানের ব্যবধান আর কতটুকু? পিঠে পিঠে দুই জায়গা। আবহাওয়া-জলবায়ু থেকে শুরু করে সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-বিচার সবই তো বলতে গেলে একই। ভাষারও দূরত্ব তেমন নেই সেখানে। লাহোরের মানুষ এসে দিল্লীতে পুনর্বাসন পেয়ে গেল। এ যেন আদৌ দেশত্যাগ নয়—উদ্বাস্তু হওয়াও নয়। কেবল একই বাড়ির একঘর ছেড়ে আর এক ঘরে গিয়ে শয্যাপাতা। আর সেখানে মহীতোষকে ভেসে আসতে হলো এই সুদূর দিল্লি শহরে। ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষজন, আচার-বিচার আলাদা, সমাজ-সংস্কৃতির মিল নেই কোথাও। এমন এক জায়গায় এক রিফিউজি-বাড়িওয়ালার কাছে আশ্রয় ভাড়া নিয়ে দিন কাটছে কোন রকমে।

অরবিন্দ কোহেলিকে দেবতোষ বলেনি যে তারাও রিফিউজি। বাঙালি রিফিউজি। বলে নি লজ্জায়। অরবিন্দের চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।

তিন

কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে। কুলদীপ চাচা—মানে দেবতোষের বাড়িওয়ালা—সরকারি দাক্ষিণ্যে যিনি এখন খোদ দিল্লি শহরের বুকেই একটি দোতল বাড়ির মালিকানা উপভোগ করছেন,—ক'দিন ধরে চূড়ান্ত অশান্তি শুরু করে দিয়েছেন। দু'ঘরের একতলাটা মহীতোষ ভাড়া নিয়েছিল মাসিক আশি টাকায়। শর্ত ছিল বছর বছর শতকরা দশটাকা হারে বৃদ্ধি পাবে বাড়ি ভাড়া। এটা সেই উনপঞ্চাশ সনের কথা। এর মধ্যে পাঁচ বছর গেছে। ষষ্ঠ বছর শুরু হয়েছে। ভাড়াও এসে দাঁড়িয়েছে একশো কুড়িতে। প্রতিমাসের তিন তারিখে বাড়িওয়ালা কুলদীপ চাচা এসে দাঁড়ায় মহীতোষের সামনে। কুলদীপ চাচার প্রসারিত হাতে ঐ একশো কুড়ি টাকা গুনে দিতে হাত কাঁপে মহীতোষের। মাসান্তে ক'পয়সা আর মাইনে পায় মহীতোষ। তার থেকে বাড়ি ভাড়া বাবদ চলে যায় একশো কুড়ি। তারওপর আছে বিদ্যুতের বিল। চার ছেলেমেয়ের সংসার। দিল্লির মতো বাদশাহী শহরে মাইনের বাকি টাকায় সংসার টানতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে আসে। ঘরে ছেলে-মেয়েদের

জন্য না একটু মাখন, না একটু ঘি। বছরে একবার করে দুই সেট মোটা কাপড়ের সস্তাদরের জামা কেনা হয় শুধু। তা-ও স্কুল য়ুনিফর্ম-এর প্রয়োজন মেটাতে। আশালতার গায়ে দেশভাগের পরে কোনদিন সবুজ পাড়ের এগারো হাতি মিলের শাড়ি ভিন্ন আর কিছু তুলে দিতে পারে নি মহীতোষ। বাজারে গিয়ে লোভনীয় খাদ্যবস্তু দেখে কেনার জন্য বুকের ভেতরে পদ্মার গাঙ উথলে উঠলেও দক্ষ দাঁড়ির মতো সামলে নিতে হয় ইচ্ছেটাকে।

এই যখন অবস্থা তখন বাড়িওয়ালা কুলদীপ চাচা রোজ একবার করে হুঙ্কার ছাড়ছেন—মকান খালি করো। নেহি তো মাহিনা সে চারশো রূপাইয়া কিড়ায়া দেও।

চারশো সংখ্যাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করল মহীতোষ যেন এই জীবনে কোনদিন সংখ্যাতত্ত্বের এই অঙ্কটার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। দেড়শো নয়, দুশো নয়—এক লাফে চারশো। ঠাট্টা করছেন না তো কুলদীপ চাচা।

ঠাট্টা যে নয় অল্প দিনের মধ্যে পরিষ্কার করে দিলেন কুলদীপ চাচা। প্রথমে জলবন্ধ। তারপর লাইট। দিল্লি শহরের সেই দিন কি আর আছে? এটা ইংরেজির চুয়ান্ন সন। দেখতে দেখতে খোল নলচে পাল্টে ফেলেছে শহর। বাদশাহী সীমানা ছাড়িয়ে ঝড়ের বেগে হু হু করে লম্বায় চওড়ায় বেড়ে চলেছে শহর। তেমনি বেড়ে চলেছে বাসস্থানের সঙ্কটও। এর ওপর দিল্লিতে বসতে চলেছে এশিয়ান গেমস-এর আসর। সেই সুবাদে শহরকে রাঙিয়ে তোলার জন্য বন্যার মতো টাকার স্রোত বইছে শহরের রাস্তায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র সাত বছরের মাথায় রাজধানীতে এশিয়ান গেমস'-এর মতো রাজসূয়ো যজ্ঞের আসর বসিয়ে নেহরুজি নাকি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেবেন ভারত কত দ্রুত নেতৃত্বে সাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

দেখে শুনে মহীতোষ বলেছিল একদিন, একখান খেলার তামাশা করনের জন্য সরকার বাহাদুর যে টাকা ঢালতাসে সেই টাকায় পুব বাংলার উদ্বাস্তু গো বাংলাতেই পুনর্বাসন দেওন যাই তো।... কথা তো নয় যেন পাথর চাপা জল স্রোতের রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণার ক্ষণিক প্রতিধ্বনি।

কিন্তু এতো গেল নেহরুজির বিচার। সরকারি কোষাগারে হাত দেবে সাধ্য কি মহীতোষের। কিন্তু সেই কোষাগারের ডানা খুলে 'এশিয়ান গেমস'-এর নামে যে হারে ঝাঁক ঝাঁক সাদা পায়রা শান্তির বার্তা নিয়ে দিল্লির আকাশে সাঁট খেতে খেতে বিশ্ববাসীর কাছে ভারত সরকারের ভাবমূর্তির ওপর গর্জন

তেলের পালিশ চড়াচ্ছে, তার ঠেলায় শহরের বাড়ি ভাড়ার পারদ স্তম্ভও চড় চড় করে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। ফলে এক কালের বাস্তুহারা কুলদীপ চাচাও জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা শুরু করেছেন। একবার এই বাঙালি রিফিউজি পরিবারটিকে উৎখাত করতে পারলেই মোটা টাকার অ্যাডভান্স, সঙ্গে চড়া দরের ভাড়া,—দুই মিলে যাবে চোখের পলকে।

তাই নভেম্বরের ভাড়া নিতে এসে কুলদীপ চাচা সাফ জানিয়ে গেলেন,—ইস মাহিনাকে চৌদ্দ তারিখকা অন্দর মকান খালি করনে পড়ে গা বাঙালি বাবু। আমার নতুন পার্টি মকান কিরায়া নিয়েছে পনেরো তারিখ থেকে।

মহীতোষ যেন সমুদ্রে আছড়ে পড়ল। সারা বাড়ি থমথমে স্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। আশালতার মুখে কালি লেপা। একে জল দেয় না। লাইটের তার কেটে দিয়েছে। তার ওপর এই কি সর্বনাশা কথা শুনিয়ে গেলেন বাড়িওয়ালা। এ যেন বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ নয়, ফাঁসির পরওয়ানা শুনিয়ে দিয়ে গেলেন।

দেবতোষ দাদার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, হ্যাঁরে দাদা, কুলদীপ চাচাও তো রিফিউজি। তাহলে আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন কেন?

—কুলদীপ চাচা রিফিউজি ছিলেন। এখন নয়। এখন মালিক। একটা বাড়ির মালিক। ধরা গলায় সাড়া দিল দেবতোষের দাদা।

—সামান্য একটা বাড়ির মালিকানা কুলদীপ চাচাকে এমন বদলে দিয়েছে? আমাদের অসুবিধের কথা ভাবছেন না একেবারে?

—মালিকানা মাত্রই মালিকানা। মালিকে মালিকে কোন তফাৎ হয় না। সাড়া দিল দেবতোষের দাদা।

—তা হলে আমরা এখন কোথায় যাব? কে আছে আমাদের এই শহরে?

—কি জানি।

চার

সরোজনী নগরের মাঠে শহরের দক্ষিণ এলাকায় ষোলটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা আজ যেন উঠে এসেছে। সকাল আটটার ঘর-ও পার হয়নি, এর মধ্যেই আয়োজন সব সম্পূর্ণ। দেবতোষরা পর পর তিন সাড়িতে দাঁড়িয়ে। পি. টি. স্যারের ব্যস্ততা ভীষণ। হাত দুটো দু-পাশে টান টান করে ঘোরাতে ঘোরাতে পি. টি. স্যারের মুখে মন্ত্রোচ্চারণের মতো উচ্চারিত হয়ে চলেছে—সার্কেল।

সার্কেল, হাফ সার্কেল। এগেইন সার্কেল, সার্কেল ...।

পঞ্চনদের পারের মানুষ পি. টি. স্যার। নর্দান কমাণ্ড-এ আর্মি কমিশণ্ড অফিসার ছিলেন। অবসর নিয়ে এখন দেবতোষদের স্কুলের পি. টি. স্যারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ফলত শৃঙ্খলাই যে জীবন এমন অমোঘ বাণী শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে পড়ছে তাঁর চাল চলনে, চোখ-মুখের পাথুরে দৃঢ়তায়।

তবু পঞ্চনদের দেশের মোটা জিভে 'সার্কেল' এর উচ্চারণ কখন যে কির্কেল হয়ে যায় নিজেই টের পান না। নিজের অজান্তেই পি. টি. স্যার বলে যান,— কির্কেল, কির্কেল, হাফ-কির্কেল,...। এরপর পেট ঠেলে উঠে আসা হাসির দমকটাকে পেটের ভেতর ধরে রাখাই এক অগ্নি পরীক্ষা।

একে অসময়ের শীত, তার ওপর বাঙাল দেশে জন্ম—দেবতোষের শরীরটা যেন আর শীতের কামড় সইতে পারছে না। সেই সঙ্গে মনের ভেতর পাহাড় প্রমাণ ব্যথা। বয়স বারো হলে কি হয়, দেবতোষের মন যে বাহাত্তর বছরের মতো ঝুনো হয়ে গেছে। সংসারের বিপন্ন অবস্থা তার মনকেও ভাবায়। আজ ক'দিন ধরে বাবা যেন ক্ষ্যাপা কুকুর। কি খোঁজাটাই না খুঁজল। সারা দিল্লী শহর, শহরতলি—কোথাও বাদ রাখে নি। সকাল সাড়ে আটটায় অফিসের কাজের জন্য বাড়ি ছাড়ছে। তারপর ছুটি হতে না হতেই বাড়ি খোঁজার পালা। চাঁদনি চক, দরিয়াগঞ্জ পাহাড়িগঞ্জের বস্তি এলাকা থেকে করলবাগ, রথকরোড—সারা শহরকে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম—বাদ রাখছে না কিছুই। ফলে প্রতিদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত নটা, দশটা।

তখন আর মানুষটার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। মানুষতো নয়, যেন হৃতসর্বস্ব এক আর্ত হৃদয়,—প্রতি শ্বাসে হাহাকার ঝরে পড়ছে। এর চেয়ে কলকাতার ফুটপাথই বোধহয় ভাল ছিল। ভালছিল কলকাতার ফুটপাথে আরো অসংখ্য অজস্র উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মপরিচয় ভুলে থাকা। তাতে আর যাই হোক এভাবে একক বিপন্নতায় ডুবতে হতো না।

মহীতোষ বাড়ি ফেরার পর মোড়ার ওপর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকছে। দাদা দিদি, দেবতোষ—সবাই ঘরের দরজায় ছায়ার মতো এসে দাঁড়াচ্ছে। দেখছে তাদের বাবাকে। আশালতা একসময় ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়া নভেম্বরের আর্দ্র হিমে গলা ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করে,—হইলো কিছু? পাইলা কোন বাড়ি? মহীতোষ যন্ত্রের মতো মাথা নাড়ে,—না। মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—কৈ পামু বাড়ি? এইটা কি ঢাকা শহর যে আমাগো মতো

মানুষদেরও আশ্রয় দেওনের জন্য বুক বিছাইয়া রাখছে?

—তাইলে হইবো কি? চোদ্দ তারিখটাতো ঘাড়ের ওপর আইসা পড়ল। আশালতার গলায় দ্বিতীয়বার ঘরছাড়া হওয়ার ত্রাস রাতের নির্জ্জনতাকে আরো অসম্ভব অবাস্তব করে দিয়ে যায়।

—জানি না। কপালে কি ল্যাখা আছে জানি না।

যে ঠিকানায় গিয়ে হাজির হচ্ছে মহীতোষ সেই ঠিকানা থেকে ফিরতে হচ্ছে তাকে চূড়ান্ত বিদ্রুপ নিয়ে।

মহীতোষের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতাটা শুনে অতি নগণ্য বাড়িওয়ালা পর্যন্ত ফিক করে হেসে জবাব দিচ্ছে, নেহি জি নেহি। স্রেফ একশো বিশ রূপাই কি আন্দার ইহা মকান কেয়া, এক ঝোপড়ি ভি নেহি মিলেগা। আপ যাইয়ে পুরানা কিল্লামে। উঁহা কুছ কুছ নাঙ্গা আদমি শেল্টার লিয়া হ্যায়।

এসব শুনতে শুনতে বড়দি দরজার পাল্লার আড়ালে মুখ আড়াল করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। মেজদি দুম্ দুম্ শব্দে পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে খিড়কির দরজা খুলে পাঁচ নম্বর কালভার্ট-এর ওপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কোন অজানা জেদ এবং অভিমান নিয়ে। বড়দা নিচু গলায় দেবতোষকে বলছে, বাবা বড় কম মাইনে পায়। এই মাইনের চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে এতোদূর চলে আসাটা বোধহয় ভাল হয় নি।

আজ চোদ্দই নভেম্বর। বাল দিবস।

লাইনে দাঁড়িয়ে দেবতোষ প্রতীক্ষায় আছে কখন সামনের বিশাল মঞ্চে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উঠে আসবেন। মাইকে বেজে চলেছে ইকবাল সাহেব।

—সারে যাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা হামারা…।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী এলেন। সমস্ত সরোজনী নগরের মাঠের ওপর নেমে আসা শীতের হিম পাথরের দেয়ালে চিড় ধরিয়ে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল,—প্রধানমন্ত্রী জি কি…!

পি. টি. স্যারের মুখের বাঁশি সক্রিয় হয়ে উঠল। যন্ত্রবৎ হাত দুটো সচল হলো।—কির্কেল, কির্কেল, হাফ কির্কেল…। হাত ঘোরাতে ঘোরাতে দেবতোষের দুই কাঁধ ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম। তবু ঘুরিয়ে চলে। দেবতোষ ঘুরিয়েই চলে।

পাঁচ

দেবতোষ বাল দিবসের স্ফূর্তি ষোল আনা উপভোগ করে যখন বাড়ি ফিরে

এল, তখন বাড়িতে দক্ষ যজ্ঞ কাণ্ড বেঁধে গেছে। হেমন্তের বেলা এমনিতেই একটু ঝিমিয়ে থাকে। তার ওপর আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার হয়েছিল। মেঘে মেঘে ঢাকা। তাদের কানে বোধহয় বাল দিবসের বার্তা পৌঁছায় নি। ফলে মুখে ফুর্তির হাসি ফোটানোর কোন গা ছিল না।

ঘরের ভেতরে চারসঙ্গী নিয়ে কুলদীপ চাচা তখন মত্তহাতি। শুঁড় ফুলিয়ে গর্জন করছেন, লাফাচ্ছেন। আর মহীতোষ সামনে হাত জোড় করে বলে চলেছে,—আর কটা দিন সময় দিন সিংজি। অন্ততঃ মাসের বাকি কটা দিন সবুর করিয়ে। কালী মা কি দিব্যি, সামনের মাসে যেমন কইরা হউক আপনার বাড়ী খালি করকে দেগা।

—চোপ শালা বাঙ্গালী রিফিউজি! আউর এক মিন্ট্ ভি নেহি। মকান ইস বখৎ খালি করো। গলাতো নয় যেন আকাশে জমা মেঘের নিচে চাপা পড়া মেঘ গর্জন।

গর্জন মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কুলদীপ চাচার চোখের ইশারায় সঙ্গের চার দেবদূত সদৃশ সঙ্গী বাড়ির ভেতর ঢুকে এক এক করে খাট-বিছানা, চেয়ার টেবিল, চৌকি-চারপাই, রান্নাঘরের হেঁসেল-পাতি, হাঁড়ি-কড়াই, হাতা-খুন্তি, কৌটো-কাটা · সব কিছু বাইরের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করে দিল।

মহীতোষ এখনো জোড় হাত করে কুলদীপ চাচার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে শিশুর মতো কাকুতি মিনতি করে যাচ্ছে,—আর কেবল কটা দিন। আউর কুছদিন সাহেব..। এইভাবে খেদাইয়া দিও না। এইভাবে বিছানাপত্তর ফেইলা দিও না ভাই।...ভাইরে আমার তুমিও একদিন বাস্তুহারা হইছিলা, ভাই গো, তুমিও একদিন ঘর ছাড়া হওনের ব্যথা, যন্ত্রণা, অপমান সইছিলা। ভাইরে আমার....। বলতে বলতে পঁয়তাল্লিশ বছরের মহীতোষ শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

ছয়

মাত্র ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। এর মধ্যেই চুকে গেল সব কিছু। রাস্তায় স্তূপাকার হয়ে আছে চারপাই চৌকি আলনা, রান্নার সাজ সরঞ্জাম। হাঁড়ি ভর্তি ভাত কাত হয়ে ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়। ডালের বাটি থেকে ডাল গড়িয়ে গিয়ে রাস্তার কিছু অংশ কাদা কাদা হয়ে গেছে। মাছের ঝোলের কড়াই থেকে ঝোল ছিটকে গেছে হাত সাতেক তফাতে। গোটা কয়েক কাক, চারটে নেড়ি কুকুর এবং তিনটে মেনি বেড়াল মহা আনন্দে রাজসিক ভোজ সাঙ্গ

করে তৃপ্তির সঙ্গে জিভ চাটতে চাটতে এক সময় ফিরে গেল।

মেঘে মেঘে বেলা কম হয়নি। আশালতা তার দুই মেয়েকে নিয়ে রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার সাধের ঘর-কান্নার সাজ সরঞ্জাম এক এক করে তুলে এনে গুছিয়ে রাখছে রাস্তার ঢালে পরিত্যক্ত এক সমাধির ওপর। ভাঙ্গা সমাধির চারধারে বেড়ে ওঠা আগাছার স্তূপের ভেতর দু-চারটে গাঙ ফড়িং ফরফর করে উঠল। গোটা কয়েক প্রজাপতি উড়ে এলো কোথা থেকে যেন। যারা মজা দেখতে রাস্তায় জমা হয়েছিল তারা সবাই চলে গেছে বহুক্ষণ আগে। এখন পরিত্যক্ত শ্মশানের মতো রক্ত হিম করা স্তব্ধতা ছেয়ে আছে চারদিকে।

মহীতোষ তখনো রাস্তায় হামা দিয়ে চলেছে। যেন ঘর-গেরস্থালির কোন সামগ্রী নয়, খুব গোপন একান্ত মহার্ঘ এবং অনিবার্য কোন সম্পদ বুঝি কুলদীপ চাচা মহীতোষের বুকের কুঠুরি থেকে তার চার সঙ্গীদের দিয়ে টান মেরে ঐ রাস্তার ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। মহীতোষ এখন সেই সম্পদ রাস্তার হামা দিয়ে ধুলো সরিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাচ্ছে না। কিছুতেই পাচ্ছে না।

আশালতা দেবতোষের পাশে এসে দাঁড়াল। দাদা দিদিরাও এক এক করে দেবতোষের গা ঘেঁষে প্রেতমূর্তির মতো সরে এলো। তাদের পেছনে কোন দূর অতীতের মোঘল যুগের কোন এক আমীর কিংবা ওমরাহের পরিত্যক্ত সমাধি—যার ভেতর জায়গা নিয়েছে আশালতার ঘর-কন্নার সামগ্রী। আর তাদের রাস্তার ওপর হামা দিচ্ছে মহীতোষ। হামা দিয়ে রাস্তার ধুলো সরিয়ে সরিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন কিছু একটা যা হারিয়ে ফেলে মহীতোষ বোধহয় এই জীবনে আর কোন দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেনা।

আশালতা এক সময় দেবতোষের কানে চাপা গলায় বলল, তগো বাপরে উইঠা আইতে ক। রাস্তায় আর কিছু নাই। খোজনের কিছু নাই আর।

দেবতোষ দু-পা এগুলো। চড়াই ডিঙিয়ে রাস্তায় উঠে এলো। একেবারে মহীতোষের সামনা সামনি দাঁড়াল। ডাকল,—বাবা!

মহীতোষ মুখ তুলে তাকাল। চোখাচুখি হলো দেবতোষের সঙ্গে। দেবতোষের বুকের ভেতর শিরাগ্রন্থী মুচড়ে উঠল। কী চোখ হয়েছে মহীতোষের। যেন আরাবল্লী পাহাড় ডিঙিয়ে গোটা মরুভূমিটাই এসে জায়গা নিয়েছে তার দুই চোখে।

—কিরে? মহীতোষের গলা কাঁপল।

—মা তোমাকে ডাকছে।

—তর মা কৈ?

—ঐ যে। দেবতোষ আঙুল তুলে সমাধির দিকে নির্দ্দেশ করল।

দেখল মহীতোষ। দেখল তার স্ত্রীকে। দেখল তার আর পুত্র কন্যাদের। যেন রক্ত মাংসের মানুষ নয় তারা। কোন অশুভ প্রেতাত্মার তাড়নায় কোণ ঠাসা হতে হতে এখন নির্বাক প্রস্তর খণ্ডের মতো পরিত্যক্ত এক সমাধির আড়ালে এসে জায়গা নিয়েছে। আর বোধ হয় পিছু হঠার মতো এক সুতো জায়গা নেই কোথাও। এক পা পিছলেই সমাধির অতলে এলিয়ে যাবে তারা।

ছ বছর হয়ে গেছে। ছ বছর আগে সেই সুদূর ঢাকা থেকে যে প্রেতাত্মা তাড়িত করছিল, মাঝখানে দুদিন থিতু হতেই মহীতোষ এবং তার পরিবার হয়তো ভুলে গিয়েছিল সেই প্রেতাত্মার অস্তিত্ব। কুলদীপ চাচা আজ সে কথা আবার মনে করিয়ে দিলেন।

—চল····ঐখানেই চল। মহীতোষ দেবতোষের কাঁধে হাত রেখে রাস্তার ঢাল বেয়ে নামতে লাগল।

তখন দূরের রিং রোড দিয়ে 'বাল-দিবসে'র পালা সাঙ্গ করে দক্ষিণ দিল্লীর কোন বনেদী স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল বাস বোঝাই করে ফিরে আসছিল। তাদের সকলের উচ্চস্বরের কোরাস গড়িয়ে এলো এদিকে—"সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা, হামারা।

শুভর দুপুর

দেবাশিস প্রধান

সেই থেকে শুভ, অর্থাৎ শুভঙ্কর কর কেমন বিগড়ে গেল। তার কাছে এখন নিস্তব্ধ দুপুরের মগ্ন হাঁসগুলির জলে ওঠা-নামা, চঞ্চুতে চঞ্চুতে নিবিড়-মিথুন ভীষণ ভালো লাগে। কোন মানুষ মানুষীকে শুভ সহ্য করতে পারে না। কোন মিছিলও না, কাজের লোকটি ছাড়া। জল কাটছে, জল সাঁতারু হাঁস জলের উপর ছবি আঁকতে আঁকতে চলে গেলে শুভর মনে হয় বরফের স্বচ্ছ বুকে হাইরোড তৈরী হচ্ছে। ওর কয়েকদিন ঘুম নেই চোখে। চোখের খচখচে জ্বালায় লাল। পিসিমা বার বার তাড়া লাগায়।

—ওরে শুভ ডাঃ সামন্তের চেম্বারে যা, চক্ষুরত্নের হদ্-ঘেন্না করছিস?

শুভ ভেংচি কাটে। হুঁ রত্ন না ঢেঁকি। কতদিন স্বাতী এ তল্লাটে আসে নি। পূব পাড়ার আঁকানো বাঁকানো মোটা রাস্তার শেষের বাঁকে সেই শিরীশ গাছ এখন শীতের কজ্জায় ন্যাড়া। শুভ ও স্বাতী রোদেলা দুপুরে তন্ময় মুহুর্তে প্রায়ই ওই শিরীশ গাছে ঠেস দিয়ে দু'জনেই দু'জনের ইতিহাস মেলে ধরতো। উদাত্তকণ্ঠে যৌবনের গান 'তোমার হলো শুরু, আমার হল সারা'...

ছমছমে পরিবেশ। ফাঁকা ত শীরিশতলা। দু'জনের বুক জড়িয়ে অভিমান। এ অভিমান ভালোবাসার, এ অভিমান ভালো লাগার। দু' জন দু'দিকে পিঠ এলিয়ে অদ্ভুত মুদ্রায় বসে থাকে। নিশ্চুপ। স্বাতী তার স্বভাবসিদ্ধ সুচারু নখ দাঁতে কাটতে থাকে। শুভ আকাশের দিকে।

নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। চোখের জ্বালাটা খচখচিয়ে উঠলে ইদানীং জলে ভরে যায় দু'চোখের কোণ। স্বাতী ঈষৎ আড় চোখে তাকায়। দেখে শুভর দু'চোখভেজা জল। স্বাতী আরও নিবিড় হয়ে তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে দেয়। শুভর দু'চোখের পাতায় চুমু খায়। শুভ দু'চোখ বুজে প্রকৃতি ও পরমার অগাধ বিশ্বাসী ভালোবাসায় নিটোল হয়। এই মুহুর্তে যেন কোন রোগ নেই, রোগ থাকে না। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে হাজার অসুখ যেন কোথায় চলে যায়। শুভরও তাই মনে হলো। পশ্চিম আকাশ লাল আবিরে রাঙা।

দূরের রঙন গাছগুলি নিস্তেজ হয়ে সারাদিনের ব্যস্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধ্যা নামছে। এবার ফেরার পালা। স্বাতী শুভর হাঁটুতে ভর দিয়ে পাছাতে লেগে থাকা চোর কাঁটা, ঘাসফুল, ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঘরে যাবার তাড়া দেয়। শুভ বলে—ঘর, ঘরে কেন? আমাদের ঘর থাকতে নেই। পথই তো আমাদের ঘর। শুভ স্বাতীকে নিজের নতুন কবিতা শোনায়। শোনো—

ফেরার কথা ভাবিনি কোনদিন
পথজুড়ে তো সমীহ এক ঘর
মন্ত্র মায়া মুগ্ধ বোধে জাগে
শিয়রে তার ময়না কালো চর।

স্বাতী অবাক হয়ে যায়। কি দারুণ কবিতাটা। কোথাও পাঠালে? দুর্দান্ত এর শব্দচয়ন, আঙ্গিক ও চিত্রকল্প। সাহিত্যের চৌকস এই জুটি ভয়ঙ্কর ভাবে রোমান্টিক। ভীষণ ভাবে আলাদা আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের থেকে।

গ্রামের নাম অনলবাড়ি। তারই পাশ দিয়ে চম্পানদী, তির তির বয়ে যায় দুপুরের সোনা গলা রোদে। দু'পাড়ে বৃক্ষরোপণ চলে দিন দিন। গাছ-গাছালি ঘেরা চম্পা নিজের মতো দু'পাড়ের ছায়ায় আবড় নিবিড় হয়ে বয়ে যেতে থাকে। তার সুপ্ত ইচ্ছে কাক চক্ষু জলে আরও স্পষ্ট এবং দাগী হয়। তারপরই বিরাট মাঠ। ধানের ক্ষেত। আলু, ফুলকপি, পালং, সরষের ক্ষেত, তাইচুন, আই. আর. এইট, চাষের ব্যস্ত পাওয়ার টিলার, ডিবটিউবওয়েলের এত জল। চাষাভুষোর ব্যস্ত হাঁক-ডাক। বড় ভালো লাগে এদের সম্বৎসরের ফসল সংগ্রহের প্রচেষ্টা। পাকা তরমুজ শহরে যাবে, ট্রাক এসেছে নিতাই মণ্ডলের। পশ্চিম বিলের খালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এস. পাঞ্জাব ম্যাটাডোর নরেন বলের। তার পাশেই দীর্ঘ ঝিল। ঝিলে এবছর মৎস্যমন্ত্রীকে ধরে শরণ সংঘের ছেলেরা সরকারী টাকায় মাছ ছেড়েছে। লাভের কড়ি ভাগাভাগি হবে। বাউন্ডুলে ছেলেরা এখন ঝিলের দু'ধারে পাহারা দেবার জন্য ঘর ভুলেছে। পাহারা দেয়। তাস খেলে, বিড়ি খায়। নাবিন্দার বিড়ি। ওটার স্বাদ ও ঝাঁঝ নাকি আলাদা। এই ঝিলের ওপারেই ফাঁকা মাঠ। গোটা দশেক পাইন ও তিরিশ চল্লিশ বছরের মোটা থামওয়ালা পাম গাছের বয়স্ক অভিজ্ঞতায় দিন ও রাতে কোলাহলে মুখরিত হয় ভেদিয়া পাড়া কলেজ। শুভ ও স্বাতীরা এখানেই পড়ে। কলেজের শান বাঁধানো ঘাটে, ঝিলের জলে পয়মন্ত পা ভিজিয়ে

বসে থাকে স্বাতী। গরমের দিনে ভীষণ ভালো লাগে। মাছেরা টের পেলে কুট কুট কামড়ায়, কখনো আদর দেয়, অথবা সুড়সুড়ি। স্বাতী জড়িয়ে ধরে শুভকে। শুভ এসব কথা ভাবতে ভাবতে গাছ হয়। ফল-ফুল-পরিপূর্ণতার কথা ভাবতে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে কলেজ জীবন শেষ হয় ওদের। যে যার মত ফিরে গেল সবাই। যেমন করে সবাই ফেরে—নিজস্ব ঠিকানায়। শুভদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তবুও এসব কথা জানতে দেয়নি স্বাতীকে। স্বাতীর মধ্যে গড়ে ওঠা প্রেম অথবা ভালোলাগা সব কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কলেজ জীবনের শেষে। স্বাতীও না বলেই সেই যে গেল একবারও খোঁজ নিল না এই গণ্ড গাঁয়ের আকাট চাষা ভগীরথ করের সন্তান, শুভঙ্কর করকে। শুভ খুবই অসহায়। নিরুত্তাপ। অভিমান ওকে জাপটে ধরে। নিজের মধ্যে নিজে ক্ষয়িত গলিত পচা-গলা সমাজের বোহেমিয়ান ছবির শব দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই গাঁয়ের অন্যায়-অবিচার, রাজনীতি, দুঃখু চোখের বাঁকা কথা সব যেন কেমন ফ্যাকাশে লাগে।

শুভ স্বাতীর কথা ভাবে। স্বাতীর কথা ভাবলে ঘেন্না করে। সে আমার হৃদয়ের ঘনিষ্ট সময়ে মন্ত্রের মতো যুগিয়েছিল প্রাণ উদ্দামতা। শুভর যুবক হওয়ার সন্ধিলগ্নে যার প্রতিটি উষ্ণতাই ছিল দু'হাত উজাড় করা মায়া মমতাভরা সেই স্বাতী এখন আসে না, কোন খোঁজ নেয়ই না। কেন এমন হলো? শুভ এই কেন'র সূত্র খোঁজে। ক্ষতবিক্ষত হয়। দাড়ি কাটতে গিয়ে ডান পাশের গালে ব্লেড গভীরে বসে যায়। রক্ত ঝরে। তবুও শুভ রেজারবিহীন ব্লেড চালায় আঙুলে ধরে। রক্তাক্ত শুভ রাগে রক্তিম হয়। কথা নেই মুখে। অনেক ছায়া এসে তার সামনে দাঁড়ায়। আবার ছায়ারা সরে দাঁড়ায়। শুভ স্বাতীর কথা ভাবে। গাঁ-গঞ্জের গাছগাছালি ফিসফিসিয়ে নেতিয়ে পড়ে। হিম পড়ছে টুপ-টাপ শব্দে। শুভ আরও ঘনিষ্ট ভাবনায় ডুবে যায়। মানুষ কেন এমনভাবে অসহনীয় হয়ে ওঠে, এক একটি মুহূর্তে। শুভর চোখে জ্বালা। খচখচে। তাকাতে পারে না। অনেক ছায়াময় ঘর, ঘর বন্দী স্বাতীরা তাকে আঙুল দেখিয়ে হাসে। শুভ আঁৎকে ওঠে। দু'হাতে চোখ ঢাকে। শুভ এই মুহূর্তে যুবক রোদ্দুরের মতো আরও আরও সঙ্করণশীল উদ্দামতা কিম্বা অসহায়তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, তা কেউই জানে না। স্বাতী কিম্বা শুভ কেউই না।

ঘুম পাচ্ছে

দেবর্ষি সারগী

খুব ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু কোথায় ঘুমই। এখন বাবুরাও হয়ত একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। আবার চারটের সময় নাকি বেরোবে। এখন দুটো। এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারি। সব কাজ ত হয়ে গেছে। অবশ্য এখানে আমার খুব কাজও নেই। রান্না করতে হচ্ছে না। বাজার যেতে হচ্ছে না। ঘর মুছতে হচ্ছে না। শুধু জামাকাপড়গুলো কাচতে হচ্ছে। আর হোটেল ছাড়ার সময় এবং নতুন হোটেলে ওঠার সময় গাড়িতে মাল তোলানামা করতে হচ্ছে। এসব ছাড়া আর কাজ নেই। বাবুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। পাহাড়ের দেশে। পাহাড়ও জীবনে প্রথম দেখলাম। এত উঁচু হয় পাহাড়। ছুটি নিয়ে যখন দেশে যাব তখন মা বাবা দিদিদের কাছে গল্প করব। ওদের বিশ্বাসই হবে না। সামনের পাহাড়টায় কি সুন্দর রোদ পড়েছে। আরও শীতের সময় নাকি বরফ পড়ে। পাহাড়গুলো তখন দুধের হয়ে যায়। এখানকার প্রজাপতি-গুলো কত বড় ও সুন্দর হয়। রাস্তার কুকুরগুলোর গায়েও বড় বড় লোম। কিন্তু ঘুমই কোথায়। গাড়ির ড্রাইভার অমলদা গাড়ির ভেতর ঘুমচ্ছে। অমলদার খুব মজা। ঘুম পেলে গাড়ির ভেতরই ঘুমিয়ে নিতে পারে। বাবুর ছেলের নাম শুভ্র। আমি শুভদা বলে ডাকি। আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। আমার বয়স তের। শুভদা আমাকে খুব ভালবাসে। সেও এখন বাবুদের সঙ্গে ঘরে ঘুমচ্ছে হয়ত। দোতলায় বাবুদের ঘরের সামনে একটা লম্বা বারান্দা। বারান্দায় রোদ আছে। চাদর পেতে ওই রোদে ঘুমনো যায়। কিন্তু ওখানে ঘুমবো না। কারণ আমি ঘুমচ্ছি এটা বাবু বা বউদি কারো সহ্য হয় না। কাজ না থাকলেও কাজ দেবে। বউদি হয়ত বলবে জামাকাপড় ইস্তিরি কর। ইস্তিরি করা জামাকাপড় আবার ইস্তিরি করার। হয়ত তাও বলবে না। কি বলবে বলা শক্ত। কিন্তু দিনের বেলায় আমার ঘুমিয়ে থাকা বউদির একদম সহ্য হয় না। কলকাতায় বাবুদের বাড়ির সিঁড়িঘরে বা গ্যারেজে মাঝেমাঝে দুপুরে লুকিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘুম ঠিক আসে না। চোখ বন্ধ করে শুধু পড়ে থাকা। আর বুকের ভেতর দুশ্চিন্তা। কখন বউদি ডাক দিয়ে বসে। ডাকে সাড়া দিতে দেরি হলে ধমক দিয়ে বলে যে পড়ে পড়ে ঘুমনোর জন্য [illegible]

টাকা মাইনে দিয়ে আমাকে রাখা হয় নি। আমি ভয়ে ভয়ে জানতে চাই কোন কাজটা করে দিতে হবে। বউদি কোনো কাজ বলতে পারে না, কারণ সব কাজ ত করা হয়ে গেছে। শুধু বলে কাজের কি আর শেষ আছে। বলে আমার সামনে থেকে চলে যায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। বাবু সবসময় অত ধমক দেয় না। তবে আমার কাজ না থাকলেই কাছে ডাকবে। তারপর চুল টেনে দিতে বলবে, বা হাত পা টিপে দিতে। দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আমাকে বলবে ওনার শরীরের ওপর চড়ে সারা শরীর টিপে দিতে। বাবু একটু মোটা। ফলে ওভাবে উঠে অনেকক্ষণ টিপে দিলেও আমার তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু মুশকিল হল আমাকে আর নামতেই বলে না। ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি নামলেই ঘুম ভেঙে যায়। বকে আবার শরীরের ওপর দাঁড়াতে বলে। আমাকে সবচেয়ে কম কাজের হুকুম দেয় শুভদাই। শুভদা আমাকে ভালবাসে। বারান্দায় ঘুমনো ঠিক হবে। রাতে ওদের ঘরেই মেঝেয় বিছানা পেতে ঘুমই। আমার বিছানা সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। তোষক, কম্বল ও বালিশ। এগুলো ঘরে খাটের তলায় গোল করে রাখা আছে। নিচে কোথাও ঘুমনোই ঠিক হবে। হোটেলের নিচতলাতেও লম্বা বারান্দা আছে। কিন্তু ওখানে জায়গা নেই। বারান্দার যে জায়গায় একটু রোদ আছে সেখানে হোটেলের কর্মচারিরা বসে তাস খেলছে। দু'জন লোক অবশ্য একপাশে ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ তাস খেলে এরাও হয়ত ঘুমবে। কারণ এদের সব কাজ ত হয়ে গেছে। হোটেলের সব টুরিস্ট খেয়ে নিয়েছে। এদের খাওয়াও হয়ে গেছে। বারান্দায় আর কোথাও রোদ নেই। আমি ওদের পাশে দাঁড়িয়ে তাস খেলা দেখতে লাগলাম। লাল রঙের ছেঁড়া সোয়েটার পরা একজনের পিঠে আমার ছায়া পড়ছিল। ওটা লক্ষ্য করতে আমি একটু সরে দাঁড়ালাম। এর ফলে আমাকে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াতে হল। ওখানে খুব ঠাণ্ডা ছায়া, আমার শীত করছিল। বারান্দা থেকে মাটিতে নেমে এলাম। সামনে বাবুদের গাড়ি। ভেতরে অমলদা ঘুমচ্ছে। জানলার কাচ তুলে পেছনের সিটে। লম্বা লোক, তবু পা মুড়ে ভালই ঘুমচ্ছে। কাঁচ তুলে দিয়েছে যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া না ঢোকে। শুধু সামনের দিকে একটা জানলার কাঁচ একটু নামানো। আমি ওটার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একবার ভাবি অমলদাকে ডাক দিই। বলি দরজাটা একটু খুলে দিতে। তাহলে সামনের সিটে আমিও একটু ঘুমতে পারি। এর আগে এক দুপুরে অমলদা আমাকে গাড়ির ভেতর ঘুমতে দিয়ে-

ছিল। কিন্তু পরে বউদিকে ঘটনাটা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে লাগায়। বউদি আমাকে বকে। বলে গাড়ির ভেতর আর কখনও যেন না ঢুকই। অমলদার ওই স্বভাব। আমাকে বকুনি শুনিয়ে বেজায় আনন্দ পায়। অথচ অমলদারও আমি অনেক কাজ করে দিই। দোকান থেকে চা বা পানবিড়ি এনে দিই। একবার আমার কাছ থেকে তিনটে টাকা ধার নিয়েছিল। আর দেয় নি। আমিও চাই নি। খোলা জানলাটার ফাঁকে চোখ রেখে আমি অমলদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। যদি কোনো কারণে একটু নড়াচড়া করে বা ঘুম ভেঙে যায় তবে ডাক দেব। নইলে ঘুম ভাঙিয়ে বললে রেগে যেতে পারে। পরে বউদির কাছে নালিশ করে বকুনি খাওয়াতে পারে। কিন্তু অমলদা এক-ভাবে ঘুমিয়ে আছে। আমি জানলার ফাঁকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। দু তিনবার ফিসফিস করে ডাকলাম, অমলদা, অমলদা। খুব আস্তে যাতে আমার ডাক না শুনে ফেলে। কারণ ঘুম ভাঙালে খুব রেগে যাবে। গাড়ির ভেতর একগোছা বুনো লাল ফল। সকালে যেখানে বেড়াতে গিয়ে-ছিলাম সেখানে একটা গাছ থেকে অমলদা পাড়ে। খেতে নেই, খেলে বিষ। অমলদা একইভাবে ঘুমিয়ে, নড়ছে না। আবার বারান্দার কাছে চলে এলাম। তাসখেলা নিয়ে হোটেলের লোকগুলো চেঁচামেচি, হাসাহাসি করছে। দুজন অন্যদের ওপর খুব রেগে গেছে। খেলা শেষ হল। একজন ভেতর থেকে কয়েকটা মাদুর নিয়ে এল। সবগুলোকে রোদে বিছিয়ে দিয়ে একে একে ওরা শুয়ে পড়ল। মাদুরের ডানদিকে আরও একজনের শোবার জায়গা আছে। ওখানে কে শোবে কে জানে। আমি আবার মাটিতে নেমে এলাম। গাড়ির কাছে এসে দেখি অমলদা আগের মতই ঘুমিয়ে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম হোটেলের সবাই এখন ঘুমচ্ছে, কেউ জেগে নেই, চারপাশ কেমন চুপচাপ। এক জায়গায় চারদিক সিমেন্টের প্রাচীর তুলে প্রচুর ফুলগাছ লাগানো হয়েছে। একটা প্রাচীরের ওপর বসে হোটেলের প্রকাণ্ড বাড়িটার, দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কোথাও কোনো লোক জেগে নেই। দোতলায় রেলিঙে বাবুদের জামাকাপড় শুকোচ্ছে। আমিই মেলে দিয়েছিলাম। একটু দূরে আমার গেঞ্জি আর প্যান্ট। ফুলপ্যান্ট। কলকাতায় আমি হাফপ্যান্টই পরি। কিন্তু এখানে শীত বলে ফুলপ্যান্ট নিয়ে এসেছি। দুটোই ভজদার। পুরনো হয়ে গেছে বলে বউদি আমাকে দিল। একটা পরে আছি, অন্যটা ওই শুকোচ্ছে। আমাও এনেছি দুটো, একটা সোয়েটার, আর একটা মোটা চাদর। এসব পরে

থাকলেও সকাল ও রাতের দিকে খুব শীত করে। দুপুরে করে না। এখন করছে না। চারপাশ কেমন চুপচাপ। কোথাও কেউ জেগে নেই। কেউ কথা বলছে না। সবাই ঘুমিয়ে। হোটেলের বাড়িটাও যেন ঘুমিয়ে। শুধু বাড়িটা কেন, বাবুদের গাড়ি, এই ফুলগাছগুলো, দূরের ওই গাছগুলো, অত বড় পাহাড়টা, সামনে ভয়ঙ্কর খাদের মধ্যে যে গাছ সেই গাছগুলো, আকাশ মাটি রোদ সবাই ঘুমচ্ছে। আমার গ্রামের দুপুরেও মাঝে মাঝে আমার মনে হত সবাই যেন ঘুমিয়ে। মানুষজন. গ্রামের সব বাড়ি, সব গাছ, পথঘাট, পাখিরা। ওদের কেউ মানা করে না। হোটেলের লোকেরাও ঘুমিয়ে কেউ মানা করছে না। ওদের বেলায় হয়ত নিয়ম আছে যে সব কাজ সেরে দুপুরে একটু ঘুমবে। কেউ মানা করবে না। খেটে খেটে ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে ত। এখানে যে আমি খুব খাটছি তা নয়। বেশি কাজ করতে হচ্ছে না। কলকাতায় এর চেয়ে অনেক বেশি কাজ করি। তবু এত ঘুম পাচ্ছে কেন। কে জানে। জায়গাটাই হয়ত এমন যে মাঝে মাঝে শুধু চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। আর ঘুমতে। ঘুম না এলে অন্তত শুয়ে থাকতে। মাঝে মাঝে চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতেও বেশ লাগে। শরীরে কেমন আরাম লাগে। মনে কেমন সুখ। আমিও এখন ঠিক ঘুমতাম না। একটু শুয়ে থাকতাম। দোতলার বারান্দায় যাব কিনা আবার ভাবতে লাগলাম : কিন্তু বউদি দেখে ফেললেই ত ধমক দেবে। নিচতলার বারান্দায় আবার গেলাম। লোকগুলো চোখ বুজে পড়ে। কেউ কেউ হয়ত ঘুমিয়েও পড়েছে। ডানদিকে যে জায়গাটা খালি পড়েছিল সেখানে আর কেউ এসে শোয় নি। জায়গাটায় আরও এক-জন শুতে পারত। কিন্তু পাশের লোকটা তার একটা হাত এখানে বাড়িয়ে রেখেছে। ফলে শুতে চাইলেও উপায় নেই। লোকটা আমার পরিচিত কেউ হলে হাতটা হয়ত আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তাম। কিন্তু আমি ত ওর কেউ নই। ফলে হাত সরানো ঠিক হবে না। তাছাড়া চাকরকে চাকররা পাত্তা দেয় না। আমি যে এই গাড়িঅলা বাবুদের চাকর সেটা ওরা জানে। ডাইনিং ঘরে একটা দেয়ালঘড়ি আছে। তাকিয়ে দেখলাম সওয়া দুটো বাজে। বাবুরা ত চারটের সময় বেরোবে, একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য এখনও হাতে অনেক সময়। তাছাড়া আমার ত সব কাজ হয়ে গেছে। আর কোনো কাজ নেই। ডাইনিং ঘরে দুটো লম্বা বেঞ্চ আছে, ওগুলোর একটায় শুয়ে পড়লে কেমন হয়। কিন্তু কেউ দেখে ফেললে যদি বকাবকি করে। তাছাড়া ওখানে

খুব শীত করবে। আবার মাটিতে নেমে এলাম। হঠাৎ চোখে পড়ে অমলদা গাড়ির ভেতর একটু নড়ছে। তাড়াতাড়ি সামনের দরজার ওই একটু খোলা জানালাটার কাছে গেলাম। অমলদা আগে পাশ ফিরে ঘুমিয়েছিল, এবার চিৎ হয়েছে। একটা হাঁটু ভেঙে খাড়া করে রেখেছে। অন্য পাটাকে নামিয়ে দিয়েছে সিট থেকে নিচে। হঠাৎ শুনতে পেলাম অমলদা মুখ দিয়ে বিড় বিড় করে কি বলছে। এর আগেও লক্ষ্য করেছি অমলদা ঘুমের ভেতর কথা বলে। আমি জানলার ফাঁকে মুখ ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে লাগলাম। ওরকম ফুঁ দিয়ে অমলদার ঘুম ভাঙানো যাবে না, তবু কেন জানি না ফুঁ দিয়ে চললাম। ফুঁ-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে উঠছিল খুব হালকা শিসও। শিস যাতে না বেরোয় তার চেষ্টা করছিলাম, কারণ শিসের শব্দে অমলদার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। অমলদা ঘুমের ভেতর নানা কথা বলে গেল। হেসে কাকে যেন একটু মিষ্টি ধমকও দিল। আমি ফুঁ দেওয়া বন্ধ করলাম। অমলদা মনে হয় কোনো মজার স্বপ্ন দেখছে। হয়ত মা বা বোনের। অমলদার বাবা মারা গেছে। কিংবা বউ আর ছেলের। ওরা সবাই মুর্শিদাবাদে থাকে। দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখনও কত রোদ। বড় মিষ্টি এই রোদ। গায়ে অনেকক্ষণ লাগলে কেমন ঘুম পেয়ে যায়। কিন্তু কোথায় ঘুমই। হঠাৎ মাকে মনে পড়ছিল। মায়ের কোল। আমাকে কোলে নিয়ে মা ঢেঁকি ভাঙছে। ধীর দুপুর। শুধু একটা বড় মাছি গান গেয়ে গেয়ে উড়ছে। হোটেলের ওই ঘাসে শুয়ে থাকা যায়। কিন্তু দোতলার বারান্দা থেকে বাবু বা বউদি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। অকারণে ডাক দেবে। কাজ না থাকলেও কাজ দেবে। পেচ্ছাব পেয়েছে। হোটেলের বাঁদিকে একটু নেমে অনেকে দেখি পেচ্ছাব করে। কর্মচারিদের দেখছি। আমিও ওদিকে গেলাম। এখানে নানারকম আবর্জনা ডিমের খোল, মাছের আঁশ, ছাই ও কুচি পাথরের গাদা। ঢালু জমির ওপর একটা নোংরা নালি বয়ে যাচ্ছে। ওই নালির জলে পেচ্ছাব করতে লাগলাম। জলে চড়র চড়র শব্দে চমকে উঠে কয়েকটা প্রজাপতি উড়ে গেল। ওরা হয়ত ঘুমচ্ছিল। কিছুক্ষণ পাক খেয়ে আবার শান্ত হয়ে ডানা বুজে ঝোপঝাড়ের ওপর বসল। পেচ্ছাব করার পর আমি নালিটা পার হয়ে ওপাশে গেলাম। একটা ঝোপের আড়ালে একটা বেড়াল বসেছিল। আমাকে দেখে লাফ দিয়ে একটু দূরে দাঁড়াল। আমার দিকে থতমত খাওয়া চোখে তাকিয়ে থাকল। মুখে চুচু শব্দ তুললাম, যাতে বেড়ালটা আর ভয় না পায়। কয়েক পা এগিয়ে

সিমেন্টের একটা প্রকাণ্ড ঢাকনা। ওটার তলায় হয়ত পায়খানার ট্যাঙ্ক। কিন্তু ঢাকনাটা বেশ পরিষ্কার। রোদও আছে। আশপাশে কয়েকটা সফেদা গাছ। জায়গাটা খুব ফাঁকা। আমার ভাল লাগছিল। ঢাকনাটার ওপর বসলাম। কোথাও কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ শুকনো পাতা নড়ে ওঠার শব্দে চমকে উঠে দেখি একটা গিরগিটি ঘাড় উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে। একটু ভয় হল। হয়ত সাপটাপও থাকতেও পারে। কিন্তু হোটেলের একজন এক টুরিস্টকে আজ যেন বলছিল এ অঞ্চলে সাপ নেই। কে জানে। সে কি আর সব দেখেছে। সাপ কি আর চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। তবে শীত ত নাও থাকতে পারে। গা থেকে চাদরটা নামিয়ে আমি ঢাকনাটা একটু ঝেড়ে নিলাম। তারপর ওটা ঢাকনার ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম দরকার নেই, আর ঘুমবার সময়ও হাতে নেই। একটু পরে বাবুরা বেরোবে। শুধু শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। আমাকে এখানে রেখে গেলেও ত হয়। ওরাই বেড়িয়ে আসুক না, আমি হোটেলেই থাকি। জামাকাপড় ইস্তিরি করে ভাঁজ করে রাখব। ওরা খুব দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে পাবে। ঝর্ণাটা আমরাও দেখতে ইচ্ছে করছে। আর কখনও ত সুযোগ পাব না। পাহাড়ের দেশে হয়ত এই আমার শেষ আসা। দেশে গিয়ে মা ও দিদির কাছে গল্প করব। ওদের হয়ত বিশ্বাসই হবে না। ঝিঁঝি ডাকছে। এখানে দিনের বেলায়ও মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। ওদের ডাকে মন কেমন জড়িয়ে যায়, শেকড়বাকড়ে পা জড়িয়ে যাবার মত। ঘুম আসে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হবে না। বাবু বা বউদি ডাক দেবে। হয়ত এখন খুঁজছে। যাবার সময় কি হয়ে গেল। ওরা কি আমাকে খুঁজছে। কান পেতে ভাল করে শোনার চেষ্টা করলাম। কারো ডাক কানে এল না। একবার মনে হল সত্যি ডাকছে। বুঝতে পারছিলাম না। মনে নানা দুশ্চিন্তা হতে লাগল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। ওই পাহাড়টার মত, ওই রোদের মত, গাছগুলোর মত, পোকামাকড়দের মত চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। বেশিক্ষণ নয়। শুধু কিছুক্ষণের জন্য।

দুই

সওয়া তিনটে নাগাদ অসিতের ঘুম ভেঙে গেল। দুই বিছানার ঘর। একটাতে মা ও ছেলে অর্থাৎ মালা ও শুভ ঘুমিয়ে। অন্যটাতে অসিত। ঘুম ভাঙার পর অসিত বালিসের তলা থেকে ঘড়ি বার করে দেখল সওয়া তিনটে। চারটে নাগাদ বেরিয়ে যাবার কথা। পনের মাইল দূরে ঝর্ণা দেখতে।

অসিতের ঠিক ইচ্ছে করছিল না। মালা ও শুভর জন্যই যেতে হবে। সকালে অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। ভোর ছটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত। ফেরা হয় যখন, ক্লান্তিতে হাতপা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এখনও গায়ে ব্যাথা, উঠতে ইচ্ছে করছে না। অসিত একটা বালিশকে বুকের তলায় নিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে উপুর হয়ে শুলো। তাতে আরাম পাচ্ছিল। দ্বিতীয় বালিশটাকেও বুকের তলায় নিল, দুহাতে দিয়ে দুপাশ আঁকড়ে ধরে। তারপর সমস্ত শরীরটাকে স্প্রিং-এর বিছানার ওপর মৃদু মৃদু দোলাতে লাগল। আড়চোখে দেখে নিল শুভ লক্ষ্য করছে কিনা, কারণ বিছানায় ওরকম দোলা ত অশ্লীল। কিছুক্ষণ ওরকম দোলার ফলে অসিতের ভেতর উত্তেজনা জাগতে লাগল। এবং এই মুহূর্তে উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয় ভেবে নিজেকে উল্টে চিৎ করে নিল। বালিশ দুটোকে এবার বুকের ওপর চেপে ধরল। শীত করছিল বলে বাঘের ডোরাকাটা চামড়ার মত দেখতে কম্বলটা গায়ে তুলে নিল। কলকাতায় ফিরতে এখনও দশদিন। এই ওঠো, সাড়ে তিনটে বাজে। বউ ও ছেলেকে উদ্দেশ্য করে সে বলল। ওরা কেউ জবাব দিল না। অসিতও কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকল। তারপর আবার বলল, কি হল? ওঠো, বেরোবে না? এই মালা? শুভ? মালা ও শুভ দুজনেই একসঙ্গে চোখ খুলল। কি হল? ঘুম জড়ানো গলায় মালা বলল। তৈরি হয়ে নাও, বেরোবে না? মালা জবাব না দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। অসিত বিরক্ত হয়ে শুভকে ধমক দিল। এই শুভ? উঠতে বলছি না? প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। শুভ বিছানায় উঠে বসে। মালা তখনও ঘুমিয়ে। যদি না যেতে চাস ত থাক। আমার ত ইচ্ছে করছে না। মালা যেন ঘুমের ভেতরই শুনে ফেলে অসিতের কথা। ধড়মড় করে চোখ খুলে বলে, যাব না, মানে? কটা বাজে? সাড়ে তিনটে। অসিত জানায়। অ্যাঁ? মালা অবাক হয়ে বিছানা থেকে ওঠার ভঙ্গি করে বলল, কিন্তু না উঠে পাশ ফিরে শুলো। আবার জিজ্ঞেস করল, সাড়ে তিনটে বাজে? আজ্ঞে হ্যাঁ অসিত বিরক্ত হয়ে জানায়। খুব ঘুম পাচ্ছে। মালা বলে। আজ খুব ঘোরা হয়েছে। তোমার ঘুম পাচ্ছে না? না। তবে উঠতেও ইচ্ছে করছে না। আমারও। মালা জানায়। এবং আবার ঘুমবার চেষ্টা করে। শুভ বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে যায়। ফিরে এসে অসিত বলে, বসন্তকে একটু ডাক ত। শুভ দরজা খুলে বারান্দায় এসে কয়েকবার বসন্তকে ডাকে। কোনো জবাব না পেয়ে ডাকা বন্ধ করে।

সামনের পাহাড় এখনও রোদে জলছে। শুভ মুগ্ধ হয়ে দূরে তাকিয়ে থাকল। কিরে? বসন্ত এল? ঘরের ভেতর থেকে অসিত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছি না। শুভ জানায়। ডাক দে। কোথায় আবার যাবে। অসিত বিরক্ত হয়ে বলে। বসন্তকে দিয়ে ওর এখন খুব হাতপা টেপাতে ইচ্ছে করছে। বাইরে যখন আর যাওয়া হচ্ছে না তখন বসন্তকে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক মালিশ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিরে এল? অসিত এবার অত্যন্ত জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। চিৎকারে মালার ঘুম ভেঙে গেল। কি হয়েছে? সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে। বসন্ত যে কোথায় গেল? অসিত বলে। ওকে ডাক ত। মালা বলল। জামাকাপড় ইস্তিরি করে রাখবে। পেলে ত ডাকব। অসিত বলে। উঠে একটু দেখো না। মালা চেঁচায়। হারামজাদাটা যে কোথায় থাকে। কতবার বলেছি এদিক ওদিক যাবি না। এই ঘরেই থাকবি। কিংবা বারান্দায়। কখন দরকার পড়ে তার ঠিক আছে? কি লাভ হল ওকে এনে? এত খরচা করে? অসিতও সেই কথা ভাবছিল। সে আবার শুভকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিরে? পেলি বসন্তকে? না। অসিত অবাক হয়ে গেল। অবাক হল মালাও। দুজনেরই ইচ্ছে করল ওকে ধরে এনে গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে। কিন্তু উঠতে দুজনেরই ইচ্ছে করছিল না। হাতপা টেপাবার এমন সুযোগ নষ্ট হবে অসিতের সহ্য হচ্ছিল না। বিশেষ করে এখন যখন বেরোনো আর হচ্ছে না। অন্য সময় মালাও ধমক দেয়। বসন্তকে দিয়ে ওর এত হাতপা টেপানো মালার ভাল লাগে না। মালার মতে অসিতের তখন কোনো হুঁস থাকে না। লুঙ্গি ওপরে উঠে যায়। আর বসন্ত চুরি করে অসিতের গোপনাঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকে। মালা লক্ষ্য করেছে। অসিত এসবকে গুরুত্ব দেয় না। বসন্ত ছেলেমানুষ। সম্ভব হলে সে ওকে দিয়ে নিজের গোপনাঙ্গেও হাত বুলিয়ে নিত। অসিত আরও কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাথরুম থেকে ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এল। মালা বলল বসন্তকে পাঠিয়ে দিতে, কারণ জামাকাপড় ইস্তিরি করতে হবে। শুভ তখনও চারপাশের সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বারান্দায় এসে অসিত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল ভেতরে ড্রাইভার অঘোরে ঘুমচ্ছে। অসিত বিরক্ত হল। চাকরবাকর বা ড্রাইভারকে ঘুমতে দেখলে তার হঠাৎ মনে হয় যে ওদের মাইনে বাবদ

কেওয়া তার টাকাটা জলে যাচ্ছে। রাতে ওরা ঘুমক। কিন্তু দিনে ঘুমতে দেখলেই তার মধ্যে ওরকম অদ্ভুত ভাবনাটা কাজ করে। সে সিগারেট টানতে টানতে বারান্দায় কয়েকবার পায়চারি করল। তারপর শুভকে বলল, নিচে নেমে অমলকে তুলে বল ত গাড়িটা একটু ধুয়েমুছে নিতে। কি নোংরা করে রেখেছে দেখেছিস? সকালে ত ধুয়েছিল। শুভ বলে। তাছাড়া এখন ত আবার বেরোব। আবার নোংরা হবে। তার চেয়ে কাল সকালে মুছলেই হবে। না। অসিত বিরক্ত হয়ে বলে। এখন আমরা যাচ্ছি না। তোর মার শরীর খারাপ। যা, নিচে গিয়ে অমলকে তোল। সবসময় ওরকম হাঁ করে ঘুমিয়ে থাকে কেন? শুভ নেমে যায়। গাড়ির কাঁচ জোরে জোরে টোকা মেরে অমলকে তোলে। ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে অমল ঘড়ি দেখে। কাঁটায় কাঁটায় চারটে। দোতলা বারান্দার দিকে তাকিয়ে অসিতকে দেখতে পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। অপরাধীর মত। অসিত সিগারেট খেতে খেতে বারান্দায় পায়চারি করছে। দোতলা থেকে সামনের ভয়ঙ্কর খাদটা দেখা যায়। খাদে কয়েকটা বক উড়ে যাচ্ছে অসিতের মনে পড়ল তার ঠাকুর্দা বড় শিকারী ছিলেন। শুভ নিচেই থেকে গেল। একমনে খাদের গভীরতার দিকে তাকিয়ে বকগুলোকে দেখতে তার খুব ভাল লাগছিল। উড়ন্ত বকের পেটের বদলে পিঠ দেখতে পাচ্ছে বলে সে অভিভূত হয়ে গেল। পায়চারি করতে করতে অসিত বারান্দার বাঁদিকের শেষ প্রান্তে একবার গেল। এবং নিচের দিকে তাকিয়ে অবাক। নিচে পায়খানার ট্যাঙ্কের ওপর বসন্ত ঘুমিয়ে আছে। অসিত ভাবল ওপর থেকে ডাক দেয়। তারপর ভাবল নিচে গিয়ে হারামজাদার সঙ্গে একটু মজা করা যাক। মাঝে মাঝে অসিত ওর সঙ্গে সত্যি নানা আমুদেপনা করে। ওর পেছনে লাগে। মজাটা যাতে মালাও উপভোগ করতে পারে তাই সে ওকেও ঘর থেকে জাগিয়ে বারান্দায় নিয়ে এল। মালা আসতে চাইছিল না। ঘুমে সে বেড়ালছানাদের মত কাতর হয়ে আছে। অসিতের পীড়াপীড়িতে এল। বারান্দা থেকে অসিত যখন আঙুল দিয়ে ঘুমন্ত বসন্তকে দেখায়, মালা নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে নি। এতক্ষণে ঘুমটাও ওর চোখ জোড়াকে একটু ছাড়ল। সে বড় বড় চোখে বসন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। নক্সাকাটা সিল্কের লুঙ্গিকে কোমরে ভাল করে বেঁধে নিল অসিত। দামি সাদা শালটাকে ঘাড়ের ওপর ঠিক করে নিল। ঘরে গিয়ে ঘড়িটা কব্জিতে ঢোকাল। তারপর হাতে সিগারেটের প্যাকেট ও

লাইটারটা ধরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। অসিতকে খুব স্বপুরুষ দেখাচ্ছিল। গম্ভীর, মার্জিত পদক্ষেপে যে ওই আবর্জনার স্তূপ, নোংরা নালি ও ঝোপঝাড় পার হয়ে পায়খানার ট্যাঙ্কের কাছে উপস্থিত হল। রোদ আর ট্যাঙ্কের ওপর ছিল না, পাশ দিয়ে ঘাসে নেমে গিয়েছিল। বসন্ত ডানদিকে পাশ ফিরে পা দুটো মুড়ে ঘুমিয়ে আছে। একটা হাত মাথার নিচে। সে যে ঠিক ঘুমিয়ে আছে বলা যায় না। কারণ তার মাথার ভেতর সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা যে বাবুরা হয়ত ডাক দিচ্ছেন ওই দুশ্চিন্তা ঘুম আসতে দিচ্ছে না। তবে ঘোলাটে তন্দ্রার ভেতর মাঝে মাঝে সে একটু বেশি ডুবও দিয়ে ফেলছে, যার জন্য ভেতর ডাকগুলো শুনতে প্রায় নি। আর স্বপ্ন দেখছে। কুয়োর মত গভীর ঘুমে উঁকি মারা স্বপ্ন এগুলো নয়। এই স্বপ্নগুলো ভাসমান পাতলা মেঘের মত। দুশ্চিন্তাপ্রসূত। স্বপ্নে একবার দেখল কলকাতার রাস্তায় একটা প্রকাণ্ড ট্রাক তাকে তাড়া করছে। রাজপথ ও অলিগলি দিয়ে। সে দৌড়চ্ছে। আর খুঁজছে কোনো গর্ত, যেখানে ঢুকে পড়বে। অসিত নিঃশব্দে তার মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর ডান পা তুলে বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার ফাঁকের ভেতর বসন্তের নাকটা জোরে চেপে ধরল। ছেড়ে দিতেই লাফিয়ে উঠে পড়ল বসন্ত, ঘুমন্ত কুকুরের লেজে পা দিলে কুকুর যেমন লাফিয়ে ওঠে। দোতলায় দাঁড়িয়ে মালা খিলখিল করে হাসছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কুকুরটা ভীত, অপরাধী চোখে অসিতের দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মুখে ফোটাবার চেষ্টা করল ক্ষমাপ্রার্থীর ভ্যাবাচাকা হাসি। অসিত আমুদে মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ঘাড় তুলে তাকাল দোতলায় হাসতে থাকা মালার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে পা বাড়াল। পেছনে পেছনে পা বাড়াল লজ্জিত কুকুরটাও।

(৩)

এরপরও দুপুরের দিকে, যখন সব কাজ হয়ে যায়, আমার মাঝে মাঝে ঘুম পায়। অন্তত চুপচাপ একটু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হয়ত এই জায়গাটার জন্যই। নইলে কলকাতায় ত এত শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। যাহক, ইচ্ছে করলেও আর কিন্তু আমি শুই নি। মুঠোয় কাঁচালঙ্কা রাখি। ঘুম এলেই একটা করে চিবোই।

কালের স্রোত

অতীশ ঘোষ

সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। একটানা এরকম বৃষ্টি এবারই প্রথম। যতদূর দৃষ্টি যায় ছাই রঙা মেঘ। মনে হয় এ বৃষ্টি আর থামবে না। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে, কিন্তু বাইরে তাকালে মনে হয় বুঝি ভোর হয় হয়। আলো-আঁধারি। বাড়ির সামনে জল জমেছে। একটু একটু করে সেই জল বাড়ছে, হয়ত সিঁড়ি ছোঁবে। বাগানের লেবুগাছটার পাতা থেকে জল পড়ছে টুপ টুপ করে। ঘন সবুজ পাতা। তালগাছে একটা কাক বসেছিল পাতার আড়ালে। ডানা ঝাপটে জল ঝরালো ফট্‌ফট্‌ শব্দ তুলে। উঠোনে কয়েকটা শামুক শুঁড় বের করে গুটিগুটি হাঁটছে।

অর্ণর শরীরটা আজ ভালো নয়। কাল বিকেলে ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিল। তারপর থেকে গা-হাত-পা ব্যাথা। মাথা টস্‌টস্‌ করছে। কোমর থেকে নিচের অংশ ছাড়াছাড়া লাগছে। আজ সকালে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়েছিল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ঘুম ভেঙে শুয়ে থাকার অভ্যেস নেই অর্ণর। জোর করে উঠে পড়েছে কিছুক্ষণ পরে।

অর্প এখনও শুয়ে আছে। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। কতক্ষণে ঘুম ভাঙবে কে জানে। আজকাল সব কেমন বদলে যাচ্ছে, অর্ণব ভাবে। ছোটবেলায় ভোর হতে হতেই ঘুম থেকে উঠতে হতো বাবা বেরিয়ে যাবার আগে। আকাশে তখন পাখির দল বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছে সারাদিনের মতো। ঝাঁক বেঁধে বিভিন্ন জ্যামিতিক রেখা এঁকে উড়ছে নীল আকাশের পটে। ঘুম ঘুম চোখে ভাই-বোন সবাই মিলে যাওয়া হতো পুকুরে হাত মুখ ধুতে। পুকুর ঘাটের ঝিরঝিরানি বাতাসে ঘুম কেটে যেত। শরীরের অবসাদ কাটতো পরিষ্কার টলটলে জলের স্পর্শে পবিত্র মনে হতো নিজেকে। শীত-গ্রীষ্ম কখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। বর্ষাকালের সকালে পুকুরে যাওয়া বারণ ছিল। উঠনে জল তুলে রাখতেন বাবা। সেই জলে সবাই কাজ সারতাম। তাই সকালে ওঠার অভ্যেস ছিল বারমাস।

এখন সেই সময়ও আর নেই, পরিবেশও নেই। সাতটা-সাড়ে সাতটার আগে পাড়া জাগে না। তখনই ভোর হয় এপাড়ায়।

একবার ভাবলো, অর্ণকে ডাকবে। কি মনে হলো, বিছানার কাছে গিয়েও ডাকলো না। রান্নাঘরে জয়িতাকে বললো, অর্ণবকে ডাকো, আর কতক্ষণ ঘুমোবে? জয়িতা অর্ণকে দেখলো। একটুখানি হাসলো, সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে একটু ঘুমোক না কেন? অর্ণবের ভালো লাগলো না মায়ের এই স্নেহ। ছেলে যথেষ্ট বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। এখনও এই মমতা দেখানোর কোন মানে হয় না। এইত সময় গড়ে ওঠার। নিজেকে তৈরী করার। এই বয়েসে নিয়মিত পড়াশোনা করা উচিত একটুও সময় নষ্ট না করে। তা নয় সকাল আটটা পর্যন্ত ঘুম। বিশ্রী তিক্ততায় ভরে গেল অর্ণবের মন। একহাতে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললো, জয়ি এভাবে ছেলেকে প্রশ্রয় দিও না, ওর সর্বনাশ হবে। মায়ের মমতা উজাড় করে দেবার সময় আরো অনেক পাবে, এখন একটু কঠোর হও। যে সময়ের যা, তাই করা উচিত। সকাল সকাল উঠে বই নিয়েতো বসতে পারে? সময় চলে গেলে আর ফিরে পাবে না। জয়িতা দেখলো কুড়ি বছর আগের একটা মানুষ। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ধ্যান যার একমাত্র জ্ঞান ছিল। সামান্যতম ত্রুটি ছিলনা দৈনন্দিন জীবনে। কথাগুলো বলে অর্ণব দাঁড়ায় নি সেখানে। বারান্দায় চলে এসেছে। এসবেস্টাসের চাল থেকে অবিরাম জলের ধারা দেখছে। জলে পড়ছে জল, মিলিয়ে যাচ্ছে জলেই ছোট ছোট ঢেউ তুলে।

বৃষ্টি একটু ধরেছে, কিন্তু বাতাস বইছে জোরে। গাছ-গাছালির পাতায় যেটুকু জল ছিল, ঝাপটায় ঝেড়ে ফেলছে নিচে। বাতাসে জলের ছিটে লাগছে অর্ণবের গায়ে। একটু পিছিয়ে দাঁড়াল, ভালো করে চাদরটা জড়িয়ে গায়ে। ভারী ভিজে বাতাসে শীত শীত ভাব।

বাজারের থলি আর টাকা নিয়ে জয়িতা এলো। বাজার করতে হবে? না হলে চলবে না? শরীরটা খারাপ লাগছে। জয়িতা বাঁহাত জুড়ে অর্ণবের কপালে গালে ছুঁয়ে দেখলো। তাহলে থাক। যা আছে হয়ে যাবে।

অর্পণকে পাঠাতে পারো।

না, না থাকগে। একটা দিনতো, হয়ে যাবে কোন রকমে। জয়িতা বললো।

কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, বাজারে কুচো মাছ উঠবে।

অন্ত কিছু মাছ আনতে পাঠাও না কেন?

ছোট মাছ অর্ণ খেতে চায় না। বললেই কি ও আনবে?

অর্ণব বুঝলো জয়ি ছেলেকে আড়াল করছে। একে অর্ণ বাজারের থলি হাতে নিতে চায় না তায় আজ বৃষ্টি পড়েছে, নানান অজুহাত খাড়া করবে। কিন্তু অর্ণবের খুব ইচ্ছে সরু করে আলু কেটে মৌড়লা মাছের টক্ গরম ভাতের সঙ্গে খাবে। কিংবা কুচো চিংড়ি সিদ্ধ করে তেল নুন মেখে গোটা গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেশ জমবে। অনেকদিন ফ্যাসা মাছ খায়নি। মার হাতের ফ্যাসা মাছের ঝাল এখনো জিভে লেগে আছে অর্ণবের। একবার গ্রামে খুব বৃষ্টি হয়েছিল বাড়ীর সামনে পুকুরটা ভেসে গেল। অর্ণবরা সবাই মিলে প্রচুর পুঁটি পেয়েছিল। মা পাতুড়ি করেছিল সেই মাছ দিয়ে মনে আছে অর্ণবের বাবা এমনিতে বাড়িতে খুব কম কথা বলতেন। সেদিন খেতে খেতে সকলের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন। পরে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে পাতুড়ি প্রিপারেশনই ছিল বাবার ভাবান্তরের উৎস। এক কথায় অপূর্ব ছিল পুঁটির পাতুড়ি।

পুরনো দিনের কথা মনে পড়তে চোখের কোণ চিক্‌চিক্ করে উঠলো। অজান্তে চাদরের খুঁটো দিয়ে চোখ মুছলো। বাইরে তাকিয়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেলো। গুটি গুটি পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে বাজারের থলি তুলে নিল। জয়িতা অবাক হয়ে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে দেখল। এইতো বললে শরীর খারাপ। বৃষ্টির মধ্যে কি দরকার? একদিন বাজার নাহলে কি চলতো না? জয়িতা প্রকারান্তরে বললো। চলবে না কেন? সবই চলে। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো না হলে চলাটা চলার মত থাকে না, বেপথ হয়ে যায়। জয়িতা অর্ণবের অভিমান বুঝলো। তবুও আর একবার চেষ্টা করলো নিরস্ত করার জন্যে আজ আবার গায়ে জল লাগলে বাড়াবাড়ি হবে। এই বয়েসে শরীর সইতে পারবে কি? আজ বরং থাক। অর্ণব গায়ে মাখে না। থলি টাকা আর ছাতা নিল। জয়িতা দেখছে এই মানুষটা কোনদিন কাতর হয়নি কোন কাজে। কাজ থাকলে হাজার প্রতিবন্ধ কত তুচ্ছ হয়ে গেছে ওর কাছে। শুধু একটা শরীর ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে শারীরিক বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে। যে কোন আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় পঞ্চাশোর্ধ মানুষটাকে। নিজ প্রত্যয়ে দৃঢ় বিশ্বাসে অবিচল লোকটা মেনে নিতে পারে না বর্তমান সময়ের সবজান্তা প্রবণতা।

সময়ের ভারে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষ যেমন অনেক কিছুই হচ্ছে-হবে বলে মেনে নেয়, অন্যায়, ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আপস করে, নীতি থেকে সরে আসে, বিনা দ্বিধায় পরাজয় স্বীকার করে, মূল্যবোধের ভারী আস্তরন ঝেড়ে ফেলে অবলীলায়, জয়িতা জানে অর্ণব সে দলে কোনদিনই যোগ দেবে না বরং ঘৃণায় তাদের থেকে তফাতে চলবে।

দিনটা মনে নেই জয়িতার। সন্ধ্যের মুখে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে যাচ্ছিল বেলুড় কালীবাড়িতে। তখন সবে বিয়ে হয়েছে তাদের। নতুন বউয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল অর্ণবের গা ঘেঁসে। সালকিয়া পেরিয়ে কিছু দূর পরে একটা মোড়ে বেশ কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সিটা ড্রাইভার আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। অর্ণব মুখ বাড়িয়ে ভীড়টা দেখল। ট্যাক্সি থেকে জয়িতাও দেখেছিল, রক্তাপ্লুত একটা শরীর পড়ে আছে, তাকে ঘিরে রয়েছে কিছু যুবক অর্ণব ট্যাক্সি ড্রাইভারকে থামতে বললো। সাব ঝঞ্ঝাটমে ন-ফাঁসিয়ে। ড্রাইভারের দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। আরও বলল, জায়গাটা নাকি ভীষণ গোলমেলে। প্রায়ই খুন খারাপি হচ্ছে। অনেক করে অর্ণবকে বারণ করলো মাথা না গলাতে। জয়িতা দু-একবার হাত ধরেছিল অর্ণবের। কোন কথা বলতে পারেনি। অর্ণব কারুর কথায় কান দেয়নি। দরজা খুলে নেমে পড়েছিল। নামার আগে চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করেছিল জয়িতাকে। জয়িতা তখন ভয়ে কাঁপছে আর ইষ্টনাম জপছে। দু-এক মিনিটের মধ্যে দেখল, অর্ণব একা কোলে করে নিয়ে আসছে রক্তাক্ত একটা শরীর আর তার পেছনে এক দঙ্গল লোক। ছেলেটিকে পেছনের সীটে শুইয়ে দিয়ে ওরা দুজন সামনে গিয়ে বসল। গাড়ী ষ্টার্ট করার মুহূর্তে একটি রুস্ক মার্কা ছেলে গাড়ীর জানলার কাছে এসে হুমকি দিল, কাজটা ভালো করলেন না দাদা, এ পথে যাতায়াত করতে হবে, তখন মনে রাখবেন। অর্ণব কোন উত্তর দেয়নি। পেছন ফিরে ছেলেটিকে একবার দেখলো তারপর ড্রাইভারকে এগিয়ে যেতে বললো। বালি কেদারনাথ হাসপাতালে ছেলেটাকে ভর্তি করা হলো। ডাক্তার পুলিশ সবাই মিলে অর্ণবকে জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলেছিল তবু সে নিজের কর্ত্তব্যে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটতে দেয়নি। সেদিন আর ফেরা হয়নি। তারপর দিন সকালেই তারা ফিরেছিল ঘুরপথে বি টি রোড দিয়ে জয়িতার অনুরোধেই। ঘটনাটা গড়িয়ে ছিল অনেক দিন। অর্ণবকে সেই নিয়ে দৌড়ঝাপ করতে হয়েছে কম নয়। কিন্তু তাকে

দেখে জয়িতার কখনই মনে হয়নি বনের ঘোর তাড়াচ্ছে বা বেগার খাটছে।

জল ছপছপ করে কে যেন এলো বাড়ীর কাছে।। অর্পণ? অর্পণ? এই অর্পণ বাজার যাবি। অর্পণের কোন বন্ধু ডাকল। অর্পণ চা খাচ্ছিল, দৌড়ে গেল বাইরে। কিরে সোমনাথ? এই বৃষ্টিতে বাজার যাচ্ছিস?

কি করব বল বাবার জ্বর হয়েছে, উঠতে পারছে না তোদের বাজার হয়ে গেছে।

কি জানি, জানিনা। দাঁড়া মাকে জিজ্ঞেস করি। অর্পণ মার কাছে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল বাবা ছাতা হাতে বাজারে যাবার জন্য রেডি।

অর্ণবকে পাশ কাটিয়ে অর্পণ দৌড়ে গেল রান্নাঘরে মার কাছে। মাকে বললো। মা, বাবাকে বলো আমি বাজারে যাবো?

জয়িতা অবাক হয়ে ছেলেকে দেখলো। সেকিরে তুই যাবি বাজারে আজ এই বর্ষা বাদলে?

আঃ মা তাড়াতাড়ি কর না, বাবা যে বেরিয়ে গেল।

জয়িতা মশলা বাটছিল। হাতদুটো বাটির জলে ডুবিয়ে কাপড়ের আঁচলে মুছতে মুছতে উঠে এলো। শুনছো, তোমার ছেলে বাজারে যাবে বলছে। ভালোই হলো, ওকে বলে দাও কি কি আনবে।

অর্ণব ছাতা খুলেছিল। জয়িতার কথায় ছাতা বন্ধ করলো। ম্লান হাসি খেলে গেল তার মুখে. কি অর্থ সেই হাসির বুঝতে চেষ্টা করলো জয়িতা।

অর্ণবের হাত থেকে ব্যাগ আর টাকা নিয়ে। পাশে দাঁড়ানো অর্পণকে দিল।

চল সোমনাথ, বলে নেমে গেল অর্পণ।

অর্ণব দেখলো, দুজন যুবক কথা বলতে বলতে জল ভেঙে যাচ্ছে। তাদের পায়ের ঠেলায় জলের ঢেউ খেলছে, সিঁড়িতে আছড়ে পড়ছে জল। শামুকগুলো মুখ বের করে হাঁটছিল, জলের ছোঁয়ায় খোলসে ঢুকে গেছে এখন। লেবু পাতা তালগাছ থেকে টপ টুপ, করে জল পড়ছে এখনও। আর একপাশে তার ছাতাটা পড়ে আছে, একদম শুকনো জল লাগেনি একটুও।

মারণাস্ত্র

শৈবাল মিত্র

প্রায় দশ বছর পরে বইমেলায় লালতির সঙ্গে শেখরের দেখা হলো। লালতির পাশে অচেনা মানুষটি যে তার স্বামী, ছ'সাত বছরের শিশুটি তাদের ছেলে, বুঝতে শেখরের অসুবিধে হলো না।

বইমেলার আজ তৃতীয় দিন। মেলা এখনও তেমন জমেনি। শেষ বিকেলে মেলার মাঠ, বেশিরভাগ স্টল খালি পড়ে আছে। র‍্যাক, শেলফ, সাজাবার কাজ চলেছে কিছু দোকানে। বিদেশী এক বই-র দোকান থেকে বেরিয়ে কফিস্টলের দিকে যাচ্ছিল শেখর। সামনে ঘাসে ঢাকা এক চিলতে সবুজ মাটিতে ছায়া ঘনালেও আকাশে আলো মরেনি। একা একা হাঁটতে ভালো লাগছিল শেখরের। তখনই হঠাৎ লালতির মুখোমুখি হলো সে। দাঁড়িয়ে গেল। নিরুপায় হয়েই দাঁড়ালো। রাস্তায় মা, বাবা, স্ত্রী, ভাই, বোন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের মুখোমুখি হলে যে কোনো মানুষ যেমন দাঁড়ায়, সেভাবেই, সহজাত তাগিদে থমকে দাঁড়ালো শেখর। পরমাত্মীয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলেও লালতিকে দেখে দাঁড়াতে হলো তাকে। লালতিও দাঁড়ালো। স্বামী ছেলে দু'কদম পেছনে পড়ে গিয়েছিল, তারাও এসে দাঁড়ালো লালতির পাশে। এক লহমা লালতির মুখ দেখে শেখরের ওপর সন্দিগ্ধ নজর ফেললো লালতির স্বামী।

মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠলেও মুখে হাসি টেনে লালতিকে শেখর প্রশ্ন করল, 'কেমন আছো।'

লালতির মুখেও আবছা হাসি। সে বলল, 'ভালো'।

—অনেকদিন, প্রায় দশ বছর পরে দেখা, শেখর বলল।

কথাটা মিথ্যে। না বললেও চলতো। তবু বলে লালতিকে পরখ করতে চাইলো শেখর। দু'বছর আগে লালতির সঙ্গে রাস্তায় একবার দেখা হয়েছিল তার। আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলেছিল দু'জন। লেনদেন করেছিল কিছু খবর।

সে প্রসঙ্গে লালতি গেল না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পাশের মানুষটিকে দেখিয়ে বলল, 'রজত চ্যাটার্জী, আমার স্বামী।'

ছেলের মাথায় হাত রেখে লালতি আবার বলল, 'মিঠুন, আমাদের ছেলে।'

শেখরের মুখে স্মিত, স্থির হাসি। রজতের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমি শেখর বসু। লালতি এক সময়ে ছাত্রী ছিল আমার। অবশ্য খুব অল্পদিনই পড়িয়েছি।'

রজতের গম্ভীর মুখ, ঠাণ্ডা দৃষ্টি। শেখর বুঝলো, তার কথা ষোল আনা বিশ্বাস করেনি রজত। অবিশ্বাস করার কারণ রজতের আছে। দু'বছর আগে, শেষ যেবার দেখা হলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে লালতি বলেছিল, 'আপনার ওপর রজতের খুব রাগ।'

লালতির কথা শুনে অবাক হয়েছিল শেখর। প্রশ্ন করেছিল, 'কেন?'

লালতি বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, রজতকে সেকথা বলেছি। কিছু গোপন করিনি।'

সাবলীল ভঙ্গিতে কথাগুলো শেখরকে শুনিয়েছিল লালতি। লালতির কথায় চলকে উঠেছিল শেখরের বুকের রক্ত। গম্ভীর হলো মুখ। আগুনের মতো চোরা রাগ শরীরে ছড়িয়ে গেলেও কিছু বলেনি সে। বলার কিছু ছিলও না। নববিবাহিতা অনেক মেয়েই তাদের কুমারী জীবনের এক-আধটা প্রেমকাহিনী স্বামীকে বলে। স্বীকারোক্তি করে শুদ্ধ নিষ্পাপ হয়। বলা যায়, সতী সাধ্বী হয়ে ওঠে। আরও এক মনস্তত্ত্ব তাদের মধ্যে কাজ করে। নতুন স্বামীকে বুঝিয়ে দেয় সে ফেলনা নয়। বিয়ের আগে তারও কদর ছিল। মুখে সেদিন কিছু না বললেও লালতির বিরুদ্ধে চাপা রাগ আজও মনে পুষে রেখেছে শেখর।

তবু এই মুহূর্তে গোধূলির আলো, সবুজ মাঠ, হাজার হাজার বই, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় রজতকে শেখর বলল, 'সপরিবারে আপনাদের দেখে খুব ভালো লাগছে।'

রজত চুপ। কথা বলল না। আবার দেখা হবে বলে চলে যেতে পারতো শেখর। কিন্তু গেল না। সময়ের ছাই চাপা পুরোনো রাগ ধিকধিক করে তার মনে জেগে উঠছে। লালতিকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তার সঙ্গে সম্পর্কের কাহিনী লালতি ঠিক কিভাবে, কতোটা রজতকে বলেছে আগে জানতে হবে। না জানলেও শেখরের কিছু যায় আসে না। তবু জানবে। জেনে নিয়ে এমন এক মোক্ষম প্যাঁচ কষবে, যাতে প্রমাণ হয় লালতি

মিথ্যেবাদী। তাকে অবিশ্বাস করবে রজত। শাস্তির পালা শুরু হবে তার। লাল্‌তির একটু শাস্তি হওয়া উচিত।

পরিকল্পনা ছকে নিয়ে হাসিমুখে শেখর প্রশ্ন করল লাল্‌তিকে, 'কতোক্ষণ এসেছো?'

—আধঘণ্টাও হয় নি।

কথাটা বলে লাল্‌তি প্রশ্ন করল, 'আপনি কতোক্ষণ?'

—প্রায় একঘণ্টা।

—কী কিনলেন?

জবাব দিয়ে শেখর ফের যোগ করল কার্ল মার্কসের লেখা মেয়েদের মনস্তত্ত্ব। এ্যাবনর্ম্যাল্ সাইকোলজি।

আবছা হেসে লাল্‌তি প্রশ্ন করল, 'পুরুষদের মন নেই?'

শান্ত গলায় শেখর বলল, 'জবাবটা আমার চেয়ে রজতবাবু ভালো দিতে পারবেন।'

রজতের দিকে তাকিয়ে হাসলো শেখর। রজতের বিরূপ মুখ। মিঠুনকে শেখর প্রশ্ন করল, 'কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি?'

জবাব না দিয়ে বাবার হাত ধরলো মিঠুন। তার চোখেও বাবার মতো সন্দেহ, অবিশ্বাস, অপমানে কিরকির করছে শেখরের বুক। তবু সে মিঠুনকে আবার প্রশ্ন করল, 'কী বই কিনলে?'

প্রশ্নটা মিঠুনের পছন্দ হলো। সে বলল, 'আবোল তাবোল আর টুনটুনির বই কিনবো আমি। একটা ঠাকুরমার ঝুলি।'

—দারুণ সব বই।

শেখরের প্রশংসায় খুশি হলো মিঠুন। শেখর বললো, 'কিন্তু মিঠুনবাবু, কোন ক্লাসে তুমি পড়ো? বললে না তো?'

—ক্লাস টু।

—চমৎকার।

হাসিমুখে শেখরের দিকে এখন চোখ তুলে তাকাতে ভরসা পাচ্ছে মিঠুন। শেখর অনুমান করল, রজতও একটু সহজ হয়েছে। শেখর প্রশ্ন করল 'কফি খাবেন?'

সামান্য থতমত খেয়ে রজত বলল, 'নাহ্, এখন নয়।'

শেখর বুঝলো তাকে এড়াতে চায় রজত। কিন্তু সে না ছাড়লে রজত

এড়াবে কী করে? কফির নার জলে চকচক করছে লাল্‌তির চোখ। শেখর আবার বলল, 'এনি, টাইম ইজ কফি টাইম। সব সময়েই কফি খাওয়া যায়।'

রজত কিছু বলার আগে লাল্‌তি বলল, 'হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেছে। একটু বসলে মন্দ হতো না।'

কথা শেষ করে স্বামীর দিকে তাকালো লাল্‌তি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রজত বলল, 'ঠিক আছে চলো।'

শেখরের পাশাপাশি রজত হাঁটছে। সামনে লাল্‌তি আর মিঠুন। প্যাকেটে মোড়া তার হাতের বইটার দিকে দু'তিনবার আড়চোখে লাল্‌তি যে তাকিয়েছে শেখরের নজর এড়ায়নি। লাল্‌তি কি বুঝে গেছে শেখরের পরিকল্পনা? টের পেয়েছে তার হাতে বাদামি কাগজে মোড়া আছে লাল্‌তির মরণ কাঠি, মারণাস্ত্র।

শেখরের মুখ সরল, স্বাভাবিক। উত্তেজনা, তাড়া নেই তার। অনেক সময় আছে। রজতকে আধঘন্টা একা পেলেই হাসিল হবে তার পরিকল্পনা। তাকেই গড়ে নিতে হবে সুযোগ। কফির কাপ সামনে নিয়ে মোড়ক খুলে সে বার করবে কার্ল রজার্স। বেশিরভাগ মেয়ে, বিশেষ করে বিবাহিতরা যে কতোটা অস্বাভাবিক, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে ঠিক মিথ্যাচারী না হলেও জটিল, অস্পষ্ট, বই খুলে রজতকে পড়ে শোনাবে শেখর। পুরো বই নয়। বই-এর কোন পাতার টুকরো, কুঁচো জুৎসই লাইনগুলো আছে, শেখর জানে। সেটুকুই যথেষ্ট। এক, দুটো উক্তি রজতকে গেলাতে পারলে, বঁড়শি বেঁধা মাছের মতো তাকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলে ফেলবে শেখর। রজত তখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তার স্ত্রী, লাল্‌তির মানসিক সুস্থতা নেই। মনোবিকারের রুগী সে। শেখরকে জড়িয়ে লাল্‌তি যে সব ঘটনা শুনিয়েছে, রজতের কাছে মিথ্যে, কল্পকাহিনী মনে হবে। রজতকে একান্তে পেলে শেখরের সুবিধে হয়। কিন্তু লাল্‌তি, মিঠুনকে বাদ দিয়ে এ মেলায় রজতের সঙ্গে একা বসার সুযোগ নেই। দরকারও নেই বসার। লাল্‌তির সামনেই কথায় কথায় কার্ল রজার্স এবং মেয়েদের মনের জটিল, অস্বাভাবিক প্রবণতার আলোচনা শুরু করবে শেখর। আলোচনা শুনে ঘাবড়ে যাবে রজত। নিজের বৌকে ভয় পেতে শুরু করবে।

মেলায় ভিড় বাড়লেও বিকাল যায় এখনও [illegible] নি। ফ্যাকাশে অন্ধকার আকাশ। মেলায় সব আলো জ্বলে উঠেছে। [illegible]

পাশ। বই-র দোকানগুলোয় গিজগিজ করছে নানাবয়সী মেয়ে, পুরুষ, সবাই না কিনলেও বই দেখার, স্পর্শ করার বিনোদন ছাড়তে রাজী নয় কেউ। কফি স্টলে যাবার বাঁ পাশে 'ছোটদের বই' লেখা দোকানটার ওপর নজর পড়তে মিঠুন চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, আবোল তাবোল, টুনটুনির বই।'

দোকানের দিকে তাকালো শেখর। দোকান উপচে পড়ছে বাচ্চাদের ভিড়। ছেলেমেয়েদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে মা, বাবারা দোকানের মাথায় বাংলায় লেখা 'ছোটদের বই' সাইনবোর্ডটা আবার বানান করে পড়লো মিঠুন। লাল্‌তি বলল, 'কফি খেয়েই এখানে আসবো।'

মিঠুন বলল, 'নাহ্.., এখনই।'

মায়ের হাত ছেড়ে দৌড়ে দোকানে গেল তার পেছনে গেল লাল্‌তি। যাবার আগে রজতকে সে বলল, 'তোমরা কফি নাও। এখনই আমি আসছি।'

দোকানে লাল্‌তি ঢুকে যেতে শেখরের দিকে তাকালো রজত। মুচকি হেসে শেখর বলল, 'চলুন, একটা টেবিল, চারটে চেয়ার আগে দখল করি।'

রজতের সঙ্গে একা বসার এমন চমৎকার সুযোগ যেন টুপ করে খসে পড়লো শেখরের হাতে। একেই বলে ভাগ্য। উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছে তার স্নায়ু, শিরা। মাঠের মধ্যে ত্রিপল ঢাকা কফি স্টল। কফি-প্রেমীদের জন্যে অনেকটা জায়গা বরাদ্দ করেছে মেলা কর্তৃপক্ষ। তবু কুপন কেনার জন্যে লম্বা টানা কাউন্টারের সামনে যথেষ্ট ভিড়। চেয়ার, টেবিল প্রায় সব দখল হয়ে গেছে। কফির কাপ হাতে জটলা করছে তরুণ, তরুণীরা। যারা টেবিল পেয়েছে, কফির সঙ্গে তারা খাচ্ছে পাকোড়া, সিঙাড়া কাট্‌লেট।

ঠিক আলোর তলায় একটা টেবিল পেয়ে শেখর রজত বসে গেল। দু'টো চেয়ারই খালি হয়েছে। ক্রেতাদের আসা যাওয়া কামাই নেই। দুটো চেয়ারে বসে দুটো খালি চেয়ার দখলে রাখা অসম্ভব। শোভনও নয়। রজতকে শেখর বলল, 'ওরা এলে চেয়ার মিলে যাবে। না মিললে আমাদের দুটো তো আছে।'

রজত হাসলো। সহজ হবার চেষ্টা করছে সে। ছোটদের দোকানের দিকে তাকালো শেখর। ভিড় বাড়ছে সেখানে। বই কিনে, দাম দিয়ে, ভিড় ঠেলে, ছেলেকে নিয়ে বেরোতে লাল্‌তির কম করে আধঘণ্টা সময় লেগে যাবে। হাতের বইটা খালি চেয়ারে রেখে রজতকে শেখর বলল, 'আপনি বসুন, দু'কাপ কফি নিয়ে আসি।'

—আমিও যাচ্ছি।

রজতের কথায় মুচকি হেসে শেখর বলল, 'ছুটো চেয়ারই বেহাত হয়ে যাবে। আপনি চেয়ার আগলান।'

লাইনে দাঁড়িয়ে কুপন কিনে আবার কফির লাইনে দাঁড়ালো শেখর। সামনে চার, পাঁচজন, দশবছর আগের কিছু ঘটনা, স্মৃতি মনে পড়ছে তার।

কলকাতার এক কলেজে ইংরিজি অনার্সের ছাত্রী ছিল লাল্‌তি। মামুলি ছাত্রী। তার কলেজ জীবন ফুরোবার আগে সেখানে পড়াতে গেল শেখর। মফঃস্বলের একটা কলেজে ছু'বছর পড়বার পরে কলকাতার কলেজে চাকরি পেয়েছিল। চাকরিতে ঢুকেই কবিতাকে বিয়ে করেছিল শেখর। কলকাতায় যখন সে পড়াতে এলো, তখন কবিতার কোলে ছ'মাসের ছেলে সায়ন। কবিতা অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী। বৌ, ছেলের পরিচর্যায় জেরবার হচ্ছিল শেখর। আশা ছিল, কলকাতায় মা বাবার সংসারে ফিরলে ঝামেলা কমবে। কিন্তু বাইরের ঝামেলা সামান্য মিটলেও শেখরের মনের অশান্তি বেড়ে গেল। কবিতার সঙ্গে শাশুড়ির পটতো না। কারো প্রত্যাশা মেটাতে পারলো না কেউ। সংসারের তুই মুখ্য মহিলার চাপা বিরোধ পরিবারের সবাইকে তুশিবিরে ভাগ করে দিল। সুস্থ হয়ে উঠলে হয়তো কেটে যেতো কবিতার বদমেজাজ। কিন্তু নামী, দামী বিস্তর ডাক্তার, ওষুধেও সারলো না কবিতা। সংসারের বিরুদ্ধে যেমন সে ক্ষেপে গেল, তেমনই ধরা পড়লো তার সন্দেহ-বাতিক। শেখর একদিন টের পেল, তাকেও সন্দেহ করছে কবিতা। টের পেতে চমকে গেল সে। ভয়ে কেঁপে উঠলো তার বুক। লাল্‌তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার খবর কতোটা কবিতা জেনেছে, হদিশ পেতে চাইলো সে। যাচাই করল। নাহ, কিছুই জানে না কবিতা। কোথাও কোনো সাক্ষী সাবুদ, সঙ্কেত রাখে নি শেখর। তবু কবিতা আঁচ করেছে; কীভাবে করল?

স্টেনলেস্ স্টিলের কফিট্যাঙ্কের কল খুলে বেয়ারা ভরে দিল ছু'কাপ। পেছনে তাকিয়ে শেখর দেখলো, তাকেই নজর করছে রজত। কফির ছুটো কাপ হাতে ফিরে এলো সে। টেবিলে কাপ ছুটো রেখে বইএর প্যাকেট তুলে চেয়ারে বসলো। হাতঘড়ি দেখলো আড়চোখে। কফি আনতে লেগেছে চার মিনিট। নিজের কাপে চুমুক দিয়ে শেখর বলল, নিন।

কাপ তুললো রজত। কীভাবে শুরু করা যায়, শেখর ভাবছে। সিগারেট ধরালো সে, প্যাকেট এগিয়ে দিতে রজত বলল, 'খাই না।'

শেখর বলল, 'কলেজে মাত্র ছ'মাস লাল্‌তিকে ছাত্রী হিসেবে পেয়েছিলাম। বাড়িতে পড়িয়েছিলাম তিন মাস। আমার স্ত্রী তখন খুব অসুস্থ। নিয়মিত পড়াতে যেতে পারতাম না। তিন মাসে ছ'সাত দিনের বেশি পড়ানো হয়নি। ফলে যতোটা ভালো হতে পারতো লাল্‌তির অনার্সের রেজাল্ট, হয়নি। কিন্তু লাল্‌তির বাবার দেওয়া মাইনের টাকা নিতে ছাড়িনি। আজ ভাবলে লজ্জা হয়।'

সামনের দুটো চেয়ার খালি হতে পাশের টেবিলে টেনে নিয়ে গেল দু'জন। সে টেবিলে আড্ডা দিচ্ছে দশ-বারোজন। মাইকে বাজছে চাপা লয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত। রজতের দিকে তাকিয়ে শেখর প্রশ্ন করল, 'আপনার পড়ার প্রিয় বিষয় কী?'

সামান্য দ্বিধার পর রজত বলল, 'আমার বিষয় অ্যাকাউন্টান্সি। অডিট-ফার্মে চাকরি করি। বিষয় ধরে বিশেষ পড়া হয় না। হাতের কাছে যা পাই, পড়ি।'

শেখর বুঝতে পারলো আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে রজত। লাল্‌তি সম্বন্ধে খোলামেলা কথা পেড়েই কিছুটা স্বাভাবিক করা গেছে রজতকে। আরও কিছু কথা তাকে বলতে চায় শেখর। সিগারেটে টান দিয়ে সে বলল, 'সাহিত্যের ছাত্র হলেও আমার প্রিয় বিষয় মনস্তত্ত্ব। কলেজে পড়ার সময় থেকেই মনস্তত্ত্বের বই পড়ছি আমি। বিষয়টা সম্পর্কে আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আমার স্ত্রী। কীভাবে বাড়ালো জানেন? কবিতা নিজেই হয়ে উঠলো জটিল মনস্তত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ। ছাপা হরফে পড়ে যে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ধোঁয়াটে ছিল অনেকদিন, সেগুলো স্পষ্ট হলো। কবিতাই স্পষ্ট করে দিল।'

শেখরের কথা হাঁ করে, গিলছে রজত। শেখর জানে, সে যা বলছে, সব সত্যি নয়। দুধে অনেক জল আছে। তিনমাসে লাল্‌তিকে তার বাড়িতে সাতদিনও পড়ায় নি সে বরং মাসে সাত, আটদিন তার সঙ্গে হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, সিনেমাহল, অন্ধকার পার্কে মাতামাতি করেছে। নিবিড়, আতপ্ত সেই দিনগুলোর স্মৃতি কি ভোলা যায়? কবিতার অসুস্থতা, সন্দেহ যতো বেড়েছে, ততো ঘন হয়েছে লাল্‌তির সঙ্গে শেখরের মেলামেশা। থরোথরো প্রত্যাশা জেগেছে লাল্‌তির মনে। জাগতেই পারে। মাঝখানে সাতদিন সায়ন দারুণ অসুস্থ ছিল। বৌ, ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত শেখর সাতদিন লাল্‌তির সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। বালিগঞ্জের নির্জন পার্কের অন্ধকারে বসে

লাল্‌তি বলেছিল, 'দারুণ ঝামেলা গেল আপনার।'

—তা গেল, জবাব দিয়েছিল শেখর। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছিল, 'এখনও চলেছে।'

কবে কাজ?

মানে?

অশৌচ কবে মিটছে?

অন্ধকার মাঠ। মাথার ওপর এক আকাশ তারা। অবাক চোখে শেখর তাকিয়ে আছে দেখে লাল্‌তি বুঝেছিল, গোলমাল করেছে সে। পাঁচমিনিটে পরিষ্কার হলো, খবরের কাগজে ইংরিজির তরুণ অধ্যাপকের স্ত্রীর আত্মহত্যার খবর পড়ে, লাল্‌তি যা ভেবেছিল, সঠিক নয়। শেখর ছাড়াও কলকাতার ইংরিজির আরও অনেক তরুণ অধ্যাপক আছে। কয়েকদিন আগে খবরটা সংবাদপত্রে পড়ে শেখরের মনে হয়েছিল, লাল্‌তি ধোঁকা খাবে। বাস্তবে সেরকম ঘটাতে অবাক হয়েছিল সে। কবিতা মরেনি জেনে লাল্‌তি কতোটা স্বস্তি পেয়েছিল, অন্ধকারে তার মুখ দেখে বুঝতে পারেনি শেখর।

মেলামণ্ডপ থেকে মাইকে একটি পাঁচ বছরের শিশুর হারিয়ে যাবার খবর ঘোষণা করা হচ্ছে। ড্যাপড্যাপ করে শেখরকে দেখছে রজত। অতীত স্মৃতি মাথায় ঢেউ ভাঙলেও শেখর বলে চলেছে কবিতার মানসিক বিকারের কাহিনী। মানসিক ভারসাম্যহীন একজন কবিতা হয়ে উঠছে সমস্ত বিবাহিতা মেয়ের প্রতিনিধি। তাই চায় শেখর।

আসলে বিবাহিতা মেয়েরা, শুধু বিবাহিতা কেন, সব যুবতীই লুকোনো হিংসেতে ভোগে। বিবাহিতারা অবিশ্বাস করে স্বামীকে। বাড়াবাড়ি হলে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এক মুহূর্ত থেমে শেখর বলল, 'এ সব আমার কথা নয়, কার্ল রজার্স বলেছেন। হাজার হাজার মনোবিকারের রুগী ধরে সমীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন নিজের সিদ্ধান্ত।'

প্যাকেট খুলে বইটা বার করে রজতকে শেখর বলল, 'দেখুন, একশো সাঁইত্রিশ পাতা।'

গুম হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে রজত। বৌ, ছেলের কথাও যেন ভুলে গেছে সে। শেখর বলল, 'আরও আছে। স্বামীর কাছে পুরোনো প্রেমিকদের সম্পর্কে বানানো গল্প বলা হলো বিবাহিতা সব মেয়ের একটা প্রিয়

খেলা। চেনাজানা যে কোনো বয়সী পুরুষকে অনায়াসে প্রেমিক ভাবতে পারে একজন মেয়ে। কেন এই খেলা, গল্প? রজার্সের মতে স্বামীকে ঈর্ষাতুর করে তেজে খেলাতে চায় সব স্ত্রী।'

বই-এর পাতা উল্টে দুশো সাতায় পাতা পড়তে শুরু করল শেখর। সাত লাইন পড়ে শেখর বলল, 'দশ বছর আগে বইটা কিনেছিলাম। পাঁচ, সাতবার খুঁটিয়ে পড়েছি। মাস ছয় আগে বাড়ি থেকে বইটা কে নিয়ে গেল, খেয়াল নেই, আর ফিরে পেলাম না। নতুন একটা তাই কিনতে হলো।'

অনেক আগে শেষ হয়েছে শেখরের কফির কাপ। জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে রজতের আধকাপ কফি। চোখ তুলে শেখর দেখলো 'ছোটদের দোকান' ছেড়ে বেরিয়ে এলো লাল্তি, মিঠুন।

শেখরের হাত থেকে বইটা নিয়ে মলাটে লেখা নাম পড়ে রজত বলল, 'তিন, চার মাস আগে কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বই-এর দোকান থেকে সম্ভবত এই বইটা, হ্যাঁ, এই বই-ই কিনে এনেছিল আমার ছোটভাই ব্রতীন। কার বই, কী নাম লেখা ছিল, দেখিনি।'

কথাটা শুনে ছলাৎ করে উঠলো শেখরের বুকের রক্ত। হারানো বই-এ নিজের নাম সে লিখেছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু বেশ কিছু পাতায় দাগ দিয়ে লেখা আছে নানা মন্তব্য, মতামত। দু'দশবার লাল্তির নাম লিখলেও কবিতার উল্লেখ কোথাও নেই। মারণাস্ত্রটা বুমেরাঙ হবে কিনা ভেবে এই শীতেও দুশ্চিন্তায় ঘামছে শেখর।

টেবিলের সামনে ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়ালো লাল্তি।

বিবেকের ছবি

সোমনাথ ঘোষ

—কতদূর গো করিম ভাই? ভোর তো হয়ে এলো। নরেন খুড়ো হাঁক পাড়ে।

—আজ্ঞে বাবু চালাচ্ছি তো জোরেই, অন্ধকার রাস্তা কি করব?

ভোর হতে আর মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাকি। পাঁচটা দশ নাগাদ দীঘার সমুদ্রে সূর্য মাথা চাড়া দেবে। তাই এত তাড়া।

দুদিনের ছুটিতে দীঘায় আসা। পাড়া থেকে জনা চল্লিশ এসেছে। এদের অনেকেই আগে সমুদ্র দেখে নি।

অমিত আর শিশির একেবারে পেছনের সিটে বসে। সারারাত নিজেরা ঘুমোয় নি, বাসের অনেককে ঘুমোতে দেয় নি। গান আর গল্পে বাসটা মাতিয়ে রেখেছিল। ভোরের দিকে একটু ঘুম এসে যায়। সিগারেটেও ঘুম কাটে না।

হঠাৎই নরেন খুড়োর চীৎকারে সারা বাস লাফিয়ে ওঠে—এসে গেছে, এসে গেছে, ঐ যে সমুদ্রের গর্জন। ওরে তোরা তৈরী? এবার নামতে হবে।

সমুদ্রের ধার ধরে ওল্ড দীঘা ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে চলে নিউ দীঘার দিকে। একটা আবছা আঁধারের চাদর সমুদ্রের ওপর বিছিয়ে। ঢেউয়ের গর্জন শোনা গেলেও দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

বাস থেকে একে একে সকলে নামতে থাকে। তখনও সূর্যোদয়ের দেরী আছে। সমুদ্রের তীরে দারুণ ভীড়। চায়ের দোকানগুলো সবে খুলতে শুরু ক'রেছে। একটা দোকানে অমিত শিশিরকে টেনে নিয়ে যায়—চ, চা খেয়ে আসি।

দু'কাপ চা নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বাসের সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরছে। দূরে রেখা ওর দাদা-বৌদির সাথে হাঁটছে। ঠিক মানাচ্ছে না ওকে ওদের সাথে। এতদিন কত পরিকল্পনা হয়েছিল, পরিচয় করার সুযোগ পায় নি। আসার পথে বাসেই আলাপটা হয়। শিশির ডাকে—

—রেখা, এই রেখা।

রেখা এগিয়ে আসে। অমিত আর এক কাপ চা চায়।

—আপনাদের কেমন আনন্দ। বন্ধুরা এসেছেন। আর আমি তো প্রায় একাই।

—একা কেন? আমরা তো আছি। শিশির বলে ওঠে।

অন্ধকার আস্তরণ ভেদ ক'রে আকাশের পূর্ব কোন লাল হয়ে ওঠে।

হোটেল 'অবকাশ' আগেই ভাড়া নেওয়া ছিল। দশটা ঘর। যে যার ঘরে চলে যায়। জল খাবার খেয়ে সমুদ্রে স্নান করতে যেতে হবে।

নরেন খুড়ো এই দলের মধ্যে বয়স্ক লোক। নরেন খুড়ো জানিয়ে দেন সমুদ্রে বড় বাজে জায়গা। এদিক ওদিক না গিয়ে একসাথে জলে নামা ভালো। ন'টা নাগাদ যে যার মতো বেরোতে শুরু করে। অমিত আর শিশির প্রথমেই বেরিয়ে পড়ে। রেখারা একটু দেরীতে আসবে। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রাখছে।

ওরা প্রধান বীচের দিকে না গিয়ে ঝাউবনের দিকে এগোতে থাকে। দু'জনেই চুপচাপ।

শিশির এবার মুখ খোলে,

—রেখাকে আটকে দিল নাকি বলতো?

—জানি না, আচ্ছা কি ব্যাপার বলতো? তুই আরম্ভ করলি কি? সত্যিই কি—

—দূর ওসব কিচ্ছু না। তবে মেয়েটা সত্যিই ভালো।

—ভালো লাগছে? ভালোবাসা অবধি গড়াবে না তো?

—কি জানি।

শিশিরের এই দু' শব্দের উত্তরটা অমিতের কানে প্রতিফলিত হতে থাকে বারবার।

অমিতরা ঝাউবন পেরিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে এসে নামে অনেকটা নীচু হয়ে বালিগুলো সমুদ্রের জল রেখায় মিশে গেছে। ওরা দৌড়ে নেমে একেবারে জলের কাছে পৌঁছে যায়। এখন প্রচণ্ড ঢেউ। জল মাতাল। গর্জনের শব্দ আর দিগন্ত বিস্তৃত নীল জল অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

শিশিরের ডাকে অমিতের চমক ভাঙে।

—ওই ছাখ রেখারা এসে গেছে। বলেই শিশির এগোতে থাকে।

অমিত তখনো দাঁড়িয়ে। দেখছে শিশির কতটা এগোয়। রেখা অমিতেরই আবিষ্কার। ফুলবাগানের সরকারি কোয়ার্টারে রেখার দাদা রাণা ভিজেক হ'ল

এসেছেন। অমিতের প্রথম থেকে ইচ্ছে ছিল কলেজ যাওয়ার পথে রেখার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু শিশিরের জন্যই তা সম্ভব হয় নি। মনের মধ্যে মরে গিয়েছিল অদমিত এক ইচ্ছা। তড়িঘড়ি করে দীঘায় আসার কারণও এটাই। অমিত শিশিরকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে এগোয়।

নরেন খুড়ো হৃষি তখি করে সকলকে এক জায়গায় করছেন। একে একে জলে নামতে থাকে সকলে। অমিত ভিজে বালির ওপর বসে। রেখার দাদার সাথে শিশির নেবে গেছে চান করতে। অমিতকে ডাকার প্রয়োজন হয় নি। শিশির সাঁতার জানে না।

হঠাৎই একটা চিন্তা বিদ্যুতের মতো অমিতের সারা শরীর কাঁপিয়ে দেয়—শিশির সাঁতার জানে না।

অমিত লাফিয়ে উঠে জলের দিকে দৌড়োয়। একটা বড় ঢেউ আসছে। লাফিয়ে ঢেউয়ের সাথে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। অমিত একজন অভিজ্ঞ সাঁতারু বলে জলে নানারকম কসরৎ দেখায়।

শিশিরকে ধীরে ধীরে নিজের কাছে টেনে আনে। ঢেউয়ে গা ভাসানো শেখায়। শিশিরের সাহস বাড়তে থাকে।

রেখারা একটু দূরে স্নান করছে। শিশির ঘুরে ফিরেই ওদিকে যাবার চেষ্টা করে। অমিত দেখতে থাকে জল কতটা বাড়ছে।

শিশিরই প্রস্তাবটা দেয়—চ, ফটো তোলা যাক্।

দূরেই ফটোগ্রাফার ঘুরছে। অমিত আর শিশির জল ছেড়ে উঠে আসে, বালির ওপরে বসে পড়ে। শিশির একজন ক্যামেরাম্যানকে ডাকে। ভদ্রলোক এসেই প্রথমে রেটের ফিরিস্তি শুনিয়ে দেন। তারপর মেলে ধরেন প্রকাণ্ড এক অ্যালবাম। অ্যালবামটা টেনে নেয় শিশির। বেশ কয়েকটা ফটো তুলবো, আপনি কিছুক্ষণ ঘুরে আসবেন?

অমিত ঝুঁকে পড়ে অ্যালবামে। এই সমুদ্রতটে তোলা ফটো। অনেক ফটো তোলেন, কিন্তু নিয়ে যান না। তার থেকেই বাছা কিছু ফটো। পাতা ওল্টাতে থাকে একে একে। দারুণ মজাতো।

হঠাৎই একটা ফটো। অমিত চেপে ধরে ফটোটা বড্ড চেনা। সমুদ্রে একটা বড়ো ঢেউ আসছে। সূর্য উঠছে। এক ভদ্রলোক একটা ছোট ছেলেকে দু'হাতে ছুঁড়ে দিয়েছেন ওপরে—ছেলেটা শূন্যে, লোকটা দু'হাত বাড়িয়ে। দু'জনের মাঝখানে আগুনের মতো সূর্যটা। তলায় অশান্ত সমুদ্র। অদ্ভুত

পরিবেশ।

অমিত লাফিয়ে ওঠে। সে চেনে এই ফটো। ফটোর ভেতরের মানুষগুলো এই দিনের সমুদ্রকে।

ভদ্রলোক অমিতের মাস্টার মশাই নির্মলবাবু। বাচ্চাটা নির্মলবাবুর ছেলে বাবলু আর অমিত একই স্কুলে ক্লাশ ওয়ান থেকেই পড়ত। পর পর তিনবার ক্লাশে ফার্স্ট হয়ে ফোরে উঠল বাবুল। আর অমিত সেকেণ্ড। বাড়িতে কম বকুনি খেতে হয় নি এর জন্য।

স্কুল থেকে নির্মলবাবুই দীঘার আসার পরিকল্পনা করেন। অমিতদের দীঘায় আসা হ'ল। ঐ সময় একদিন সূর্যোদয়ের সময় ফটোটা তোলা হয়।

তারপর চান করতে সকলে জলে নামে। নির্মলবাবুর দায়িত্বে ছিল অমিত আর বাবুল। অমিত সবে সাঁতারে ভর্তি হয়েছে। জলে নেমে অমিত বুঝতে পারে প্রচণ্ড টান। ঢেউটা লাফিয়ে এসে তীরে ভেঙে পড়ছে। ফেরার সময় বালি ঘেঁষে নেমে যাচ্ছে। বড় হয়ে বুঝেছে, একে বলে আণ্ডার কারেণ্ট। জলে সেদিন ছিল প্রচণ্ড আণ্ডার কারেণ্ট। অমিত ডুব সাঁতারে অনেকটা চলে যায়। নির্মলবাবু হাঁক পাড়লে আবার ফিরে আসে। অমিত এখন বেশ খানিকটা দূরে। নির্মলবাবুর হাত ধরে বাবলু ঢেউয়ে ভাসার চেষ্টা করে।

একটা বড় ঢেউ আসছে। অমিত ডুব সাঁতারে বাবলুর পা লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে যায়। বাবলুর জন্যই সে কোনদিন ক্লাশে ফার্স্ট হতে পারে নি।

ঢেউ সব তছনছ করে দেয়। অমিত একটু দূরে ভেসে উঠে দেখে নির্মলবাবু পাগলের মতো জলের নীচে বালি হাতড়াচ্ছেন চশমাটা জলে পড়ে আছে।

সেদিন বাবলুর দেহ পাওয়া যায় নি। সবাই জানে বাবলু নির্মলবাবুর হাত ফস্কে পড়ে গেছে।

তারপর থেকে এক অজানা আশঙ্কায় অমিত আর কোনদিন নির্মলবাবুর চোখের দিকে তাকায় নি। সে আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল।

শিশির ডাকে—কিরে চ, সবাইকে নিয়ে ফটো তুলি।

বেশ কয়েকটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়। অমিত, শিশির ও রেখা একসাথে একটা ফটো তোলে। অমিত রেখাকে কত কি বলবে ঠিক ক'রে এসেছিল—ভাঙা ঢেউয়ের মতো সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

শিশিরের সাহস বাড়ছে। জলের অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অদূরেই

রেখারা স্নান করছে।

অমিত আবার জলে নামে। এবার আর শিশিরের দিকে যায় না। দূর থেকে লক্ষ্য করে শিশির আর রেখাকে। রেখার চোখে আজ যেন সর্বনাশ চেপেছে। ও কেন শিশিরের দিকেই বার বার দেখছে। অমিত কিছু বুঝতে পারে না। শিশিরের সমুদ্র স্নানে মন নেই। কোন সাগরে ও নামলো অবশেষে? রেখা কি এইভাবেই তার দিকে চাইতো? ফটো তুলতো একসাথে?

একটা বড় ঢেউ আসছে। বেলা বাড়ছে। এত বড় ঢেউ কমই পাওয়া যাবে। দূরে শিশির ভাসার জন্য তৈরী হচ্ছে।

অমিত চিন্তা করে—রেখা—রেখা—রেখা। ঢেউ এগিয়ে আসে। অমিত পালাতে থাকে সী-বীচের দিকে; পায়ের তলায় শক্ত মাটি খোঁজে। ঢেউটা ক্রমশঃ বিরাট হচ্ছে। আরো বিরাট। ঢেউয়ের ফণার তলার অন্ধকার যেন গিলতে আসছে।

অমিত প্রাণপণে জল ঠেলে উঠতে থাকে। বালির ওপর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে দেখে ঢেউটা টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ছে। শিশির এখন রেখার খুব কাছে। হাতটা বাড়ালেই রেখার হাতের সন্ধান পেয়ে যাবে।

অমিত দৌড়োয়। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক খানিকটা দূরেই ছিলেন। অ্যালবামটা হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নেয়।

—এই ফটোটা আমার চাই। কত লাগবে বলুন।

—কী ব্যাপার বলুন তো? এটা আপনার নাকি?

অমিত তাড়াতাড়ি টাকাটা চুকিয়ে চলে আসে একটু দূরে। চোখের সামনে এখন কিছু বালি, একরাশ ঢেউ, আর একদল মানুষ। কখনও ডুবছে, কখনও ভাসছে। অমিত বালির ওপর বসে পড়ে। ছবিটাকে চোখের সামনে নিয়ে আসে। বুঝতে চেষ্টা করে এটা কার ছবি?

চোরের দায়ে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল দিনটা।

চত্তির মাসের গোড়াতেই এত গরম, জষ্টিতে কী হবে? ফাল্গুনের পর বৃষ্টি পড়েনি একটি ফোঁটাও। বেড়ার ধার ঘেঁসে লাগানো বেগুনের চারাগুলো ঝলসে মরে গেল চোখের সামনে। আগে পেছনের এঁদো পুকুরটা থেকে জল এনে ছেটাত ওরা। পুকুর পাড়ের বস্তির লোকেরা আর আনতে দেয়না। বোশেখ জষ্টি পর্যন্ত বাসন মাজা কাপড় কাচা কিসে হবে;

মানুষের খাওয়ার জল নেই, তা গাছের গোড়ায় জল। মরে যাওয়া চারাগুলোকে মমতার সঙ্গে ছুঁয়ে দেয় আহ্লাদী। বর্ষার জল পেটপুরে খেতে পেলিনে।

ঝরা পাতার ওপর ধপ্ করে কিছু একটা পড়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে আহ্লাদী। কাটা ঠোঁটের ওপর হাসপাতালের সেলাই অবশ্য পড়েছে। তবুও আওয়াজটা তার জবরদস্ত আনুনাসিক। বাবা ঘরে এসেছে খেতে, পেছনের দোর দিয়ে আহ্লাদী বাইরে। পারতপক্ষে সামনে যায়না, কে যাবে মরতে। নাহ'লে এই হাঘরে ঝাঁ ঝাঁ রোদে গেরস্তর বেড়ালটাও বেরোয় না।

ধপ্ শব্দটা হ'তেই এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয় আহ্লাদী। সামনের বাগানের উঁচু পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে সশস্ত্র একটা ছেলে। হাতে দা। বাজোরিয়াদের কলার গাছের জম্পেশ একটা কাঁদি এই মাত্র সে নিঃশব্দে জবাই করে নামিয়েছে গাছ থেকে। অথচ নীচে, পাঁচিলের বাইরে দাঁড়ানো তার সঙ্গী ছেলেটা লুফতে পারেনি ফলে ভেতর বাগানের ঘাসজমির ওপর গিয়ে পড়েছে কাঁদিটা।

আহ্লাদীর চীৎকারে চমকে উঠে হাতের কাটারিটা তুলে নিয়েছিল ছেলেটা, আহ্লাদীকে শাসিয়েছিল।

বাঁবা, বাঁবা, চোর ধঁরবে এঁসো।

ময়ীয়া মেয়েটা বাপের ভয় ভুলে গেছিল একলহমার জন্যে। এই চিৎকারে চোরের সঙ্গী ছেলেটার খেয়াল হ'ল। পাঁচিলের গায়ে লাগানো পুরোনো

সাইকেলটা উঠিয়ে বিদ্যুদ্বেগে সে পালিয়ে গেল। অন্য ছেলেটা, প্রধান চোর, তখনও নামতেই পারেনি—বন্ধুর বিশ্বাসঘাত তাকে নিতান্ত বিমূঢ় করে দিয়েছিল বোধহয়। নামলেও পালাতে হবে দৌড়েই বাগানের লাগোয়া কাঁচা রাস্তাটা, যার দুই ধার কুল আর কেয়াঝাড়ে অদৃশ্য সেটাকেই সে শুকনো মুখে জরীপ করছিল এমন সময় আদুড় গা, খোলা বুকে কাঁচা পাকা লোমের জংগল, হাঁটুর ওপর গোটানো বিবর্ণ লুঙ্গি, গণেশ বেরিয়ে এসেছে।

গণেশ আহ্লাদীর বাপ। পান্তাভাতের কাঁসির মধ্যে হাত ডুবিয়ে কাঁটালবীচিগুলোকে বার করে পাশের এনামেলের থালায় সাজিয়ে রাখছিল, এক সংগে পরে খাবে, আহ্লাদীর চোর ধরা চীৎকার ওকে উঠিয়ে এনেছে। তা গণেশের বিচলিত হবার কারণ যথেষ্টই আছে। কার গোলার কাগজ কলে লোডারের কাজ করত, সেই কারখানা আজ চার বছর ধরে বন্ধ। এই চার বছর দিনমজুরি করে ক্রমাগত সংসারটা দাঁতে দাঁত চেপে চালাচ্ছে কয়লার দোকানে, হোলসেল ফুড গ্রেনের দোকানে। মাসের দু'চারটে দিন সপরিবারে ছাতু-কাঁচালংকা-নুন খেয়ে পেটে গামছা বেঁধে থাকে, দু'এক কাঠা জমি থাকলেও অন্য কথা ছিল, বাড়ীটাও সরকারী জমির ওপর বানানো। মহল্লার কেউ কেউ বলে গণেশ ছ্যাচড়া, ছিঁচকে চোর—এই দায়ে গণেশকে অবশ্য এখনও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। একবারই একরাত্তির লকআপে ছিল। তবে গতবছর বাজোরিয়াদের কলাগাছ কেটে সাফ করে দেবার দায়ে ওদের চৌকিদার, বাঘুমালী আর কেরাণীবাবু মিলে ওকে যে মারধোর করেছিল, তাতে গণেশের কোনোই হাত ছিল না। বাড়ীর পাশে চুরি করে কেউ? বাজোরিয়ারা পুলিশে দিতে চায়নি, দিলেও গণেশের কিছু করার ছিলনা, লকআপ থেকে ভরত চামারের গু-মুত-রক্তমাখা ডেডবডি বার হতে দেখার স্মৃতি তখনও ওর মনে জলজল করছিল, ভাগ্যিস বাজোরিয়ারা নিজস্ব আইন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক প্রভাবে ওকে জড়িয়ে নিয়েছিল। পেছনের পাইখানার ভেতরে বন্ধ করে রেখেছিল ওরা গণেশকে, রাত নামতে টেনে বার করে কিল চড় লাথি ঘুষি মেরেছিল দমাদম, মুখের কষে গড়ানো রক্ত অবহেলায় কষ বেয়ে বুকে গড়াতে দিয়েছিল গণেশ, হাতজোড় করে বার বার বলছিল—মা কালী দিব্যি আজ্ঞে, আমি নিই নাই। নিয়েছে তোর বাপ, বাপের নাম বল।

কোনো কথা বার করতে না পেরে মাঝ রাতে বাজোরিয়ারা ওকে ছেড়ে দেয়।

—১১

এই তাহ'লে সেই চোর।

গত বছরের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক হিংস্র করে দেয় গণেশকে। ছেলেটা দা-হাতে পাঁচিল থেকে লাফিয়ে নেমেছে, বাঘের মতন গণেশ চেপে ধরেছে ওর ঘাড়। তিন চারটে রদ্দা সংগে সংগে। পানের দোকানী নিতাই দোকান খুলতে যাচ্ছিল, রাস্তায় রেডিমেড তামাশা দেখে দাঁড়িয়ে গেল। মার. গণশা, মার।

সামনের বাড়ীর রিটায়ার্ড মাষ্টারমশাই এসে দাঁড়িয়েছেন, কোমরের লুঙ্গি টাইট দিতে দিতে। গণশারে, বয়ে সয়ে মার।

গণেশ ততক্ষণে চোরের ঘাড় ছেড়ে কনুই চেপে ধরেছে, সাঁড়াশী চাপে। সমবেত জনগণকে বেশ গর্ব ও প্রত্যয়ের সংগে সম্ভাষণ করে সে—দ্যাখলেন তো বাবুরা, দ্যাখেন, দ্যাখেন। আমারে বলে চোর আর এই ব্যাটা নাকের সামনে দিয়ে মাল নিয়ে ভেগে যাচ্ছে। উৎসাহের সংগে ভীড়ের এক অংশ ততক্ষণে বাজোরিয়াদের খিড়কী দরজা খটখটাতে লেগেছে।

বামাল ও চোরকে একসংগে হাজির করা হোক।

দরজাটা খট করে খুলে গেল।

ওদের মালী দেশে গেছে। আর যে চৌকিদার ছিল, সে এখন ওদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, এই চৌকিদার নতুন।

দুপুরের কাঁচা ঘুম ভেঙে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এসে। প্রথম সারির বাচ্চাগুলোকে দুহাতে কচুরিপানার মত সরিয়ে গণেশ সামনে এসে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব ভিটেলে বোঝায় চৌকিদারকে গতবারের মারধোর খাওয়ার বর্ণনাটা চেপে গিয়ে। গণেশ চাইছে চোর আর কলার কাঁদি দুটোকেই ছোটবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক দেরী না করে। আরে রাম রাম। হাই এর মুখে অলস ভাবে তুড়ি মারে চৌকিদার। তারপর নিশ্চিন্ত ভাবে বলে ঠিক হ্যায়। ছোটবাবু শোতা হ্যায়। উঠ্‌নে পর বতা দেংগে হাম। তারপর পেছনের দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে যায় আবার।

যাঃ বাব্বা। অতবড় কলার কাঁদিটা, বাজারে বেচলে কড়কড়ে একমুঠো টাকা। পাত্তাই দিল না। তামাশা দেখা ভীড় এবার গলতে আরম্ভ করেছে। পুলিশে দে, পুলিশে দে নইলে তোর হাতেই দড়ি পড়বে, বলতে বলতে নিতাই চলে যায়। মাষ্টারবাবুও চলে গেছেন। খাঁ খাঁ রোদ্দুরে গণেশ, আসামী আর চোর। ছেলেটা ফ্যাঁস করে ওঠে, হাতটা ছাড়ুন দাদা, পালাবো না।

আয়, একগ্লাস জল খাওয়ান দিকি। রোদ্দুরে পড়ে মরে টরে গেলে আপনিই ক্যাচাণ্ডে পড়বেন।

ওর কথার ধরণ শুনে বেঁজে ওঠে গণেশ। শুধু জল?

চলোনা ঘরে, উল্টো করে টেঙে সন্দেশ খাওয়াবো।

ছেলেটা ডিগডিগে রোগা, গায়ে ময়লা শার্ট ফুলপ্যান্টটা তলার দিকে ছেঁড়া। বয়স ষোলো সতেরর বেশী না, সবে গোঁফ গজাচ্ছে, তবে পাৎলা গড়ন বলে আরও ছোটো মনে হয়। রোদ্দুরে জামাটা ঘামে সপ্‌সপে হয়ে গেছে, মুখটা কালচে বেগুনী দেখায়। বেড়ার ধারে এবার আহ্লাদীর মা প্রসাদী শুকতারার মত উদয় হয়। সে আবার আহ্লাদীর বাবাকে ভয়টয় পায়না। তার বাবা ছিল নওদা থানার গ্রামরক্ষী। চাঁছাছোলা গলাটি সে আর রেখে ঢেকে রাখেনা— ভেতরে এসোনা, বাইরে দাঁড়িয়ে লোক হাসাচ্চো কেন? মরণ আর কী।

অগত্যা গণেশ ছেলেটার নড়া ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে আসে। পিঠে এক রামধাক্কা দিয়ে কলঘরের দিকে ঠেলে দ্যায়। বলে, দ্যাখ, পালাবার চেষ্টা করলে পুঁতে ফেলবো। ছেলেটা হাসে। তবে পালাবার কোনো চেষ্টা করেনা। কেনেস্তারা থেকে জল তুলে ধীরে সুস্থে হাত পা ধোয়। প্রসাদী ততক্ষণে ওকে এক ডেলা গুড় আর এক ঘটি খাবার জল এগিয়ে দিয়েছে। ঘটিটা খালি করে মাটিতে রেখে হাত জোড় ক'রে বলে, আঃ মাসী বাঁচালেন, প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছিল। আঃ আজকের দিনটা নষ্টই হয়ে গেল। কাজে বেরোনো হবেনা। গামছাটা পাল্টে লুঙ্গি পরে গণেশ, তার উপর ছেঁড়া চেক শার্টটা। এবার আর খিড়কী দিয়ে নয়, সামনের গেট দিয়ে গিয়ে ছোটবাবুকে ধরতে হবে। চৌকিদারটা নতুন, কে জানে ছোঁড়ার সংগে সাজিশ ছিল কিনা। যাবার আগে অবশ্য বড় মেয়ে মালতী, মা, বউ সবাইকে শাসিয়ে যায়, যদি দেখি ছোঁড়া পালিয়েছে, কাউকে আস্ত রাখব না কিন্তু। ছেলেটা রান্নাঘরের সামনে দাওয়ায় প্যান্ট গুটিয়ে আরাম করে বসেছে, বাড়ীর ভেতরটা ঠাণ্ডা, ওপরের খড় পচে গেলেও।

সন্ধে হয়ে গেল। সামনের, পেছনের দুই দরজাতেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে গণেশ। সামনের গেটে দারোয়ান ঢুকতেই দেয়নি। রবিবার ছিল, কাজেই 'কিরাণী' বাবুও ছুটিতে। বড়বাবু কলকাতায় গেছেন। ছোটবাবু ঘুমোচ্ছেন। একঘন্টা পর ঘুম থেকে উঠে টি. ভি. দেখছেন আর দারোয়ান

গিয়ে কিছু বলতে রাজি না।

পেছনের বাগান আবার চৌকিদারের এলাকা—চুরিচুরীর ঝামেলায় যেতে সে তৈরী নয়। আর গণেশের কি বাবু। তাকে তো কেউ চোর বলেনি। আরও মুশকিল, কলার কাঁদিটা পেছনের বাগানেই পড়ে আছে।

ছেলেটার সংগে ওটাকেও ঘরে নিয়ে আসা উচিত ছিল গণেশের। শয়তান চৌকিদারটা এখন যদি ওটাকে হাপিস করে ফেলে তবে চুরির দায় আবার গণেশের ঘাড়ে পড়া কিছু আশ্চর্য নয়। ওটা আছে তো? পেছনের দরজায় আবার গুটি গুটি যায় গণেশ। চৌকিদার বাজার গেছে। গভীর সন্ধে। ওর বউ ভয়ে ভয়ে দরজা খোলে খিড়কীর। উঁহু, কেলা-টেলা সে কিছু জানেনা। আগে ওর মরদ আসুক অকেলী জনানা, অনজান পুরুষকে দরজা খুলবেনা সে।

ফিরতে ফিরতে সন্ধে ঘন হয়ে আসে। ঘরে পিদিম জলে উঠেছে। ছেলেটা—ওর নাম ধ্রুব, প্রসাদীর দেওয়া তাজা খবর, জল তুলে এনে দিয়েছে চারবার। সাবানকাচা সারছে প্রসাদী, ছেলেটা জামা কাপড় নিংড়ে তুলছে জল থেকে। গণেশ বাড়ী থাকেনা বেশীর ভাগ দিন। এই জন্মে মেয়ে দুটোকে অন্তদিন হাঁপাতে হাঁপাতে জল তুলতে হয়। সন্ধে দিয়ে বেরিয়ে আসে গণেশের বুড়ী মা। চারটি প্রসাদের বাতাসা গুণে দেয় গণেশ, ধ্রুব, আহ্লাদী ও মালতীকে। বুড়ীর বোধহয় মনে পড়ে গেছে গণেশের ছেলের কথা—মামার সংগে খেলা দেখতে গিয়ে যে হারিয়ে গিয়েছিল কলকাতায় আর ফিরে আসেনি—বিড়বিড় করতে করতে বার বার মাথায় হাত ঠেকায় বুড়ী আনমনে।

এর মধ্যে দরজায় একটা কান্নাকাটি মেশানো জোড় শব্দ। বছর চল্লিশের একজন বিধবা মেয়েলোক ধাঁই করে ভেতরে ঢুকে ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরে উচ্চ-গ্রামে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। প্রসাদী বিরক্ত হয়ে বলে—অমা, সন্ধ্যেবেলা একী অলুক্ষুণে কান্না গো? ধ্রুবর শাকরেদ অন্ত গিয়ে ধপাস করে পড়েছে ধ্রুবদের বস্তিতে। নিজে কী করেছে তা আর বলেনি অবশ্য। বিশদ ও কাল্পনিক বর্ণনা দিয়েছে বাজোরিয়াদের চৌকিদার কি ক'রে মারতে মারতে ওকে নিয়ে গেছে ভেতরে। এতক্ষণে পুলিশেই দিয়েছে নিশ্চয়—এইটুকু শুনেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছে হাসি, ধ্রুবর মা। বাজোরিয়াদের গেটে ঢুকতে জায়নি ওরা কদাচিৎ। পাড়ার কুচোবাচ্চারা রাস্তা দেখিয়ে ওকে নিয়ে এসেছে আহ্লাদীর বাপের কাছে।

রেখেই তো পুলিশে, আহত গণেশ গর্জায়। ছেলেকে চুরি করতে পাঠাবার সময় মনে ছিলনা?

খবরদার মুখ সামলে কথা বলুন। হাসি চেঁচিয়ে ওঠে। প্রসাদীর দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—

দেখুন তো দিদি। বাড়ী বাড়ী ঠিকে কাজ করে ছেলেকে এত বড়টি করেছি, কেউ বলেছে একটা ছুঁচও হাসি নিয়েছে বলে। কাল ওদের কী দিদি হবে বলে আমার মিছে বলে বেরিয়ে গেছে ছেলে, আমি কি জানি এখানে চুরি করতে এসেছে?

প্রসাদী ব্যস্ত হয়ে ওকে টেনে নিয়ে যায় দাওয়ার ওপর।

বুড়ো মিনসের কথা শুনো না তো বোন, হাড়মাস জালিয়ে খেল আমাদের —এসো, চা দিয়েছি খাও।

গণেশকে বলে—যাওনা দিকি, অতই যদি মুরোদ—পুলিশে ডাইরী লিখিয়ে এসো, তোমাকেও যদি দু'ঘা ডাণ্ডা দিয়ে হাজতে না রেখে দেয় তো কি বলেছি।

উপর্যুপরি আক্রমণে গণেশের মনোবলের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। তবুও ঘরের ভেতরে জামা ছাড়তে ছাড়তে সে গজরায়। পুলিশে দিই, আর না দিই। সে আমার ইচ্ছে। ছোটবাবু না আসা পর্যন্ত ছাড়ছিনা একে। দেখুক ওরা, কে আসল চোর।

হাসি আবার কি বলতে গিয়ে হাঁ করছিল প্রসাদী চোখের ইশারায় থামিয়ে দেয় ওকে। বলে, বেশ, তবে ভাত চড়িয়ে দিই গে। প্যাসেঞ্জার গাড়ী চলে গেছে, তোমার ছোটবাবু কতো রাতে আসবে কে জানে? কাল দুপুরে ভাত খেয়েছিল ছেলেটা? হাসি মাথা নাড়ে। বলে, নাঃ।

ছেলেটা গুম্ হয়ে বসে আছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। মালতীর কাছ থেকে একটা পুরোনো বই চেয়ে নিয়েছে পড়বে বলে। সত্যিই, আটটা বাজে। আরও আটকাতে গেলে রান্নাখাওয়া সারতে হয় ওদের। কলে পড়া উপোসী ইঁদুরকেই খাওয়ায় মানুষ, মা-ছেলেকে কি বলে আর না খেতে দিয়ে আটকে রাখে গণেশ।

নটা বেজে গেছে। আধো অন্ধকার দাওয়ায় ডিবরীর আলোয় খেতে বসেছে গণেশ। ধ্রুব, ধ্রুবর মা, আহ্লাদী, মালতী। প্রসাদী তার তোবড়ানো বাসনকোসন সযত্নে আগলে বসেছে সামনে। কলাইয়ের ডাল, শাক, ঝিঙে ভাতে, আলুভাতে, বার বার ধ্রুবকে শুধোচ্ছে, আর কী দেবে, ও বাবা।

দাঁওয়া থেকে নেমে আসে গণেশের বাঁ হাতে কাঁসার বাটীতে একটু দুধ, ধ্রুবর থালার পাশে নামিয়ে রাখে।

বাড়ীতে ছিল বাবা, একটু খেয়ে নাও।

গোগ্রাসে খাচ্ছিল ধ্রুব, দুপুরের উপোসের পর, আঙুল চেটে চেটে। দুধের বাটি দেখে হাসে। ফাঁসির খাওয়া হয়ে যাবে নাতো?

প্রসাদী রেগে গিয়ে বলে, ছিঃ বালাই ষাট আমার।

মুখে কিছু আটকায় না তোর।

আহ্লাদী বলে, আঙুল চাটছো কেন, মা বলে আঙুল চাটলে দারিদ্র হয়।

এমনি সময় দরজার কাছে সোরগোল ওঠে একটা।

ঘ্যাঁচ করে গাড়ী থামার শব্দ। পুরনো নতুন চৌকিদার দু'জন। সংগে কেরাণীবাবু, বোধহয় বাড়ী থেকে ধরে এনেছে। বাইরে গাড়ীতে বসিয়ে এসেছে ছোটবাবুকে। বাইরে থেকেই কেরাণীবাবু হাঁকে, কই চোর কই?

পুরোনো চৌকিদার মুখ ফিরিয়ে বলে—কহা থা না, গণেশ কা হী কাম। শালা চোর কো খানা খিলাতা হ্যায় দামাদ কে তরহ।

ধ্রুবর তখনও খাওয়া শেষ হয়নি, ভাতকটা মেখে দুধটা ঢেলেছিল পেছন থেকে টেনে তুলে এক লাথি কষায় নতুন চৌকিদার।

পুরনো চৌকিদার হাঁটু দিয়ে গোঁত্তা মারে গণেশের ঘাড়ে পিঠে, সেও খেয়ে উঠতে পারেনি—এই ব্যাটা চোরের ছড়িদার, তু ভী চল্।

বিমূঢ় গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে ধ্রুব। ডিবরির ধোঁয়াচ্ছন্ন আলোয় চকচক করে ওর দুই চোখ, ওর ম্লান মনখারাপ করানো হাসি।